মিরজা ইব্রাহিমভ

গল্প - সঞ্চয়ন

মির্জা ইব্রাহিমভ ♠ গল্প-সঞ্চয়ন

মির্জা ইব্রাহিমভ
গল্প - সঞ্চয়ন

মিরজা ইব্রাহিমভ্ (জন্ম — ১৯১১ সাল) — সোভিয়েত আজেরবাইজানের গণলেখক, গদ্য ও নাট্যরীতির অনেক সাহিত্য রচনার লেখক, প্রবন্ধ, সংবাদপত্রের প্রবন্ধের সমালোচনামূলক এবং সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে রচনার স্রষ্টা।

এই বইটি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আমাদের দেশের বহুজাতীয় সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ লেখকের সঙ্গে। লেখকের ছোট গল্পগুলি বহুদিন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাদের বাস্তবতায়। সেগুলিতে আছে উৎপাদনমূলক, প্রতিদিনের, নৈতিক এবং পারিবারিক সমস্যার চিত্র।

ISBN-5-05-001222-8

মিরজা ইব্রাহিমভ

গল্প - সঞ্চয়ন

'রাদুগা' প্রকাশন
তাশখন্দ

অনুবাদ: পূর্ণিমা মিত্র
অঙ্গসজ্জা: ই. কিরিয়াকিদি

МИРЗА ИБРАГИМОВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

На языке бенгали

MIRZA IBRAGIMOV

SELECTED WORKS

In Bengali

$\frac{4702010200-072}{031\ (01)-87}$ 101—87

© বাংলা অনুবাদ · অঙ্গসজ্জা · 'রাদুগা' প্রকাশন · তাশখন্দ · ১৯৮৭

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-001222-8

সূচী

পেরি-খালা ও লেনিন	৫
মাটি কি বলে...	৪৩
লাল দিগন্ত	৫৩
জন্মদিন	৮৮
স্মৃতিস্তম্ভ	৯৫
ইচ্ছাশক্তি	১১৭
মেদিনার হৃদয়	**১৪৭**
বিদ্রোহী চন্দা	১৭৬
উপসংহার	২০৭

পেরি-খালা ও লেনিন

১

বাদলা দিন। দিগন্তের ধূসর বিষণ্ণ মেঘগুলি যেন সঙ্গীহীনা এক বৃদ্ধার কুঞ্চিত ভ্রূ, যে বৃদ্ধা এখন ক্ষুধার্ত অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়া ও জেগে ওঠাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ঘোলাটে সীসারঙের আকাশ আলমাম্মিক গ্রামের ওপর এত নীচু হয়ে ঝুলছিল যেন গ্রামের বাড়ীগুলিকে মাটির সঙ্গে পিষে দিতে মনস্থ করেছে। পাহাড় থেকে বওয়া ঠাণ্ডা হাওয়া মুষল-ধারে বৃষ্টির পরে জমা নোংরাগুলোকে সারা সপ্তাহ ধরেও শুকিয়ে দিতে পারছিল না।

শীতে জমে যাওয়া হাড়গুলো গরম হয়ে ওঠার আগেই কৃষককে প্রতিদিনের কাজ করার জন্য মাঠে, বাগানে, উঠানে যেতে হয় তার ছোট্ট ঝুপড়ি ছেড়ে, খারাপ আবহাওয়া নিয়ে মাথা ঘামালে তার চলে না। গ্রামের জীবন নিজস্ব ধারায় বয়ে চলেছে... রাস্তায় জমে থাকা ভিজে নোংরার ওপরে সরু পায়ে চলা পথের সৃষ্টি হয়েছে। জমিটা গরু, মহিষ, ভেড়ার খুরের দাগে ভর্তি। গ্রামকে শহরের সঙ্গে যুক্ত করেছে যে মাটির রাস্তা, তা একেবারেই অগম্য, সেখানে বহুদিন যাবৎ কোন ফিটন বা ছ্যাকরাগাড়ী চলে না।

কিন্তু এই পথহীনতা শহর থেকে বিভিন্ন খবর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে পেঁছানোয় কোনো বাধা ছিল না। সেই কারণেই সকাল থেকেই খড়ের গাদার কাছে, গোলাঘরের পিছনে লোকেরা জড় হত।

'কর্তাদের তো অবস্থা খারাপ, আজকালের মধ্যেই বাকু* থেকে পাততাড়ি গুটোতে হবে!' উত্তেজিতভাবে বলছিল ধূসর-চোখের, ছোটোখাটো, সুঠাম চেহারার খেতমজুর ভেলি।

---

* বাকু — সোভিয়েত আজেরবাইজানের রাজধানী। — সম্পাঃ

কালো ককেশীয় টুপি মাথায়, চুখা* পরা, ফোলানো ঢেউখেলানো দাড়িওয়ালা গাজি গদুলু উদ্বিগ্নভাবে দেখল সাহসী খেতমজুরের রোদে-বাতাসে কড়াপড়া তামাটে রঙের মুখের দিকে।

'ক্ষুধার্ত মুরগী দানার স্বপ্নই দেখে!' বলল সে, ভর্ৎসনার ভাবে মাথা নাড়িয়ে। 'বসে অপেক্ষা করছিস, কবে তোকে ডেকে মিষ্টি খাওয়াবে!.. শুনলাম রাশিয়াতে লোকে স্তেপভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে, ঘাস চিবুচ্ছে... বলশেভিকরা ক্ষুধায় অধীর হয়ে পড়েছে! কে বিশ্বাস করতে পারবে যে তারা নগ্ন-পা, ক্ষুধার্ত এখানে এসে পেঁছিতে পারবে? জারের জেনারেল দেনিকিন লাগাম কামড়ে আবার যুদ্ধে যাবার জন্য ছটফট করছে।'

তার কাছে দাঁড়িয়ে সহিস নাজার। তার গোঁফ এমনকি চোখের পাতাও উজ্জ্বল তামাটে রঙের, উদ্ধতভাবে হেসে উঠল সে:

'বলেছ বটে, গাজী!.. বলশেভিকরা জার নিকোলাইকে তার সিংহাসন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল আর কোথাকার এক জেনারেল দেনিকিনের সঙ্গে পেরে উঠবে না? শুঁকে দেখ দেখি — ঝড়বৃষ্টির গন্ধ পাচ্ছ না? বেঁচে থাকলে দেখতে পাবে জর্জিয়া, আরমেনিয়া সব জায়গাতেই আরম্ভ হয়ে যাবে। তাহলে বল দেখি আমাদের আজেরবাইজানই বা কেন একপাশে সরে থাকবে?'

গাজী রাগে কাঁপা কাঁপা আঙুলগুলো দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তসবী গুনতে লাগল। তার এমন ইচ্ছে করছিল যে বেহায়া সহিসটাকে থামিয়ে দিতে, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান দিতে জানে না।

'হায় সহিস, অকর্মা সহিস। কতকগুলো ঘোড়া নিয়ে সামলে উঠতে পারিস না আর আমাকে শোনাতে আসছিস পৃথিবীর অপর প্রান্তে কি ঘটছে। সেই সঙ্গে একথাও মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন — বয়সে তো আমি তোর বাবার মতন!.. আর এই দাড়ি ছুঁয়ে বলছি বলশেভিকরা চোখ রগড়াবারও সময় পাবে না, তার আগেই তাদের শেষ করে দেবে ক্ষুধা আর ইংরাজরা। সবাই একথা বলছে, খালি আমি নয়...'

সহিস এমন আক্রমণে দিশাহারা হয়ে পড়ল।

খেতমজুর ভেলি তাকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এল:

'আল্লাহ্ তোমার দাড়ির মঙ্গল করবেন, গাজী! অবশ্য তোমার পাও

---

* চুখা — চওড়াহাতা ও হাঁটুর নীচে পর্যন্ত ঝুলওয়ালা পুরুষের পোষাক। — সম্পাঃ

আমাদের অল্পবুদ্ধি মাথার চেয়ে বেশী জ্ঞানী... আল্লাহ্‌র দোহাই, আমাকে বোকা ভেবে মাফ কোরো, তবু বলি: যদি সমস্ত গালগল্পেই বিশ্বাস করবে তো তোমার কানগুলোর অবস্থা হবে ফসলী বছরে যাঁতাকলে যাবার পথটার মত। ঠিক কিনা, গাজী?'

ভোলি এই শ্লেষাত্মক কথাগুলি গভীর চিন্তাশীলভাবে বলল একটুও না হেসে, কিন্তু শ্রোতারা ঠাট্টার হাসি হেসে উঠল এ কথার আসল অর্থ বুঝতে পেরে, অপমানে গাজী গুলদুর বুক জ্বলে গেল।

'মন খারাপ কোরো না, গাজী,' থামল না খেতমজুর, 'বলশেভিকরা এত দূর পর্যন্ত পেঁছিতে পারবে না এ আমরা জানি, আবহাওয়া খারাপ, করার তো কিছু নেই, তাই শুধু শুধু জিভ চুলকোচ্ছি। কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে লেনিন, নিজে লেনিন মস্কো থেকে কড়া আদেশ দিয়েছেন আমাদের বাকুকে সবরকম সাহায্য দিতে। অর্থ! রুটি! পোশাক!.. তুমি এ সম্বন্ধে কি বল, গাজী? সমর্থন কর?'

গাজী লাল হয়ে গেল, তার ইচ্ছে হল: চীৎকার করে ওঠে 'দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে নীচ, বাচাল!' আর তার মাথায় আঘাত করে তার মুখ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এখনকার দিনকালে তা করা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, তাই গাজী কষ্ট করে মেনে নিল — কাঁপা কাঁপা হাতে ঝলক দিতে থাকল তসবী।

সহিস নাজার চুপ করে তার শতচ্ছিন্ন বুটজোড়া, যার সামনেটা মোরগঝুঁটির মত বেঁকে ওপরে উঠে গেছে, তার ডগাটা মাটিতে ঘষছিল।

হাতে তৈরী ইঁটে বানানো গোলাঘরের ভেতরে পাহারাদার জাফর-আমি* মেঝে ঝাঁট দিচ্ছিল। সে দরজার গোড়ায় বেরিয়ে এসে, ঝাঁটাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'আল্লাহ্‌ লেনিনকে দীর্ঘজীবি করুন,' শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল সে। 'শুনেছি, সারা দুনিয়ার যত গরীব লোকের বড় বন্ধু হলেন লেনিন।'

গাজী গুলু ঘৃণা নিয়ে তাকাল জাফর-আমির দিকে: বুড়োর সবকিছু তার সাদা-ধূসর চুল, তার পাতলা দাড়ি, রোগা, নোয়ান চেহারা তার বিরক্তি উৎপাদন করত। গাজী মুখ ফিরিয়ে নিল যেন গলার কাছে বমি ঠেলে আসছে।

---

* আমি — বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সম্বোধন। — সম্পাঃ

'শোন্ ভোলি,' হঠাৎ সে খেতমজুরকে ধূর্ত প্রশ্ন করল, 'তুই তো দেখি সবকিছুই জানিস, বল্ দেখি লেনিনের ধর্ম কি ?'

ভোলি গাজীর মতলব বুঝতে পারল, কোন উত্তর দিল না, বোকা সেজে মাথা চুলকোতে লাগল। গোলাঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল জাফর-আমি:

'মুসলমান ! কোন সন্দেহই নেই লেনিন মুসলমান !'

গাজী গুলে বুড়োর দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করল।

'তুই কি পাপোষের মত পায়ের তলায় গড়াগড়ি খাচ্ছিস ? এসব বোঝা তোর বুদ্ধির কর্ম নয়। গোলাঘর ঝাঁট দে আর আল্লাহ্র তারিফ্ কর।' তারপর নীচু স্বরে মন্তব্য করল: 'আমি শুনেছি যে লেনিন মূর্তিপূজারী !'

সাহিস নাজার লাল দাড়িতে হাত বুলিয়ে দৃঢ় প্রতিবাদ করল: 'যত ফালতু কথা !'

'হতে পারে সে অন্য কোথাও থেকে এসেছে ?' আবার বলল গাজী।

'মূর্তিপূজারী কি কখনও বাদশাহ্কে তখ্ত থেকে উচ্ছেদ করতে পারে ? ভেবে দেখ, গাজী। দুনিয়াতে কখনও তা হয় নি। লেনিন নিশ্চয়ই খ্রীস্টান !'

জাফর-আমি একমত হল না কিছুতেই:

'খুব ভাল করেই জানি — মুসলমান ! ইন্সাফের জন্য সাচ্চা লড়িয়ে !'

দারুণ তর্ক আরম্ভ হল এবং কোনখানে গিয়ে তা শেষ হত কে জানে, বিশেষ করে তারপরে যখন খেতমজুর ভোলি ঘোষণা করল:

'লেনিন সমস্ত গরীব, হতভাগ্য মানুষকে সাহায্য করতে চান ! তিনি মানুষকে গোলামির থেকে মুক্ত করে দিতে চেষ্টা করছেন।'

'যদি তা হয়, তাহলে তো খুবই ভাল।' বলে উঠল জাফর-আমি।

এমন সময়ে গ্রামের থেকে দূরে ঢালে দেখা দিল একটা গাড়ী আর সবাইয়ের নজর সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে গেল।

'আরে এ যে বেকের* ফিটন,' চোখ কুঁচকে লক্ষ্য করে গাজী বলল। 'এমন নোংরার মধ্যে বেরোবার কি কারণ হল ?'

---

* বেক — জমিদার। — সম্পাঃ

'কখনো নয়!' সহিস বিশ্বাস করল না। 'কোন চুলোর দোরে পেঁছাবার জন্য সে গাড়ীর চাকা গর্তে পড়ে ভাঙবে?' তবুও নাজার একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

বুড়ো জাফর-আমিও হাতে ঝাঁটাটা তুলে নিল তার কাজ করা দেখাবার জন্য, আর মন্তব্য করল:

'জুড়ি গাড়ী। কিন্তু বসে আছে কে দেখতে পাচ্ছি না।'

আবার তর্ক আরম্ভ হল — কাকে যে এমন আবহাওয়ায় এই জলকাদা ভরা রাস্তায় বেরোতে হল? পুলিশ!.. খুব দরকার, জান, ওরা যাচ্ছে গ্রামে পাহারাদারের খুনীকে খুঁজতে, এই যে হল না সেদিন... সম্মানিত গাজী গুলুর মতে, ওরা ফলের খদ্দেররা যাচ্ছে: ওদের তো আর দেরী না করে চাষীদের সঙ্গে আপেল, নাসপাতি কেনার চুক্তি করে ফেলতে হবে... আর জাফর-আমি দোরগোড়া থেকে এমন সম্ভাবনার কথা বলল, যা সবার হৃদয়ে গরম জল ঢেলে দিল:

'মুসাভাত* পন্থীরা সৈন্যদলে যোগ দেবার জন্য সবাইকে আহ্বান জানিয়েছে। ওরা যাচ্ছে নতুনদের নিতে সৈন্যবাহিনীতে। ছেলেগুলোকে সাবধান করে দিতে পারলে ভাল হত — দেরী না করে গা' ঢাকা দিক!'

খেতমজুর আর সহিস উদ্বিগ্নভাবে দৃষ্টি বিনিময় করল আর বাগানগুলির মধ্যে দিয়ে জোরে দৌড় লাগাল। একটু দূরে খেলা করতে থাকা একটি ছেলে জাফর-আমির কথা শুনতে পেয়ে রাস্তা দিয়ে সমস্ত শক্তিতে দৌড় লাগাল গ্রামে এই খবর দিতে দিতে। গ্রামে হৈচৈ আরম্ভ হয়ে গেল। গাড়ীগুলি তখনও খানা-খোঁদলের মধ্যে দিয়ে দোল খেতে খেতে এগিয়ে আসছিল, আর এদিকে মায়েরা কাঁদতে কাঁদতে ছেলেদের ডাকাডাকি করছিল, তাদের লুকোচ্ছিল মাটির তলের ভাঁড়ার ঘরে, খড়ের গাদার মধ্যে, বাগানের গর্তে।

মুখে ফেনা উঠে যাওয়া ঘোড়াগুলি অবশেষে গাড়ীটাকে গ্রাম পর্যন্ত টেনে নিয়ে এল আর ছুটে আসা গ্রামবাসীরা দেখতে পেল গাড়ীতে বসে আছে লম্বা কোট পরা, ধূসর রঙের কারাকুল ফারের টুপি মাথায় মোটকা

---

* মুসাভাত — ১৯১১ সালে আজেরবাইজানের জমিদার ও বুর্জোয়াদের সৃষ্ট প্রতিবিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী দল। সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ১৯২০ সালে এই দলের উচ্ছেদ করা হয়। — সম্পাঃ

শাহবাজ-বেক। বেকের আচার-ব্যবহার কোন কালেই ভাল ছিল না, আর এখন সবার দিকে সে তাকিয়ে আছে একেবারে নেকড়ের দৃষ্টি নিয়ে, ক্লান্ত ? নাকি, কিছু ঘটেছে...

ক্লান্ত ঘোড়াগুলির মুখ থেকে বাষ্প বের হচ্ছে। শুধু তাদের পাই নয়, ঘণ্টা আর জরির ফুৎনা ঝোলান তাদের দেহের পাশগুলো পর্যন্ত প্রচণ্ড নোংরায় মাখামাখি। রঙকরা ফিটন গাড়ীটাও গলা মাটিতে মাখামাখি। নোংরা ছিটিয়েছে বেকের দামী কোটে আর কোচোয়ানের ক্লান্ত মুখেও।

কোনো রকমে থেমে থেমে নিশ্বাস নিয়ে ঘোড়াগুলি ফিটনটাকে টেনে নিয়ে এল গ্রামের মাঝামাঝি বড় ফাঁকা জায়গাটায়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের চাষীরা, মেয়ে আর শিশুরা তাদের ঘিরে ফেলল। তারা চুপ করে নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিল বেকের দিকে, তাদের দৃষ্টিতে ছিল বিষণ্নতা... হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে দেখা গেল সাহসী খেতমজুর ভেলিকে: সে যেন ভাবল যে মানুষ দুবার মরে না আর একবার মরার হাত থেকেও রেহাই পায় না।

'ঠিকই শোনা যাচ্ছে যে, মনিবের দিন গোনা।' বলে সে জোরে হেসে উঠল। 'বেকের এমন মড়ার মত চেহারা যেন তার জাহাজগুলি সমুদ্রে ঝড়ে ডুবে গেছে।'

বেক কষ্টে নেমে এল হেলে পড়া ফিটনের থেকে, লোকেরা সরে জায়গা করে দিল।

'কি বকবক করছিস তুই ওখানে ?' কর্তৃত্বসূচকভাবে গরগর করে বলল সে।

ভেলি ভীরুদের দলে পড়ে না।

'আপনার মঙ্গলের জন্য দোয়া করছিলাম!.. তাড়াতাড়ি যেন কড়া রোদ ওঠে, রাস্তা শুকিয়ে যায় আর আপনি ভালভাবে শহরে পেঁছে যান!'

ছেলেরা হেসে উঠবার ভাব করতেই তাদের মায়েরা তাদের চুপ করিয়ে দিল। নিস্তব্ধ জনতার ওপর অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে বেক আবার সাহসী খেতমজুরকে বলল:

'আর কি দোয়া করেছিস তুই আল্লাহ্‌র কাছে ?'

'আমি খোদার কাছে আরো দোয়া করেছি: 'আমাদের বেককে দীর্ঘ জীবন আর চমৎকার স্বাস্থ্য দাও, যেন আমরা পাপী-তাপীরা তাঁর ছায়ায় বাঁচতে পারি!.. ' যদি অনুমতি দাও সর্বশক্তিসম্পন্ন বেক তো আরো কিছু বলি।'

সম্মানিত বেককে নিয়ে বদমাস খেতমজুরটার এই পরিহাস গাজী গুলুর অসহ্য লাগছিল। তারপর গাজী গুলুর ভয় হল যে বকাটে ভেলি অভিযোগ জানিয়ে বসবে গ্রামের নেতাদের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে আর বেক গ্রামের আক্সাকালদের* ওপর আর গাজী গুলুর ওপরও দারুণ রেগে যাবে কেননা যুবসমাজকে এইভাবে বাড়তে দেওয়া হচ্ছে তাতে যে বলশেভিকদের বীজ প্রোথিত হবে মাটিতে...

'চুপ কর, চুপ কর।' কঠোরভাবে আদেশ করল গাজী খেতমজুরকে। 'বেক এতটা পথ এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, ওঁর বিশ্রাম নেওয়া দরকার। ওইসব আলতুফালতু গল্প পরে করতে আসিস।' বলে ভেলির জামার কলারটা ধরল তাকে ঝাঁকুনি দেবার জন্য।

খেতমজুর শান্তভাবে তার হাতটা সরিয়ে দিল।

'সবাই জানে আমি কখনও অমনি অমনি মুখ নাড়াই না। যদি কোন জরুরী কাজ থাকে তাহলে আমি আঞ্চলিক শাসনকর্তার কাছেও যাব।'

'বেক, সব গ্রামবাসীরাই জানে যে বেহায়া খেতমজুরটার বুদ্ধি, লজ্জা কিছু নেই।' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল গাজী বেকের প্রতি তোয়াজের হাসি হেসে। 'ওকে নিয়ে মাথা ঘামিও না হে উপকারী প্রভু।' আর ভেলিকে হাতের মুঠি দেখাল: 'চুপ কর!'

যাই হোক ভেলি থামল না:

'বেক, খালি একটা ভীষণ জরুরী প্রশ্ন করার অনুমতি দাও।'

'ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও,' গাজী ব্যস্ত হল। 'বেক ক্লান্ত... এই সব সরে যাও, পথ করে দাও মহান বেকের জন্য। আর এই খেতমজুরটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দাও।'

ভীড়ের মধ্যে কিছু বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

'খেতমজুরও সেই খোদার বান্দা যেমন তুমি ফোলানদাড়ি।'

'খেতমজুর কি মানুষ নয়?'

'ওকে বলতে দাও, ওর মুখ বন্ধ কোরো না।'

বোঝা গেল গাজী গুলু একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, এখনকার পরিস্থিতিতে তা করায় বিপদ আছে। ধূর্ত বেক সঙ্গে সঙ্গে

---

* আক্সাকাল — আজেরবাইজান ভাষায় বৃদ্ধদের প্রতি সম্ভাষণ। — সম্পাঃ

বুঝতে পারল তার এখন কি করা উচিত: সে হাত তুলে গোলমাল থামিয়ে দিল আর খেতমজুরের দিকে না তাকিয়েই বলল:

'জিজ্ঞাসা কর।'

'সম্মানিত বেক, দীর্ঘজীবি হোন,' আরম্ভ করল ভেলি, যখন সবাই চুপ হল, 'আমি জানতে চাই: কিয়াজিমের ঘর কি শেষ পর্যন্ত ভাঙা হবে? সেই জায়গায় কি বেক বড় বড় জানলা, বারান্দা সমেত একটা বড় বাড়ী তৈরী করবেন?'

বেকের কালো ঘন গোঁফ হুমকিরভাবে নড়ে চড়ে উঠল, টেনে বার করল চাবুকটা, কিন্তু ভেলি পিছিয়ে গেল না, সে একটু বাঁকা হাসি হাসল। বেক চাবুকটা দিয়ে তার কেতাদুরস্ত বুটজোড়াটা পরিষ্কার করতে লাগল।

'কিয়াজিমের ভাঙা ঝুপড়ি আর তোমাদের এই অভিশপ্ত গ্রামটা আমি বিক্রী করে দিচ্ছি এই ভদ্রলোককে, তোমাদের এবং আমার অতিথিকে।' ক্রুদ্ধ আনন্দের সঙ্গে বলল বেক চাবুক দিয়ে গাড়ীর দিকে দেখিয়ে।

ভীড়ের লোকরা বিস্মিত হয়ে দেখল যে গাড়ীর এক কোণায় ছোট্ট হয়ে বসে আছে ডার্বি-টুপি মাথায়, ফ্রককোট পরা কম্বলমুড়ি দেওয়া ফ্যাকাসে চেহারার এক ভদ্রলোক। বাঁকা হাসি নিয়ে সে বিস্মিত চাষীদের দিকে দেখছিল।

২

বসন্তের মেঘ জোর বৃষ্টিতে মাঠ-ঘাট, বাগান সব ধুইয়ে দিয়ে দক্ষিণের দিকে সরে গেছে আর গ্রামের ওপরে, ন্যাড়া, কংকালের মত আপেল গাছগুলির ওপরে জমা হচ্ছিল ঘন ধূসর কুয়াশা। এই কুয়াশাটা জন্ম নেয় অনেক নদীনালায় সমৃদ্ধ উপত্যকায়, আর বিষণ্ণ, একঘেঁয়ে, রঙহীন স্তেপভূমিতে, তারপর সেখানে আরো ঘন হয়ে উঠে ম্লান দিনের সামান্য আলোটাও নিভিয়ে দিল। হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকার নামল। বসন্ত নামার সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা মাঠে, বাগানে সারাদিন পরিশ্রম করায় লক্ষ্যই করে নি কখন কাজের দিন শেষ হল আর সন্ধ্যার অন্ধকার নামল।

কিন্তু পেরি-খালা সবকিছু দেখেছে, অনুভব করেছে, লক্ষ্য করেছে। কারণ তার নিজের না ছিল বাগান, গরু, না ছিল ঘর। এই এত বছর ধরে শীতে, বসন্তে বড়লোক প্রতিবেশীদের কাছে দিন-মজুরের কঠোর পরিশ্রমের

কাজের পরে সে গ্রামের বাইরে এসে বসে দুহাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে, মাথা হাঁটুর ওপর রেখে গভীর চিন্তায় ডুবে যেত। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং গভীর রাত্রেও তার চারদিকে কি ঘটছে তা সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত, সে দেখত সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে পাহাড় মাঠের রঙ বদলে যায়, বিদ্যুতের তরবারির আঘাতে কেমন করে মেঘ ঝলকায়, ছোট ছোট পাহাড়ী নদীর মিষ্টি কুলু-কুলু শব্দ, বসন্তের উপছে পড়া নদীর ছলছল উচ্ছ্বাস, আকাশের ভয়ংকর বজ্রের শব্দ, সবই সে শুনত।

জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতায় আহত, রক্তাক্ত পোরি-খালার হৃদয় পাথর হয়ে যায় নি সে সব সময়ই বসন্তের সুন্দর রঙীন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিত...

তার ছেঁড়া, তাপ্পি দেওয়া কালো স্যাটিনের ঘাগরা, দলানো ব্লাউজ, ফাটা ফাটা কালো কয়লার মত পাগুলি (শীতের দিনেও সে খালি পায়ে চলাফেরা করত) হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে যে সে তার নিজের দুঃখের মধ্যে ডুবে গেছে।

সত্যিই, অভাব ছিল তার বিছানা, দারিদ্র্য — তার বিশ্বস্ত সঙ্গী, দুঃখ — তার ভাগ্য, তার প্রিয় বান্ধবী।

কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তার আচার-আচরণ যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত, তার সুঠাম চেহারার সৌন্দর্য সবটাই মিলিয়ে যায় নি, তার চোখে আছে বুদ্ধির ছটা, সময়ের আগেই পেকে যাওয়া তার চুলের বেনী দুটি এখনও সুন্দর, দেখা যাবে যে সে অসহায় বেচারী নয়, সে নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারে।

কোনো এক সময়ে তার জীবনেও সুখ ছিল, ঘর ছিল, বাবা-মা তাকে ভালবাসায় ভরিয়ে রাখত, তার প্রিয় বলিষ্ঠ পুরুষ তাকে ভালবেসে বুকে করত, তার নিজের সন্তানরা তার পায়ের কাছে ঘুরঘুর করত তার যে কোনো ইচ্ছা পূরণ করার জন্য। কোনো এক সময়ে সে দোলনা খাটে মা'র ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত, কোনো এক সময়ে সে দুরুদুরু বক্ষে বধূবেশ পরেছিল... সব যে কোথায় মিলিয়ে গেল? কি এক ভীষণ ঝড় তার ঘরদোর সব উড়িয়ে নিয়ে গেল। সত্যি সত্যিই কি এসব তার জীবনে ছিল? নাকি এও তার একা বসে থাকার মুহূর্তগুলিতে দেখা স্বপ্ন?

ছোট বেলায় বাবা গল্প বলতেন, সাত নদীর পারে, সাতটি পাহাড়ের

মাঝখানে থাকে, সাতটি জাদুর বেড়ীতে বাঁধা এক ধূর্ত ডাইনীবুড়ী। সারা দিনরাত সে টেকো ঘুরিয়ে মানুষের ভাগ্যের সুতো বোনে আর সুতোর গোলাগুলোকে উপত্যকাতে ছুঁড়ে দেয়। জোর হাওয়া সেই গোলাগুলোকে এদিক ওদিক ছাড়িয়ে দেয়, সুতোগুলো ছিঁড়ে গিয়ে কখনো গোলাপবনের কাঁটায় আটকে যায়, কখনো পাহাড়চূড়ায় উঠে যায় কখনো বা নদীতে পড়ে স্রোতে ভেসে যায়। আর কখনো কখনো ডাইনী শয়তানী করে মানুষের ভাগ্যের সুতোকে জট পাকায়, গোলাগুলোকে ছিঁড়ে টুকরোগুলোকে বাতাসে উড়িয়ে দেয়... সেইজন্যই পৃথিবীতে এমন সব উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটে, তাই মানুষের এত দুঃখ, এত অশ্রুজল। একজন মানুষের ভীষণ কষ্ট, অন্যজন আরামে আছে, তুমি কষ্ট পাচ্ছ কোন রোগে, আর অন্য কেউ খুব উন্নতিলাভ করছে, যদি তোমার প্রতিবেশী গৃহহীন হয় আর কোনো বদমাশ লোক ইমারত তৈরী করে তো এই সমস্তের জন্য দায়ী সেই ডাইনীবুড়ী, মানুষের ভাগ্যের সুতো যে তার হাতে ধরা। তুমি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে পৃথিবীতে নিজের মাথা গোঁজার জায়গাটুকু ধরে রাখার চেষ্টা করছ, এমন সময় ডাইনীবুড়ী সুতোয় উল্টোপাল্টা টান দিল, ব্যস সব শেষ। সবাই বিনা প্রতিবাদে এই ডাইনীকে মেনে নিয়েছে। কারণ সে হল সময়... এখনো এমন সাহসী কেউ জন্মায় নি যে এই ডাইনীর সঙ্গে লড়বে আর মানুষকে এই দুঃখকষ্টের হাত থেকে বাঁচাবে।

পেরি-খালা ঐ ডাইনীর ক্ষমতায় বিশ্বাস করত — বাবা তার আদরের মেয়েকে তো আর বাজে কথা বলেন নি। কিন্তু তার চোখে এখনও অবাধ আশার আগুন নেভে নি। আর দিনে রাতে, শীতে গ্রীষ্মে সে অপেক্ষা করত কোনো এক অলৌকিক ঘটনার যা তাকে সুখ এনে দেবে যেমন বসন্তের ঠাণ্ডা মাটিতে জন্ম নেওয়া সুগন্ধী ভায়োলেট ফুল সূর্যরশ্মির পরশের অপেক্ষায় থাকে... যেমন মাটি, শীতের পরে সবে ফুটতে থাকা আপেল কুঁড়ি, পাহাড়ের চূড়ায় নরম-সবুজ ঘাস সবাই অপেক্ষা করে আছে ধৈর্য নিয়ে সূর্যের জীবনদায়িনী উষ্ণতার জন্যে। পেরি-খালা জানত যে সারা গ্রাম, সব মানুষও এই আগামীকালের সুখের আশায়, বিশ্বাসে বেঁচে আছে। তাই সব মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে মিলিয়ে দিয়ে পেরি-খালা হৃদয়ে যেন কি আনন্দ উপভোগ করত, তার কানে বাজত যেন ঘুমপাড়ানি গানের মত মিষ্টি সুর আর তার চোখে ভাসত গ্রামের

প্রান্তে মাটির বাড়ীটির, তার জানলার সামনে ছোট্ট আপেল বাগানটির দৃশ্য।

আজও সেই সময়েই যেই সে গ্রামের বাইরে বেরিয়ে এল পেরি-খালা ঐ বাড়ী, বাগানটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল; সে এমন মগ্ন হয়ে তাকিয়ে ছিল যে লক্ষ্যও করল না একটা লাল বাছুর দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সবুজ গমের ক্ষেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখান থেকে পেরি-খালা দেখতে পাচ্ছে যে, বিষ্টিতে পেছন দিককার বহুদিন মাটি-না-মাখানো দেওয়াল একেবারে ধুয়ে গেছে। আর বছর দুই মাটি না লেপা হলে, রঙ না করা হলে দেওয়াল ভেঙে পড়বে। নলখাগড়া দিয়ে ছাওয়া ছাতে গর্ত দেখা দিয়েছে, হাওয়া, বিষ্টি সেখান দিয়ে ঢুকে ঢুকে গর্তটাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। আর বাগান!.. তাকালে কষ্ট হয়। কতদিন কেউ গাছগুলির যত্ন করে নি, শুকনো ডালগুলো কেটে ফেলে নি, ম্যাটি কোপায় নি, তাই গাছগুলো পেরি-খালার মতই সময়ের আগেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। অনাথ আপেল গাছগুলি যেন কেঁদে বলছে: 'আমাদের মালিক, তুমি কোথায় গেলে? এস।' তাদের দুঃখ দেখে পেরি-খালার হৃদয় দুঃখে ভেঙে যেতে লাগল। তার চোখে একটু আগে যে আশা জ্বলছিল, তা নিভে গেল, যেন হৃদয়ের গভীর থেকে বেদনার কুয়াশা উঠে এসে তাকে ছেয়ে ফেলল। রোদেপোড়া, চামড়া কোঁচকান গালের ওপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

'এই পেরি-খালা চোখ মেল, ওঠ।' কার যেন জোরাল গলা শোনা গেল। 'লাল বাছুরটা যে বেকের খেত ন্যাড়া করে দেবে।'

এ হল খেতমজুর ভেলি যাকে গ্রামে তার বেপরোয়া তামাসার জন্য সবাই জানে। সে হাসত, ঠাট্টা করত যখন সে খালিপেটে থাকত আর যখন সে ভরপেট খেতে পেত তখনও, যদিও তা খুবই মাঝে মধ্যে হত। সে মৃদু হাসির সঙ্গে ভাগ্যের সব বিধানের মুখোমুখি হয়, আর সময় নামের সেই ডাইনীবুড়ী যে লোকের সুখ ছিনিয়ে নেয় সেও ভেলির কাছে অসহায় হয়ে পালিয়ে গেছে।

'হঠাৎ আবার তোমার কি হল পেরি-খালা? জীবনে তো দুঃখ কম দেখ নি?' খুশী খুশীভাবে জিজ্ঞাসা করল ভেলি। 'এবার একটু আনন্দ কর।'

কিন্তু কাছে এসে সে পেরি-খালার বিবর্ণ চোখে অশ্রু দেখতে পেল আর দেখল যে তার চোখের দৃষ্টি আপেল বাগানে ঘেরা ইঁটের বাড়ীটির দিকে, তখন সে সব বুঝতে পারল।

'পোড়া কপাল।' গজগজ করে বলল ভেলি, তারপর পেরি-খালাকে

বসিয়ে দিয়ে নিজেই লাঠি উঁচিয়ে ছুটে গেল বেকের খেতের দিক: 'এই মর তুই, দূর হ!'

আর পেরি-খালারও সত্যি সত্যি এই আনন্দোচ্ছল লোকটির আবির্ভাবে ভালই লাগল, মনে হল ঐ ছোট্ট ঘরটাও তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। 'আমাদের ধুলো ঝেড়ে দেওয়াল রঙ করে জানলার কাঁচ ধুয়ে ফেলা উচিত ছিল তোমার অনেক দিনই। আমাকে ভুলে যেও না! আমি তো তোমাকে সুখ দিয়েছি! আমাকে ভেঙে পড়তে দিও না, বাঁচাও!' যেন কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভাবে দুঃখিত পেরি-খালা উত্তর দিল: 'আমার ঘর! আমার জীবনের সুখের দিনগুলি তোমার মধ্যে রয়ে গেছে। এখানে আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে... আমার শিশুরা তোমার মাটির মেঝেতে প্রথম পা' ফেলেছে, তোমার ছাদের নীচে প্রথম কথা বলেছে। তুমি ভেঙে পোড়ো না, একটু অপেক্ষা কর। আমি ভেঙে পড়ি নি, তুমিও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাক।'

মাঠ থেকে ধেয়ে আসা হাওয়ার দমক আপেল গাছের ডালপালাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল, তারাও যেন নড়েচড়ে ফিসফিসিয়ে পেরি-খালাকে বলল: 'গ্রীষ্মে কেউ আমাদের আর প্রস্রবণের জল এনে দেয় না, বসন্তে কেউ আমাদের মাটি কুপিয়ে দেয় না। পাশ দিয়ে যাওয়া লোকেরা ইচ্ছেমত আমাদের ডাল নুইয়ে অপক্ক ফল ছিঁড়ে নেয়, আমরা বহুদিন সূর্যের তাপ আর মাটির রস শুষে নিয়ে বড় হয়ে ওঠা নিজেদের ফল দেখতে পাই নি। তুমি তো নিজেই দেখেছ মায়ের বুক থেকে সন্তানকে ছিন্ন করে নিলে কি হয়। আমাদের দুঃখ এখন সেই রকমই। তুমি এস, আবার আগের মত আমাদের যতন কর।'

বহুশাখা বিশিষ্ট এক বিরাট আপেল গাছ, যে গ্রীষ্মকালে বাড়ীর সামনে ছায়া দিত আর শীতকালে পাহাড়ী ঠাণ্ডা হাওয়াকে আটকাত সে যেন একটু বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

তার কারণও ছিল: এই বাগানের শুরুই ঐ সুন্দর গাছটি থেকে। তাকে বসিয়েছিল পেরি-খালার স্বামী কিয়াজিম, তাদের বিয়ের পর দিনই। যখন গাছটি বেড়ে উঠছিল, পেরি-খালা তাকে নদীর জল দিত অনেক। আর যখন গাছটি বিরাট বিরাট শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করে বেড়ে উঠল তখন পেরি-খালা চন্দ্রালোকিত রাত্রে, সূর্যালোকিত দিনে তার সুগন্ধি চাঁদোয়ার নীচে, সাংসারিক জীবনের সুখ, দুঃখ, ভালবাসা সবকিছু তার স্বামীর

সঙ্গে ভাগ করে নিত; এইখানেই সে তার শিশুদের ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে শুনিয়েছে।

এই দুই-জানলা বিশিষ্ট বাড়ীটি, এই প্রস্ফুটিত আপেল বাগান, এই তাদের পরিবারের বহুবছরের কষ্টের ফল, তাকে যেন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিল এক দারুণ ঝড়। পেরি-খালা নিজের নাম ভুলে যেতে পারে, ভুলতে পারে তার প্রথম সন্তানের নাম, কিন্তু সেই সন্ধ্যার কথা সে কোনদিনই ভুলতে পারবে না...

কিয়াজিম শীতের শস্যে জল দিয়ে খেত থেকে ফিরেছে; ছেলে নাজিম মেষপালক বন্ধুদের সঙ্গে পাল তাড়িয়ে নিয়ে ঘরে ফিরেছে, দশবছরের জন্মরুগ্ণ মেয়ে তোল্লি হঠাৎ দারুণ উচ্ছল হয়ে উঠেছিল ঐ সন্ধ্যায়। এসব দেখে আনন্দে পেরি-খালা যেন বাড়ীতে বাগানে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সব কাজ তার দক্ষ হাতে চটপট করা হয়ে যাচ্ছিল। সে সন্ধ্যাটা ছিল পরিষ্কার উষ্ণ, আপেল গাছের নীচে রাতের খাওয়া সারা হল পেরি-খালা ছোট তামার সামোভার বসাল, বাসন গুছাল, এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ বাড়ীর পেছন থেকে দেখা দিল শাহবাজ-বেক আর তার দু'জন দেহরক্ষী।

কার্পেট থেকে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে কিয়াজিম আর নাজিম সম্মানিত অতিথিকে অভিবাদন জানাল, বসার আমন্ত্রণ জানাল। পেরি-খালা তখনকার নিয়ম অনুযায়ী মুখ ঢাকল রুমালে, একপাশে সরে দাঁড়িয়ে রইল স্বামীর আদেশের অপেক্ষায়।

বেক কিন্তু বসল না, কিয়াজিমকে কাছে ডেকে আস্তে করে কি যেন বলল। পেরি-খালা দেখল স্বামীর সারা দেহ কেমন কেঁপে উঠল, তার কাঁপা গলা শোনা গেল:

'তোমার সন্তানদের ক্রীতদাস হয়ে থাকব দয়ালু বেক, কেবল প্রার্থনা করি এমন অন্যায় আমার প্রতি কোরো না।'

'শোন, তোর কাছে তো একই কথা।' রেগে চেঁচিয়ে উঠল বেক। 'তোকে এই রকমই ছোট বাড়ী সমেত জমি দিচ্ছি, বাগান তৈরী করতেও সাহায্য করব!.. এই জায়গাটা আমার বড় ভাল লাগে। এখানে আমি নিজের জন্য বাড়ী তৈরী করব। বারান্দা থাকবে। উঁচু ছাত।'

'মরে গেলেও রাজী হতে পারব না, বেক।' দৃঢ়ভাবে বলল কিয়াজিম; সে বুঝল যে বেককে অনুরোধ করে কোন ফল হবে না।

'রাজী হবি না আবার কি!' অবহেলার ভাবে হাত নাড়িয়ে বলল বেক, তার দেহরক্ষী দু'জন তাকে তোষামোদ করার জন্য হিহি করে হেসে উঠল। 'জমিটা তো এখনো আমার, সব দামটা দিস নি... চুপ কর! আমার জমিতে বসে ওস্তাদি মারা!'

'আমরা অনেক দিন আগেই ধার শোধ করে দিয়েছি।' নাজিম এবার আর চুপ করে থাকতে পারল না। 'তুমি ঠিক বলছ না।'

'কি বলছিস, বলশেভিক কুত্তা?' রেগে লাল হয়ে বেক বলল। 'কোথায় নাক গলাচ্ছিস?.. ভেবেছিস আমি কালা? না না, আমি সব শুনতে পাই, সব জানি। আর তোর অন্য রাখালদের সঙ্গে বিপ্লবী ধরণের কথাবার্তা আমি পুরোপুরি জানি।'

নাজিম ম্লান হয়ে গেল, কিন্তু শাহবাজ-বেকের ঘৃণাপূর্ণ চোখের দৃষ্টি থেকে চোখ নামাল না।

'জানি, জানি তোমার আর তোমার লোকেদের কান খুব সজাগ, সম্মানিত বেক।' বলল সে ব্যঙ্গের সুরে।

বুদ্ধিমান কিয়াজিম তারকে বেশী টানলে ছিঁড়ে যাবে বুঝতে পেরে ছেলেকে থামিয়ে দিল।

'চুপ কর্, বাবা! বেক আমাদের মালিক, অভিভাবক। আমার থেকে বয়সে বড়, তোর কথা তো কিছু বলারই নেই... সাহস দেখাস না, মেনে নে।'

'পিতৃউপদেশ দিতে তুই বোধ হয় একটু দেরী করে ফেললি!' হুমকির স্বরে বলল বেক আর পিছন ফিরে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল উঠান থেকে।

কয়েকদিন পরে নাজিম গ্রেপ্তার হল। অন্ধকার দিনগুলির হল শুরু। কিয়াজিমকে বারেবারে ডেকে পাঠান হত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। প্রতিদিন তারা বাড়ীতেও আসত, অহঙ্কারী আমলারা বাড়ীর দলিল দেখতে চাইত। কিছু কিছু দলিলপত্র পাওয়া গেল, আর কিছু কিছু হারিয়ে গেল। তখনকার দিনে গ্রামে বেচাকেনা হত মুখের কথায়, বিশ্বাসে, কাগজেকলমে হত না। শীগগির কিয়াজিমকেও ঘোড়ায় চড়া পাহারাদার শহরে ধরে নিয়ে গেল। এরপর পেরি-খালা আর ছোট তেল্লিকে বেকের লোকেরা ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল। আরো দুঃখের খবর এসে পৌঁছল, গারদে কিয়াজিমের মৃত্যু হয়েছে, তাকে মেরে মেরেই শেষ করে দিয়েছে... রুগ্ণ ছোট্ট তেল্লিও শেষ হয়ে গেল যেমন মোমবাতিতে হাওয়া লাগলে নিভে যায়

তেমনি!.. শরতের আকাশের নীচে পেরি-খালা একেবারে একা হয়ে গেল, কেউ তাকে আহাও বলে না, কেউ আশ্রয়ও দেয় না শাহবাজ-বেকের ভয়ে। খেতমজুর ভেলির তাতে কিছুই যায় আসে না, সে পেরি-খালাকে আশ্রয় নিতে বলল সেই গোয়ালঘরে যেখানে সে নিজেও থাকত।

বেচারী দিনমজুর হিসাবে কাজ আরম্ভ করল — কখন কারুর গরুর পাল চরায়, কখন গোয়াল থেকে গোবর সাফ করে, কখনও কারুর বাগানে মাটি কোপায়...

হারিয়ে যাওয়া সুখ ফিরিয়ে আনতে কে তাকে সাহায্য করবে? কে তার হয়ে কথা বলবে? কিয়াজিমের পরিবারকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, কিন্তু তার ছেলে নাজিমকে জেল থেকে মুক্ত করা যায় না কি? আর সেই এখন পেরি-খালার একমাত্র সান্ত্বনা... কিন্তু সে বোধহয় অসম্ভব আশায় মিথ্যা কষ্ট পাচ্ছে। না, পৃথিবীতে এমন শক্তি নেই যা অহংকারী শাহবাজ-বেকের সঙ্গে লড়তে পারে; সমস্ত ওপরওয়ালা যে তার বন্ধু, এক গেলাসের ইয়ার...

ভেলি ইতিমধ্যে বেহায়া বাছুরটাকে বেকের খেত থেকে তাড়িয়ে দিয়ে পেরি-খালার কাছে এল। তার কাছে ঘাসে বসে থলি থেকে এক টুকরো যবের রুটি আর দুটো ডিম বার করল। তার হাতগুলো বড় বড়, রুক্ষ, কিন্তু সে নিজে ছোটখাট, শক্তপোক্ত। বড় বড় হাত দিয়ে সে রুটি ছিঁড়ে পেরি-খালাকে দিল।

'মন খারাপ কোরো না, মাসী। নাও, একটু খেয়ে নাও... পৃথিবীতে কোন অপরাধ অমনি অমনি পার পেয়ে যায় না। এ আমি বিশ্বাস করি। তোমার ওপর যা অত্যাচার হয়েছে তার জন্য অপরাধীরা ঠিকই শাস্তি পাবে।'

গ্রামের লোকেরা কেউ কেউ মনে করত যে ভেলি অন্যের কষ্ট দেখলেই এগিয়ে যায়, কোন অন্যায় সহ্য করতে পারে না, তার একমাত্র কারণ পৃথিবীর সবকিছুর প্রতি তার প্রচণ্ড উদাসীনতা। ওকে নিয়ে কিছু করা যাবে না। প্রায় তার মুখের ওপরই এমন ধরণের মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে: 'সুখী মানুষ। খিদে, ঠাণ্ডা কিছুতেই কষ্ট হয় না। এইভাবেই সারা জীবন গাছের ছায়ায় পড়ে থেকে কাটিয়ে দিবি।'

কিন্তু পেরি-খালা ভাল করেই জানত যে তা ভুল। যে ভেলি সবার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে ভালবাসত তার গভীরে ছিল ভালবাসায় ভরা হৃদয়, অত্যাচারিতের কষ্ট দেখলে তার থেকে রক্ত ঝরে।

এখন ভোলি ছেলের মত এই বুড়ীর দেখাশোনা করে, খাবার জন্য জোর করে।

'রাগ করিস না, এক ফোঁটা জলও নামবে না গলা দিয়ে।' বলল পেরি-খালা কিন্তু যাতে ছেলেটি রাগ না করে সেজন্য এক টুকরো শুকনো রুটি ছিঁড়ে নিল।

ছেলেটির মুখ ভর্তি রুটি, মুখেচোখে সুখের ছাপ। পেটভরে খেয়ে, বোতল থেকে জল খেয়ে, ভাল করে চারপাশ দেখে নিল সে, যখন নিশ্চিন্ত হল যে মাঠে গরু, ভেড়া ছাড়া ধারেকাছে আর কেউ নেই, তখন ফিসফিস করে বলল:

'জান পেরি-খালা, ফুটন্ত জলের পাত্রের ঢাকনা চেপে বন্ধ করা, কিন্তু ভাপ ভেতরে গর্জন করে উঠেছে!.. শীগগির আমাদের সুখের দিন আসবে, মাসী। ওদিকে মালিকরা গরম অঞ্চলগুলিতে পালিয়ে যাবার যোগাড় করছে।'

'কোন মালিকরা?' পেরি-খালা আত্মমগ্ন চোখের দৃষ্টি মাটির বাড়ী আর বাগান থেকে সরিয়ে এনে ভোলির দিকে দেখল বিস্মিত হয়ে।

'ওই যে ওরা...'

আর ভোলি নীচু গলায়, যাতে খালি পেরি-খালা শুনতে পায়, এমনভাবে গেয়ে উঠল:

খাও দাও, মজা কর প্রভুরা।
ক্ষুধার্ত ভৃত্যদের কষ্টে তোমাদের কি।
তোমরা খাও গমের রুটী আর আমরা কামিনীদানার,
কিন্তু উনুনটা তো একই ইঁট দিয়ে তৈরী।

'বুঝেছ?' জিজ্ঞাসা করল সে, কিন্তু পেরি-খালা যেন কিছুই বুঝতে পারে নি, ভোলি উত্তেজিতভাবে বলল: 'শাহবাজ-বেক, সুলতানোভরা আর অন্য ভেড়ার চামড়ায় ঢাকা নেকড়েরা — ঐ মালিকদের কথাই বলছি।'

'জানি না, বাবা, জানি না।' ক্লান্তভাবে নিশ্বাস ফেলল পেরি-খালা। 'একমাত্র আল্লাহ্ এখনকার এসব ব্যাপার-স্যাপার বুঝতে পারবেন। সোনা আর স্বার্থে পূর্ণ শয়তানের মন্দির অবশ্যই ধ্বংস হবে... পিঁপড়ের যখন মৃত্যু এগিয়ে আসে তখন তার পাখনা গজায়। আমাদের হুকুমদাতা

বেকেদের পাখনা গজিয়ে গেছে, ছোরার মত দেখতে শিং গজিয়েছে। কিন্তু আমি দেখছি মানুষের ভাগ্য আর অবাক হচ্ছি: কখনও ভাগ্য মানুষকে পাহাড়ের থেকেও উঁচুতে তোলে, কখনও বা তলহীন গভীরে ছুঁড়ে ফেলে। এই ভাগ্যকে নিয়ে যে কি করা যায়? কে জানে তার কপালে কাল কি আছে, তার ভবিষ্যৎ কি? তাই আমারও মনে হয়, শাহবাজ-বেকের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারবে না...'

'আরে মাসী তুমি দেখেছ যেসব বিশাল গাছ ছিল এখন তাদের টুকরো টুকরো করে ফেলা হচ্ছে।' প্রতিবাদ করল ভেলি। 'এখন অন্য দিনকাল। লেনিন — শুনেছ এ নাম? লেনিন রাশিয়াকে উল্টোপাল্টা করে দিয়েছেন, পিটার্সবুর্গে তাঁর শ্রমিক আর কৃষকদের সরকার। সোভিয়েতদের হাতে ক্ষমতা!' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল ভেলি। 'লেনিনের নাম শুনলেই এই অভিজাত বেকেরা কাঁপতে থাকেন। শাহদাগ পাহাড়ের ওপারে আমাদের দাগেস্তানী ভাইরা ইতিমধ্যে লেনিনের পতাকাতলে এসে সমবেত হয়েছে। এ আমি ঠিক জানি... আজকালের মধ্যে বাকুর তেলশ্রমিকরাও আরম্ভ করবে। তুমি পেরি-খালা আমার কথা বিশ্বাস কর না, কিন্তু লেনিন একমাত্র লেনিনই তোমার ছেলে, বাড়ী, বাগান সব ফিরিয়ে দেবেন। লেনিন নিজে।'

শীতের সন্ধ্যাগুলিতে যখন গরুর হাম্বারব আর ভেড়ার ব্যা ব্যা শীতের অন্ধকার নিস্তব্ধতা ছিন্ন ভিন্ন করে দিত তখন ভেলি প্রায়ই উত্তেজিত হয়ে মাসীকে লেনিনের কথা বলত। যে খেতমজুর চিরকাল নোংরা ঘেঁটেই কাটাল, যে মনে হয় ভেড়ার নোংরা লেজটা ছাড়া আর কিছুই দেখে নি দেখা গেল সে বেশ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, এই এত দূরে থেকে, এই খোদারও ভুলে যাওয়া গ্রামে থেকেও সে জানত পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটছে। যেন আল্লাহ্ নিজে তাকে পাঠিয়েছেন পেরি-খালাকে আনন্দ দিতে, বাঁচিয়ে রাখতে তার দুঃখের দিনে, তার রক্ষক আর নির্ভর হতে। কৃতজ্ঞ পেরি-খালা ছেলেটির জীবন আর সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করত।

'বিশ্বাস করি, কেন করব না?' বলল পেরি-খালা, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শোনাল যেন অনিশ্চিত। 'আল্লাহ্ নিজে যদি তোর মুখ থেকে এমন খবর শুনতেন বাছা!.. দেখছি লেনিনের সম্বন্ধে ভাল কথা বলে তারাই যাদের প্রদীপটা নিভে গেছে, আর একটা তামার পয়সাও নেই যে কেরোসিন কিনবে। সব ক্ষুধার্তের পেট ভরানোর, সব অত্যাচারিতকে শান্তি দেওয়া কি লেনিনের ক্ষমতায় কুলোবে? আল্লাহ্ তাঁর শক্তি বাড়িয়ে দিন আর

সময় নামক ডাইনীবুড়ীর ছলের হাত থেকে বাঁচান। তুই যখন লেনিনের নাম উচ্চারণ করিস আমার প্রাণ যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে !..'

পেরি-খালা উঠে এগিয়ে গেল গমখেতের দিকে যেখানে আবার লাল বাছুরটা খাবার চেষ্টা করছে।

৩

শাহবাজ-বেক আর সেই টুপি কোট পরা, ম্লান ধারালমুখ ক্রেতাকে আর কখনও গ্রামে দেখা যায় নি। কেউ জানেও না তাদের বেচাকেনা ভালয় ভালয় মিটল নাকি। চাষীরা বলাবলি করতে লাগল যে, বেক ধূর্ত, মতলববাজ — এখন সময় খারাপ তাই এই ইজারাব্যবস্থায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া, দরিদ্র গ্রামগুলির হাত থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য তাদেরকে সোনায় পরিণত করতে চাইছে। সোনা সব সময়ই সঙ্গে নিয়ে চলে যাওয়া যায়। এমনকি গ্রামের পণ্ডিতরাও বুঝতে পারলেন না ঐ ক্রেতা চালাক না বোকা... চাষীদের মনে ঐ ক্রেতা একটুও ছাপ ফেলে যায় নি। সে একবারও মুখ খোলে নি, একটা কথাও বলে নি, দেখা হওয়া লোকদের কাছে কোনো কিছু সম্বন্ধে জানতে চায় নি, একবার খালি একটু বাঁকা হাসি হেসেছিল। তার কি গ্রামটা ভাল লেগেছে ? যেমন এসেছিল এক কোণায় বসে, সেইভাবেই ফিরে গিয়েছিল।

কিন্তু শাহবাজ-বেক আর অজানা ক্রেতার সঙ্গে সঙ্গে রাতের বেলায় খেতমজুর ভেলি আর মেষপালকের দলও কোথায় যেন চলে গেল, তারা কি অন্য জায়গায় সুখের সন্ধানে গেল ? দিনের পর দিন যায়, কিন্তু ছেলেগুলির কোন খবরই নেই, যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

আবার গ্রামে বিভিন্ন ধরণের কথা শোনা যেতে লাগল। কেউ কেউ বলল যে তারা বাকুর তৈলাঞ্চলে চলে গেছে। জাফর-আমি তাদের আচরণকে সমর্থন করল:

'বেচারীরা গ্রামে বসে থেকেই বা কি করবে ? এখানে সবাই খালি হাত বাড়িয়েই আছে 'দাও, দাও,' কখনও শুনি নি যে কেউ মহত্ব দেখিয়ে বলেছে 'নাও !' চাষীরা চিরকালই ক্ষুধার জ্বালায় ভুগেছে। এই হয়ে এসেছে, হয়ে যাবেও এ যুগের শেষ পর্যন্ত। আর ছেলেগুলো শ্রমিক হবে, আরো কিছু হবে দেখো !..'

অনেকে মনে করত যে তারা গ্রেপ্তার হয়েছে, জেলে পচছে। বিচক্ষণ গাজী গদুদু সেই কথাই জোর দিয়ে বলতে লাগল:

'ভর দিনের বেলায়, এত লোকের সামনে ওই নোংরা কুত্তার বাচ্চাটা সম্মানিত বেককে অপমান করল। ওর অন্য কিছু হতেই পারে না।' সবকিছুর জন্য সে ভেলিকেই দায়ী করত। 'ওটার জন্য আমার একটুও কষ্ট হয় না, কিন্তু ওর জন্য বেচারী মেষপালকগুলো কষ্ট পাচ্ছে।.. শুকনো কাঠগুঁড়োর জন্য ভেজা কাঠও ছাই হয়ে গেল। বিদ্রোহী নিজের সঙ্গে আর পনেরোটা নির্দোষ ছেলেকেও কষ্টের পথে নিয়ে গেল। বৃদ্ধরা বলে থাকেন: জাহান্নমের পথে যাবার সময় লোকে বিশ্বস্ত সঙ্গী খোঁজে...' চুপ করে ভীরু শ্রোতাদের ওপর তার কথার ফল উপভোগ করে গাজী বলল: 'ঐ প্ররোচকটাকে কখনও সহ্য করতে পারতাম না!'

পেরি-খালা এই সব কথাবার্তা উদাসীন ভঙ্গিতে শুনত, যদিও আগে সে ভেলির পক্ষে কথা বলত। কিন্তু উদাসীন এই কারণে নয় যে দুঃখে তার হৃদয় শুকিয়ে গিয়েছে, তার কারণ হল একমাত্র সেই ভেলি আর মেষপালকদের ঐ রক্তমাখা পথে যাবার সময় বিদায় জানিয়েছে।

গভীর রাত্রে গোয়ালের দরজা বন্ধ করে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে ভেলি মাসীকে বলেছে: 'তারারা ঝলক দিচ্ছে, ভোর হয়ে আসছে, পেরি-খালা। দূরের হাওয়া আমাদের জানলায় ধাক্কা দিচ্ছে। আমাদের যেতে হবে, কারণ এবার আমাদের আজেরবাইজানের পালা এসেছে। সময় এসেছে, হয় আমরা নয় ওরা বেঁচে থাকবে।। লোকে বলে, খারাপ ফল পাবার জন্য তৈরী থাক, তাহলে ভাল ফল পাবে... যদি মরি, ভুলে যেও আমার দোষত্রুটি। যদি কখনও তোমার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, মাফ কোরো। পেরি-খালা তুমি আমার নিজের মায়ের মত!'

'আমার দুই ছেলে — নাজিম আর তুই।' বলল পেরি-খালা আর এই কঠিন পথে যাত্রার আগে তাকে আশীর্বাদ করল। সে প্রাণ দিয়ে বুঝতে পারছিল যে এই পথ বিপজ্জনক, কিন্তু করার কিছু নেই। ভেলি তার পূর্বসিদ্ধান্ত পালন করতে বাধ্য। 'তোর মঙ্গল কামনা করি, বাছা।'

'পেরি-খালা, কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও না জানে।'

'মরে গেলেও না।'

ভেলি প্রদীপটা নিভিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে, সবকিছু অন্ধকারে ঢেকে গেল, খালি দরজার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ শোনা গেল।

তখন পেরি-খালা হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে গেল তার পিছনে, তার কাঁধে হাত দিয়ে থামাল তাকে।

'কি, মার্মান ?' বলল ভেলি।

এত কষ্ট সহ্য করার জন্য যেন সে পুরস্কার পেল, কতদিন কেউ তাকে মা বলে ডাকে নি...

'তুই লেনিনের কাছে যাচ্ছিস বাবা। আমি এতক্ষণে সব বুঝলাম... লেনিনকে বোলো — আজেরবাইজানের দূর এক গ্রামে আলমামিকে থাকে তোর মা পেরি, সে লেনিনকে আন্তরিক শুভকামনা জানাচ্ছে, প্রার্থনা জানাচ্ছে যেন লেনিন ডাইনীবুড়ী 'সময়ের' হাত থেকে রক্ষা পায়।'

ভেলির বলা উচিত ছিল: 'কি বলছ পেরি-খালা, লেনিনের দেখা আমি কেমন করে পাব ?' কিন্তু পেরির মন খারাপ করে দিতে তার ইচ্ছা হল না। সবকিছুই হতে পারে। হঠাৎ যদি খেতমজুর ভেলি লেনিনের দেখা সত্যি সত্যিই পায় ?

'প্রতিজ্ঞা করছি, মাসী, কমরেড লেনিনকে তোমার কথা জানাব।' কাঁপা গলায় বলল সে তারপর রাতের কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

তারপর অনেক দিন কেটে গেল, ভেলি আর নাজিম সম্পর্কে পেরি-খালা কোন খবরই পায় নি। এমনিতে অনেক রকম খবরই আসছে, প্রতিদিন সকালে কোন না কোন নতুন খবর।.. জনগণ উত্তেজিত যেন সামনে কোন উৎসব, চাষীদের মুখগুলি উজ্জ্বল, হৃৎস্পন্দন দ্রুত উত্তেজনায়। যেন দূরে কোথাও, পাহাড়ে ঝড় উঠেছে, আর সেই মুক্ত বাতাসের প্রথম ঝাপটা গ্রামেও এসে পৌঁছেছে।

বসন্ত অনিবার্যভাবে ফুটে উঠল তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে। উজ্জ্বল সবুজ ঘাস কার্পেটের মত ঢেকে দিল মাটিকে। আপেল বাগানগুলি প্রথম কুঁড়িতে ভরে গেল। ঘাস, ফুল, ভিজে মাটির চমৎকার গন্ধ লোকের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছিল, প্রাণে আনন্দ আনছিল। আর পেরি-খালার বুকে হৃদয়ের বদলে নড়াচড়া করছিল একটা ভারী পাথর। তার ফাঁকা বাড়ী, ফুলফোটা আপেল বাগান সেই আগের মতই পড়ে রইল... মুসাভাতপন্থীদের পালিয়ে যাবার কথা শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু শাহবাজ-বেকের নিষ্ঠুর মোড়ল চাবুকটা হাতছাড়া করত না, পেরি-খালাকে এমন কি তার কুটীরের ধারেকাছেও আসতে দিত না।

'আমি বেকের বিশ্বাসী লোক।' সে কৈফিয়ত দিত পেরি-খালা আর

চাষীদের সামনে। 'বেকের আদেশ পালন কর্ তোর খোঁয়াড়ের মালিক তুই হবি। আর যতক্ষণ হুকুম পাব না, ঢুকতে দেব না।'

অবশেষে এল সেই বহু প্রতীক্ষিত দিন দিগন্ত লাল পতাকায় রাঙিয়ে, যে রাস্তায় নোংরার মধ্য দিয়ে কোনো এক সময়ে শাহবাজ-বেকের গাড়ী এসেছিল, সেই রাস্তায় দেখা দিল ঝড়ের মত ছুটে আসা অশ্বারোহীরা। কেউ তাদের মুখ আলাদা করে চিনল না কিন্তু বিদ্যুতের মত খবর ছড়িয়ে পড়ল:

'বলশেভিক! গেরিলা!'

মিনিটখানেকের মধ্যেই গ্রামের চত্বরে দেখা গেল ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে অস্ত্রসজ্জিত এক দল লোককে। তারা বিভিন্ন, অদ্ভুত অদ্ভুত পোশাকে সজ্জিত, কোর্তা আর লম্বাঝুলের কোট পরে, তুলোর জ্যাকেট পরে; কেউ বুট, কেউ নরম হাই বুট পরে। বন্দুক, পিস্তল সবার কুলায় নি। কারুর কারুর বেল্টের তলা দিয়ে উঁকি মারছিল দাদুর আমলের তরোয়াল, ছোরা। দলের আগে আগে আসছিল খেতমজুর ভেলি সুখী, উজ্জ্বল মুখ আর একটি অজানা ছেলে যার চুলগুলো সন্ন্যাসীদের মত লম্বা আর ঘন দাড়ি। তাদের পিছনে আনাড়ীর মত ঘোড়ায় বসেছিল সাহিস নাজার।

পেরি-খালা চুপ করে ভীড়ের একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ লোকেরা সরে গিয়ে তাকে যেন ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে দিল, যেন তারা বুঝতে পারল এমন দিনে তারই প্রথম সারিতে থাকা উচিত।

চটপট ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ভেলি মাসীকে নীচু হয়ে অভিবাদন জানাল আর আলিঙ্গন করল।

'এই তো আমাদের উৎসব, পেরি-খালা!.. কমরেড নারিমানভ মস্কোতে তোমার শুভেচ্ছা জানিয়ে দিয়েছেন কমরেড লেনিনকে। আমি এবার মস্কো অবধি যেতে পারলাম না, মাফ চাইছি... লেনিন খুব আনন্দিত হয়ে বলেছেন: 'পেরিমাসীকে ধন্যবাদ, তাঁর স্বাস্থ্য ও মঙ্গলকামনা করি!..' আর লেনিন আমার ভাইকে, তোমার ছেলে নাজিমকে নিজের গ্রামে ফিরতে আদেশ দিয়েছেন।'

ভেলি পেরি-খালার কাছে লম্বা চুলওয়ালা ছেলেটিকে নিয়ে এল। সে শ্রান্ত হলেও তার চাউনিতে সাহসী ভাব ছিল।

'চিনতে পারলে না? তোমারই যে!..'

'বাবা আমার!' হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল পেরি-খালা সীমাহীন আনন্দে, তারপরে জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল নাজিমের বাহুর মধ্যে...

জ্ঞান ফিরে পেরি-খালা দেখতে পেল যে ছেলের কোলে শুয়ে আছে। মিটিং শেষ হয়ে গেছে। সর্বগামী ভেলি এখুনি কৃষকদের সোভিয়েত পতাকার নীচে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে আগুনঝরা বক্তৃতা দিয়ে এরমধ্যেই আবার শাহবাজ-বেকের ছাতে গিয়ে উঠেছে লাল পতাকা টাঙানোর জন্য। কোদালের হাতলটা হল পতাকাদণ্ড। লাল কাপড়ের টুকরোটির প্রান্ত চুম্বন করে ভেলি সেটাকে লাগিয়ে দিল পতাকাদণ্ডের সঙ্গে, সোজা হয়ে দাঁড়াল তারপর চেঁচিয়ে উঠল সমস্ত শক্তি দিয়ে:

'লেনিন জিন্দাবাদ! সোভিয়েত আজেরবাইজান জিন্দাবাদ!'

'জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!' চত্বরে শোনা গেল জোর চীৎকার।

হাওয়া পতাকাকে দোলাতে লাগল আর তা গর্বিতভাবে যেন জ্বলতে লাগল মানুষের হৃদয়ে আনন্দ, উদ্দীপনা এনে।

পেরি-খালা ইতিমধ্যে স্বাভাবিক হয়েছে। তার বিশ্বাস হয়েছে যা কিছু ঘটছে এটা স্বপ্ন নয়। তার ছেলে বেঁচে আছে আর সে তার কাছেই। এবার সে উঠে সুনিশ্চিত পদক্ষেপে নিজের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। নাজিম আর ভেলি চুপ করে চলল তার পিছনে। একটুও কান্নাকাটি না করে, কোন কথা না বলে পেরি-খালা মাটিতে হাঁটু দিয়ে বসে পড়ে বাড়ীর দোরগোড়ার জমিকে চুম্বন করল। বাগানে ফুলে ভরে ওঠা আপেল গাছগুলি যেন সেজেগুজে উঠেছে — পেরি-খালা তাদের আদর করার জন্য এগিয়ে গেল — গাছের গুঁড়িতে, ডালপালাগুলোয় কাঁপা কাঁপা চামড়া কোঁচকানো হাত বোলাতে লাগল।

আবার ফিরে পাওয়া বাড়ীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করার ভয়ে, ভেলি আর নাজিম সবথেকে ছড়ান আপেল গাছটার নীচে মাটিতে বসল। পেরি-খালা সারা বাগান, বাড়ী ঘুরে দেখে তাদের কাছে এসে ঘাসের ওপর বসল। তার চোখে যেন ঝড়ের পরের শান্ত স্তব্ধতা। পেরি-খালা যেন নিজের মনেই কথা বলল:

'দেখা যাচ্ছে, স্বপ্নও কখনো কখনো সত্যি হয়!.. আগে তো আমি কখনও এমন সুন্দর দিনের স্বপ্নও দেখি নি।'

ভেলি চেয়েছিল সেইরকমই আস্তে নীচু সুরে উত্তর দিতে। কিন্তু তার গলা বেজে উঠল দারুণ জোরে গমগম করে:

'এই তো সবে শুরু পেরি-খালা, আরো অনেক কিছু দেখবে। এমন দিন আসবে যা ভাবলে প্রাণে আনন্দ হয়।'

পেরি-খালার আবার সেই ডাইনীবুড়ি 'সময়ের' কথা মনে পড়ে গেল আর বুক ভয়ে হিম হয়ে গেল, ফিরে পাওয়া সুখকে আগলে রাখার চেষ্টায় ফিসফিসিয়ে বলল:

'বাবা ভেলি তোর কথামতই যেন সব হয়। পৃথিবীর আর আকাশের মালিক তোমাদের রক্ষা করুন ঐ ডাইনীর হাত থেকে!'

৫

শাহবাজ-বেকের বাড়ীর ছাদে যেদিন সোনালী লাল ঝলক ছড়িয়ে লাল পতাকা উড়ল সেদিন থেকেই গ্রামের জীবনধারা অন্য পদ্ধতিতে চলতে লাগল।

কিন্তু শাহবাজ-বেকের মোড়ল শান্ত না হয়ে আজেবাজে কথা বলে বেড়াতে লাগল:

'নসীবের চাকা আবার কখনো কখনো উল্টো দিকেও ঘোরে। দাঁড়াও, শীগগির দেখা দেবে নতুন পয়গম্বর — মহান মেহতি, যারা সমাজব্যবস্থায় এই উল্টোপাল্টা করেছে তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন।'

গাজী গুলু কয়েকদিন বাইরে বেরোয় নি, ঘরে বসেই ছিল, তারপর হঠাৎ সাহস করে কোটের বোতাম খোলা অবস্থায় রাস্তায় বেরিয়ে এল, কোমরে পিস্তল গুঁজে যেতে থাকা ভেলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল:

'দেখ দিকি, ওর হাঁটাচলাই কেমন বদলে গেছে! বাস, কি দারুণ হাঁটাচলা। যেন কবরখানার পাহারাদারের কুকুরের মত পেটে পিঠে মিশে যাওয়া সেদিনকার খেতমজুর নয়, যেন সত্যিকারের কের-অগলু*!.. এসব সমাজব্যবস্থা জ্বলে যাক।'

ভেলিকে তো আগেও রাগান যেত না, আর এখন সে গ্রামের মোড়ল, ধনীদের দিকে দেখে চিলের দৃষ্টিতে।

---

* কের-অগলু — আজেরবাইজানের উপকথার নায়ক, ন্যায় ও জনগণের সুখী জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামী বীর। — সম্পাঃ

'এই, গাজী, কি গজগজ করছ?' জোরে বলল ভোলি। 'এখনকার ব্যবস্থা জ্বলে যাবে না, জ্বলে যাক কিছু লোকের ঘৃণ্য দৃষ্টি।'

সঙ্গে সঙ্গে তাদের চারপাশে শ্রোতার ভীড় জমে গেল।

নিরীহভাবে গাজী গুলের মোটা ভুঁড়িতে চাপড় মেরে, গতকালকের খেতমজুর বলল:

'আমরা এই এখান থেকে বাড়তি চর্বি গালিয়ে বের করে নেব! পেটটাকে একটু ঝাঁকান দেব!'

'এ তোমার সূর্যমুখী তেল নয় যে চটপট গলে যাবে।' বলল গাজী, ভেতরে ভেতরে সান্ত্বনা পেতে লাগল এই ভেবে যে এসবই এই ছেলেটির ঠাট্টাতামাসা, সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কোন সূচনা নয়। বাড়ী গিয়ে দারুণ সুস্বাদু ভেড়ার মাংসের সুপ খেয়ে ঘুম লাগাল...

কিন্তু যেই মিটিংয়ে ভোলিকে দারিদ্রসম্পর্কিত কমিটির সভাপতি করা হল, আর সে ধনীদের জমিসম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার কথা তুলল, সেই থেকে গাজী গুলের খিদে-ঘুম গেল, কোটের বোতাম ভাল করে এঁটে নিয়ে, রাগে গরগর করতে লাগল।

'কিয়ামত এসে গেছে!' বলল সে মোড়লকে আর তারই মত জমিদার বন্ধুদেরকে। 'শুনেছ, শুনেছ ঐ নির্বুদ্ধি, পাগলাটে পেরি-খালাকে গ্রাম সোভিয়েতের সদস্য করা হয়েছে!.. একটা মেয়ে, পুরুষদের ওপর, আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে। এ কি একেবারে ধর্মবিরোধী কাজ নয়?'

একবার গ্রামের এক মিটিংয়ে গাজীকে ডাকা হল — এখন প্রায় প্রতিদিনই মিটিং হয়। মিটিংয়ে পেরি-খালা বক্তৃতা দিচ্ছিল।

'আমরা, চাষীরা আগে যে জীবন যাপন করতাম তা মনে করলেও ভয় হয়,' বলল মাসী শান্ত মনোযোগী শ্রোতাদের, 'যেন আমাদের ভাঙা হাত-পা বেঁধে অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। সারা জীবন আমরা সূর্যের জীবনদায়িনী রশ্মি দেখতে পাই নি... এর থেকেও যা ভয়ংকর, তা হল আমরা কানা হয়ে গিয়েছিলাম, নিজেদের কষ্ট নিজেরা দেখতে পেতাম না, স্বাধীনতার জন্য আমরা অপেক্ষাও করতাম না। যে জ্ঞানী লোক আমাদের হাত মুক্ত করে স্বাধীনতা দিয়েছেন তিনি বলেছেন: 'লেখাপড়া শেখ, তোমাদের চোখে যে ঠুলি বাঁধা আছে তা ছিঁড়ে ফেল!..' তাই আমি, পেরি-খালা প্রস্তাব করছি লেনিনের উপদেশ কার্যকরী করার জন্য অবিলম্বে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার কাজ শুরু হোক।'

'প্রতিবাদ কর যদি, তাহলে এই মুহূর্তে ভেলি, সাহিস নাজার আর ঐ জেলখাটা আসামী নাজিম তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার গলার নলিটা কেটে ফেলবে।' ভাবল গাজী গুলু আর রাগ চেপে ভালমানুষ ভাব করে বলল:

'নিজের ইচ্ছায় না জোর করে?'

'কি?'

'মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা।'

পোরি-খালা কি উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। তার মাথায়ই আসতে পারে না এ চিন্তা যে লেনিনের নির্দেশ অগ্রাহ্য করতে পারে কোন মেয়ে।

কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ভেলি এগিয়ে এল তার হয়ে উত্তর দেবার জন্য:

'অবশ্যই নিজের ইচ্ছায়। আর সেই সমস্ত স্বামী, পিতারা যারা মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে যেতে দেবে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর বিপ্লবী আইন গৃহীত হবে।' আর বিশেষভাবে তাকাল গাজী গুলুর দিকে।

কোটের বোতাম চেপে লাগিয়ে গাজী তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে চলল। কয়েক দিন সে কোথাও বের হল না — গালগল্প করে বেড়ান বুড়ীদের ছড়ান গুজবেই সন্তুষ্ট থাকল। খেতমজুর ভেলি এত বেড়ে উঠেছে যে তার গেরিলাবাহিনীর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে জমি মাপা আরম্ভ করে দিয়েছে, জবরদস্তিমূলক এবং আইনবিরোধী পুনর্বণ্টন হচ্ছে! পোরি-খালা, ঐ ভিখারী মেয়েছেলেটা বাড়ী বাড়ী ঘুরে পুরুষ, মহিলা শিশু সবাইকে লেখাপড়া শেখার ক্লাসে আসার জন্য বোঝাচ্ছে। তারপর সে খবর পেল যে সাহিস নাজার সদরে গেছে শিক্ষক, বই, খাতা, পেন্সিল এ সবের জন্য। গাজী এই সব খবরে রাগে কেঁপে উঠছিল আর গালাগালি করছিল।

একদিন পোরি-খালা আর ভেলি তার বাড়ীতে গেল।

'স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের খালি কোরান পড়াব।' চেঁচিয়ে বলল গাজী, তাদের কথা পুরো না শুনেই। 'অন্য কোন বই ওদের চোখে দেখতেও দেব না!

পোরি-খালা তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল:

'গাজী, তুমি আমাদের গ্রামের সম্মানিত লোকেদের একজন। তুমি আগে আমাদের কথাটা শোনো তারপর তোমার বিবেক যা বলে তাই কোরো।'

'তোকে আর এই নোংরা খেতমজুরটাকে আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন আমাদের মত সাচ্চা মুসলমানদের কাছে শাস্তি হিসাবে।' বলে উঠল গাজী।

ভোলি হতাশভাবে নিশ্বাস ফেলে কাঁধ ঝাঁকাল।

'চল মাসী, কথায় বলে, যেমন মসজিদ তেমনই নামাজ... গাজী গুলের থেকে কোন সাহায্যই আমরা পাব না। কেবল কোন ক্ষতি যেন না করে। যাক্ যদি বেশী বিরক্ত করবে তো মরুভূমিতে একলা পড়ে থাকবে, নিজের ফাঁকা মাথায় নিজেকেই ঘুষি মারতে হবে!..'

তারা চলে গেল।

সত্যি সত্যি ভোলি আর পেরি-খালার এখন আজেবাজে কথায় নষ্ট করার মত সময় নেই — দারুণ জোর কাজ চলছে। ভোলি আরও বেড়ে উঠেছে, চেহারায় তাকে এখন আর কেউ, এমনকি বয়স্ক কৃষকেরাও 'খেতমজুর' বলে ডাকে না, ডাকে 'কমরেড ভোলি'। পেরি-খালারও পরিবর্তন হয়েছে: তার কাছে অনবরত আসত বিধবারা বিভিন্ন অনুরোধ নিয়ে, মেয়েরা আসত পরামর্শ নিতে; জেলাসদরে মিটিংয়ে তাকে ডেকে পাঠান হত; বেকের জমি ভাগ করে দেওয়ার সময় গ্রাম সোভিয়েতের নির্দেশ অনুসারে সেখানে উপস্থিত ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও নিজের বাড়ীটি আবার গুছিয়ে ফেলার কাজও করত: দেওয়ালে মাটি লেপেছে, ছাত নতুন করে ছেয়েছে, প্রস্ফুটিত বাগান ঘিরে বেড়া তৈরী করেছে। আগে গ্রামে মাটির বাড়ীর বাইরের দেওয়াল চুণকাম করা হত না। পেরি-খালা বাইরে থেকেও সাদা রঙ করল, ফলে দুই জানলার সেই বাড়ী পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। মাসীর উদ্যম সব স্ত্রীলোকদের ভাল লাগল, শীগগিরই গ্রামে নতুন প্রথা চালু হল। যখন বাড়ীগুলির সাদা দেওয়াল ঝকঝক করত, তখন উঠানে জঞ্জালের গাদা যেন কেমন বিরক্তি ধরাত। পেরি-খালা উঠান ঝাঁট দিয়ে জঞ্জাল পুড়িয়ে ফেলল, তার প্রতিবেশী মেয়েরাও তাই করল। সারা গ্রাম যেন সেজেগুজে উঠল।

বসন্ত আরো গরম হয়ে উঠতে লাগল, আর এক দিন পেরি-খালার বুক কেঁপে উঠল। সে লক্ষ্য করল যে সবথেকে বড় আপেল গাছটায় প্রথম ফল দেখা দিয়েছে, আকারে আখরোটের মতন সবুজ সবুজ আপেল। পেরি-খালা যেন নতুন জীবন পেয়েছে... প্রিয় কর্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করা সার্থক হয়েছে গাছটির, সে তার কর্ত্রীর যতনের মূল্য দিচ্ছে অঢেল ফলধারণ করে! এই সময় হিম, শুকনো বাতাস বা ডাল ভাঙা কোন কিছুতেই তার কোন ক্ষতি হবে না। 'যখন আপেলগুলি মিষ্টি রসে ভরে যাবে, তখন এক

ঝাঁড় আপেল তুলে লেনিনকে উপহার পাঠাব।' ভাবল পেরি-খালা। এ ইচ্ছাটা তার এত জীবন্ত যে উত্তেজনায় তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। 'লেনিনের সঙ্গে দেখা হলে, কথা বলা গেলে বেশ হয়।' নিজের মনে ভাবল সে। এ একটা এমন গোপন স্বপ্ন যে সে এমনকি তার ছেলে আর ভেলিকেও বলে নি — হাসাহাসি করবে...

দিন যায়, সপ্তাহ যায় কাজের মধ্যে দিয়ে, মিটিং, লেখাপড়ার ক্লাস সব কিছুতে, পেরি-খালার স্বপ্ন কিন্তু আরো জোরদার হয়েছে। মানুষ সব কিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। এমনকি নিজের স্বপ্নগুলিতেও। পেরি-খালাও সেইরকম অভ্যস্ত হয়ে গেছে, নিজেকেই বোঝায়: 'অসম্ভবের কি আছে এতে? লেনিন খান নন, বেক নন, অহংকারীও নন যে সাধারণ লোকের সঙ্গে দেখা করবেন না। তিনি আমাদের শিক্ষক, আমাদের উজ্জ্বল আশার প্রবক্তা। ভেলি তো তাই বলে...'

এখন পেরি-খালার অখণ্ড বিশ্বাস ভেলির কথায়।

'যদি লেনিন শোনেন যে আজেরবাইজানের এক চাষী মেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়, তার মনে জমে থাকা সব কথা বলার জন্য, তো তিনি নিজেই তাকে ডেকে পাঠাবেন।' নিজেকে বোঝাল সে।

কিন্তু সময়ের ডাইনীবুড়ীর চোখে ঘুম ছিল না, আবার সে মানুষের ভাগ্যের সুতোয় জট পাকাতে চাইল।

সকালবেলায় চেঁচামেচিতে পেরি-খালার ঘুম ভেঙে গেল: 'আগুন, আগুন!' সে ছুটে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে পেল গ্রাম সোভিয়েতের বাড়ীর ওপর — বেকের বাড়ীর ওপর — লাল পতাকা উড়ছে না, লোহার ছাদের নীচ দিয়ে ধোঁয়া পাক খেয়ে বেরিয়ে আসছে।

চাষীরা ছুটে এসে আগুন নিভিয়ে ফেলল, বাড়ীটা বাঁচাল, কিন্তু কে যে পতাকা ছিঁড়েছে কিছুতেই জানা গেল না। ভেলি আর নাজিম, সহিস নাজার আর চৌকিদার জাফর-আমিকে ডেকে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করল। ধরপাকড় আরম্ভ হল নিষ্ঠুরভাবে।

আর ঐ দিন সন্ধ্যাবেলায় বিস্মিত পেরি-খালা দেখল ক্লাশে এসেছে মাত্র পাঁচজন মহিলা, সাধারণত ত্রিশ বা তারও বেশী হয়। যারা উপস্থিত ছিল তারা দিশাহারাভাবে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মাসীকে বুঝিয়ে দিল:

'বলছে, আমরা লেখাপড়া শিখে ধর্ম নষ্ট করছি। নিজেদের লজ্জার পাত্রী করে তুলছি।'

'লেনিনের সরকারের আর বেশীদিন নেই!'

'নতুন সরকার এসে যারা লেখাপড়া শিখছে, তাদের ফাঁসী দেবে। আল্লাহ্‌র দোহাই পেরি-খালা আমাদের ওপর রাগ কোরো না, কিন্তু আমরা আর আসব না!..'

ইতিমধ্যে গালগল্প-ছড়ানো বুড়ীদের এবাড়ী ওবাড়ী ঘোরা আরম্ভ হয়ে গেছে, তারা ফিসফিস করে বলে বেড়াচ্ছে গিয়ানজা আর নুখে সোভিয়েত ক্ষমতার পতন হয়েছে, বেকের জমি যারা গরীবদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে, তাদের গ্রামের মাঝে ফাঁসী দেওয়া হয়েছে।

ভেলি ঘোড়ায় চড়ে জেলায় গেল সাহায্যের জন্যে; কারণ সে বা পেরি-খালা কেউই জানত না দ্বিধাগ্রস্তদের কি বলে বোঝাবে, কি করে ছদ্মবেশী শত্রুদের সঙ্গে লড়বে।

জেলা বিপ্লবী কমিটির সভাপতি গ্রামে এল, সুঠাম চেহারা, কোঁকড়া চুল, উজ্জ্বল-কালো চোখ ছেলেটি; সে যুদ্ধের পোশাক পরেছিল, টুপিতে তারা চকচক করছে।

মিটিং ডাকা হল। চাষীদের আসার তেমন ইচ্ছা ছিল না: বেকের গোপন সহচরদের, মুসাভাতপন্থীদের ভয় পাচ্ছিল কিংবা জমি পেয়ে যাবার পরে মিটিংয়ে তাদের আর আগ্রহ নেই।

বিপ্লবী কমিটির সভাপতি ভাল করে বুঝিয়ে বলল এই সদ্যজাত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পরিস্থিতির কথা, প্রতিবিপ্লবীদের মরিয়া প্রতিরোধের কথা আর দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করল:

'জনগণ, শ্রমিক ও কৃষক কমিউনিস্ট পার্টি ও কমরেড লেনিনের চারপাশে একজোট হয়েছেন! লেনিনের কথাকে ভাঙার মত কোন শক্তি নেই!'

সভাপতিকে হাততালি দেওয়া হল, আগ্রহজনক বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জানান হল কিন্তু তাহলেও আরো বেশী সাফল্য পেল ভেলি।

'এক দিন বনে এক ছোট ওক গাছ তার বাবা বড় ওক গাছের কাছে নালিশ জানাল: 'বাবা দেখছ ঐ কুঠার আমাদের সঙ্গে সব সময় কি ব্যবহার করে?' বড় ওক তার বড় বড় ডালপালা নাড়িয়ে বলে উঠল: 'তার কারণ হল কুঠারের হাতলটা তো ওক কাঠ দিয়ে তৈরী...' এমন সজীব ভাব নিয়ে ভেলি বলছিল যে সবাই হেসে তাকে সমর্থন করল। 'আল্লাহ্‌ জানেন, শাহবাজ-বেক কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে, কিন্তু সে তত ভয়ংকর নয় যত তার

সহচরেরা, তার ভাড়াটে গন্ডারা, যারা এখন পর্যন্ত আমাদের গ্রামে, আমাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।'

চাষীরা সঙ্গে সঙ্গে যেন কারো আদেশবলে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাজী গুলু আর মোড়লের দিকে তাকাল।

'বেক নিজে না, তার চাকররাই পতাকাটা ছিঁড়েছে, লেনিনের পতাকার অপমান করেছে।' আরো নিশ্চিতভাবে বলে চলল ভোলি শ্রোতাদের সমর্থন পাবার ফলে। 'কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই দোষীদের খুঁজে বার করব আর তাদের কঠোর শাস্তি দেব। আর আপনারা কমরেড গ্রামবাসীরা যদি দেখেন বিশ্বাসঘাতকের হাত এগোচ্ছে পতাকার দিকে তবে সে হাত এমন চেপে ধরবেন যে তার ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়।'

মোড়ল আর গাজী উদ্বিগ্ন হয়ে মুখ চাওয়াচায়ি করল, এক পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু চলে গেল না।

পেরি-খালাকেও অনুরোধ করা হল কিছু বলার জন্য, তাকে বেশীবার বলতে হল না: সে বুঝল যে এমন সময়ে চুপ করে থাকা উচিত না, সত্যি কথার জোর বন্দুকের গুলির মতই।

পেরি-খালা আগের জীবনের কথা মনে না করে পারল না, কষ্টের কথা অত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া যায় না। আর কষ্ট কি কেবল সে একাই পেয়েছে? পেরি-খালার মনে হল গ্রামবাসীদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত সেই অন্ধকার দিনগুলির কথা যখন দুঃখ দারিদ্র্য ছিল প্রতিটি কৃষক পরিবারে।

তারপর পেরি-খালা বক্তৃতায় এমন ডুবে গেল যে বুঝতেই পারল না কখন সে শ্রোতাদের বলতে আরম্ভ করেছে তার লেনিনের সঙ্গে দেখা হওয়ার গোপন স্বপ্নের কথা— লেনিনকে আলমামিকের বাগানের রসাল, মিষ্টি আপেল উপহার পাঠাবার কথা।

'সত্যি কথা বলতে কি,' হঠাৎ থেমে বলল মাসী, 'একটু বেশী স্বপ্ন দেখে ফেলেছি হয়ত!.. কিন্তু কেন? কারণ লেনিন যখন জিজ্ঞাসা করবেন 'কে লাল পতাকা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেছে, কে এর পবিত্রতা নষ্ট করেছে? ক্লাশ বন্ধ করে দেওয়া হল কেন? নাকি আপনারা জানেন না যে "অজ্ঞানতা অন্ধকার"?' আমাকে তার উত্তরে বলতে হবে 'কমরেড লেনিন, আমরা গ্রামের মানুষ, আমরা ঘুমোচ্ছি, গভীর ঘুম, আমাদের এই তেলচিটচিটে নোংরা কম্বলের নীচে নাক ডাকাতে বিরক্তি লাগে না, আরো খানিকটা

ঘুমোলেই আমরা অন্ধ হয়ে যাব।..' লেনিনের সামনে এ সব কথা বলার চেয়ে আমার মরাও ভাল।' বিরক্তি আর ব্যঙ্গের হাসি হেসে পেরি-খালা শেষ করল, জনগণের নিস্তব্ধতা যেন তার বক্তৃতার উত্তর। কৃষকরা মুখ নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল — লজ্জায় চোখ তুলতে পারল না।

এও পেরি-খালাকে একটু শান্ত করল: তারা এখনও একেবারে শেষ হয়ে যায় নি, তাদের মধ্যে এখনও বিবেক জাগ্রত।

৬

গরমের অসহ্য দিনগুলো কেটে গিয়ে শরতের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব এল। গাছের পাতাগুলি বিবর্ণ হয়ে ধূলায় ভরে গেল। মাটিতে এরমধ্যেই পড়েছে তামার পয়সার মত শুকনো পাতা। পেরি-খালার বাগানে আপেলগুলি যেন ছোট ছোট সূর্যের মত চক্‌চক্‌ করছে। গৃহকর্ত্রী এখনও সেগুলোকে ছোঁয় নি, খালি পড়ে যাওয়াগুলোকে কুড়িয়েছে।

নাজিম কয়েক দিনের মধ্যে বন্ধু মেষপালকদের সঙ্গে মেষপাল নিয়ে উপত্যকায় যাবে তাই পেরি-খালা ঠিক করল ছেলের সঙ্গে ফল তোলা আরম্ভ করবে, ভেলিকেও ডাকবে, সবচেয়ে মিষ্টিগুলো যাতে বেছে নেওয়া যায় কমরেড লেনিনের জন্য।

কিন্তু বিদ্বান লোকেরা বলেন সুখী মানুষের দিনগুলি যেন বসন্তের সুন্দর ফুল।

এক দিন জেলার বিপ্লবী কমিটির সভাপতি পেরি-খালার বাড়ীর কাছে ঘোড়া থামাল।

'চল মাসী, অনেক দূর যেতে হবে।'

'ভেতরে এস, বোস,' অতিথির কথার মাথামুণ্ড না বুঝতে পেরে বলল সে, 'বোস, চা করি।'

'সময় নেই, মাসী... তুমি শুনেছ, আমি কি বলছি, বাকু থেকে ফোন করেছিল। সোভিয়েত আজেরবাইজানের প্রতিনিধিদল যাচ্ছে মস্কো, অক্টোবর বিপ্লবের বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে। তুমিও, মাসী, ঐ প্রতিনিধিদলে আছ। চল তৈরী হয়ে নাও।'

পেরি-খালার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল, পা দুর্বল মনে হল; যাতে পড়ে না যায় তাই দরজাটা আঁকড়ে ধরল। তারপর হঠাৎ দারুণ

আনন্দে তার বুক ভরে গেল, সে বুঝল তার স্বপ্ন সফল হয়েছে, সে যাচ্ছে মস্কো, লেনিনের কাছে।

সভাপতি তাগাদা দিল:

'তাড়াতাড়ি কর, পেরি-খালা, তিনঘণ্টা বাদে ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে বাকু, খুব অল্প সময় আছে।'

ভেলি আর নাজিম সভাপতির ঘোড়া দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, তারাও এই খবরে উত্তেজিত, আনন্দিত হয়ে উঠল, তারা পেরি-খালাকে তার সামান্য জিনিস গুছাতে সাহায্য করল, গাছ থেকে সবচেয়ে ভাল ফলগুলি তুলে ঝুড়িতে ভাল করে গুছিয়ে দিল। লেনিনের জন্য।

সাহিস নাজার নিয়ে এল ধূসর রঙের শান্ত শিষ্ট কিন্তু দ্রুতগামী ঘোড়াটাকে। ছেলে আর ভেলি পেরি-খালাকে বসিয়ে দিল ঘোড়ায়। যাত্রা শুভ হোক!.. পেরি-খালা লেনিনকে আমাদের গ্রামের কথা সব বোলো। কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও, গেরিলাদের দলে অনেক গ্রামের লোক সোভিয়েত ক্ষমতা স্থাপনের জন্য লড়াই করেছে। এটাও খুব কম কথা নয়!.. আর গরীবরা বেকের জমির ভাগ পেয়েছে, খেয়ে পরে আছে। যাত্রা শুভ হোক, মাসী! লেনিনকে আমাদের ভালবাসা, অগাধ শ্রদ্ধা জানিও। আমরা তাঁর প্রতি, তাঁর কার্যাবলীর প্রতি আর পতাকায় চিরকাল বিশ্বাস রাখব!..

৭

হোটেলের বিরাট জানলার কাছে বসে পেরি-খালা শহর দেখছিল, কি মস্ত শহর, শেষ নেই, প্রান্ত নেই যেন। বরফ পড়ছে। গতকাল পড়েছে, আজও পড়ছে। রাস্তাঘাট, আজেরবাইজানের পাহাড়গুলির মত বড় বাড়ীগুলির ছাদ ঢেকে গেছে যেন হাঁসের পালকের রোঁয়ার তৈরী সাদা কার্পেটে। হাওয়া নেই, বড় বড় বরফের ডেলা পড়ছে মস্কোর ওপর, সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ না করে।

বাকুও বড় শহর, কিন্তু মস্কো এমনকি বাকু দেখার পরেও বিস্ময় উৎপাদন করে। এখানে আসার সময় পথে তাকে রাজধানী সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, কিন্তু তাহলেও সে তার বিশালত্ব আর সৌন্দর্য কল্পনা করতে পারে নি!.. সেই জন্যই তার হৃদয়ের স্পন্দন হয়েছে দ্রুততর, নিশ্বাস যেন বুকে আটকে আসছে। যখন সে রেড স্কোয়ারের পবিত্র প্রস্তরগুলিতে

পা রেখেছে আর ক্রেমলিন দেখেছে যেখানে লেনিন থাকেন আর জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন, তখন থেকে পেরি-খালার মানসিক শক্তি যেন অসম্ভব বেড়ে গেল।

গতকাল সে আজেরবাইজানের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বলশয় থিয়েটারে গিয়েছিল। সারা হল ভর্তি কানায় কানায়, বেতের জুতো আর মোটা কোট পরা শ্রমিক, কৃষক, ফ্রন্টের থেকে আসা সৈন্য, চামড়ার কোট পরা পার্টি আর সোভিয়েতের কর্মচারীরা সবাই অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল মহান নেতার আবির্ভাবের। হলের ভেতরে ঠান্ডা, পর্দাগুলির লাল ভেলভেট ম্লান দেখাচ্ছিল, গিল্টির কাজও ম্লান দেখাচ্ছিল, ক্রিস্টালের শেডের মধ্যে মৃদু আলোর বাল্ব জ্বলছিল, কিন্তু পেরিমাসী আর অন্যদের কাছেও মনে হচ্ছিল সবকিছু যেন উৎসবের মত, যেন সূর্যালোকিত সবকিছু, যেহেতু তাদের মুখে আর বুকে একটা প্রিয় নাম — লেনিন।

অবশেষে সেই দীর্ঘপ্রতীক্ষিত মুহূর্তটি এল, পর্দা একটু কেঁপে আস্তে আস্তে উঠতে আরম্ভ করল, সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে রইল, হঠাৎ হল হাততালিতে ভেঙে পড়ল, সব লোক উঠে দাঁড়াল আর একসঙ্গে চীৎকার করে বলল: 'কমরেড লেনিন জিন্দাবাদ!' ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন দ্রুত পদক্ষেপে মাথা একটু নীচু করে গিয়ে প্রেসিডিয়ামে নিজের জায়গা নিলেন।

উত্তেজনায় পেরি-খালা যেন অন্ধ হয়ে গেল, সে কিছুই স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিল না, তারপর মিনিটখানেক বাদে একটু শান্ত হলে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল আর লেনিনের চেহারা সারাজীবনের জন্য মনে করে নিল।

লেনিন যদি রূপকথার নায়কদের মত বিরাট বড়সড় চেহারার অধিকারী হতেন তাহলেও পেরি-খালা অবাক হত না। কিন্তু সে যত দেখতে লাগল, তার মনে হতে লাগল লেনিন কেবল এইরকমই হতে পারেন — শক্তপোক্ত, দ্রুত গতিবিধি, উজ্জ্বল চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যা নির্ভীক ভাবধারায় পূর্ণ, মৃদু হাসি কখনো ভালবাসায় পূর্ণ, কখনো সাহসী পুরুষের। পেরি-খালার সবচেয়ে বিস্ময় লাগল লেনিনের চওড়া উঁচু কপাল দেখে। মিটিংয়ের সমস্ত সময়টা সে তাঁর কপালের দিকে তাকিয়ে রইল যেখানে আছে তাঁর এত জ্ঞান আর তাঁর সর্বধ্বংসকারী অন্তর্দৃষ্টি।

আবার সেই গোপন ইচ্ছাটা পেরির মনে চাড়া দিল। তার মনে পড়ল

ভোলি আর অন্য কৃষকদের বন্ধুত্বপূর্ণ নির্দেশ — 'লেনিনের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা কোরো !'

তার মনে হল যেন সে তাদের আর ভোলির কণ্ঠস্বর শুনতে পেল 'লেনিনের সঙ্গে অবশ্য দেখা কোরো !'

'যদি তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে না পারি, তবে কি করে আমি বাড়ী ফিরে যাব ?' ভাবল সে, আর তার কাছে বসে থাকা প্রতিনিধিদলের সভাপতি, বাকুর পুরনো বিপ্লবীকে ফিসফিসিয়ে প্রার্থনা জানাল:

'চেষ্টা কর, যাতে লেনিন কয়েক মিনিটের জন্যও আমাদের আজেরবাইজানীদের সঙ্গে দেখা করেন !'

যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে সে লেনিনের কাছে তার মনের কথা সব খুলে বলবে; বলবে যে আজেরবাইজানের জনগণ তাঁর প্রতি নিঃস্বার্থ আনুগত্য জানাচ্ছে, পালিয়ে যাওয়া বেকের অনুচরদের কথা মনে করারই দরকার নেই। ওরা কি আজেরবাইজানী নাকি ? ওরা বিশ্বাসঘাতক !.. লেখাপড়ার ক্লাশের কথাও বলতে হবে, ভ্লাদিমির ইলিচকে বিশ্বাস করাতে হবে যে পেরি-খালা মেয়েদের ঐ ক্লাশে এনে যোগ দেওয়াবে, আর নিজেও সেই সঙ্গে পড়তে শিখে নেবে, কাজে আসবে তারও... হঠাৎ তার মনে হল এসব কথাবার্তা যদি লেনিনের আগ্রহ না জাগায় ?

৮

'ভ্লাদিমির ইলিচ অপেক্ষা করছেন, যান ভেতরে !' বলল সেক্রেটারী, সবাই উঠে বৃদ্ধাকে জায়গা ছেড়ে দিল।

পেরি-খালা নীল সাটিনের পোশাক ঠিক করে নিল, মাথার কালো সিল্কের রুমালটা ভালো করে জড়াল, সাদা হয়ে যাওয়া মুখে, ছোট ছোট পা ফেলে ঘরে ঢুকল।

লেনিন কি সব কাগজপত্র দেখছিলেন, পেন্সিল দিয়ে দাগ দিচ্ছিলেন, অতিথিদের দেখে যুবকের মত লাফিয়ে উঠে আনন্দে মৃদু হেসে টেবিলের ধার থেকে বেরিয়ে এলেন, পেরি-খালার করমর্দন করে তাকে চেয়ারে বসালেন। অন্য সব প্রতিনিধিদের তিনি আতিথ্য জানালেন উদার ভঙ্গীতে।

'আমাদের অনুবাদক লাগবে দেখছি,' বলে তিনি সেক্রেটারীর দিকে

তাকালেন, আর একটু পরেই ঘরে ঢুকল সামরিক পোষাক পরা একটি রোদেপোড়া ছেলে।

পেরি-খালার হৃদয় হিম হয়ে গেল বুঝতে পেরে যে লেনিন তার দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন তাকে প্রথমে বলতে আহ্বান জানাচ্ছেন, দলের অন্য লোকরাও প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আর পেরি-খালা যা কিছু বলবে বলে ভেবেছিল সব ভুলে গেল।

সে কথা বুঝতে পেরে লেনিন তাকে সাহায্য করার জন্য আরম্ভ করলেন:

'কমরেড নরিমানভ আমাকে আজেরবাইজানের পরিস্থিতির কথা অনেক বলেছেন, সেখানে মেয়েদের জীবন কি রকম কঠিন,' বললেন তিনি পেরি-খালার মুখ থেকে তাঁর প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি না সরিয়ে, 'কি করা যাবে!.. বহুদিন ধরেই চাষী মেয়েরা রাশিয়াতেও আর পূর্বেও এই ভাবেই দিন কাটিয়েছে। সবজায়গাতেই খেটেখাওয়া মেয়েদের ভাগ্য আসলে একই।'

এবারে পেরি-খালার মনে হল এই সহজভাবে প্রাণের থেকে কথা বলা লেনিনকে যেন সে অনেকদিন জানে। ভ্লাদিমির ইলিচ যেন তার দুঃখ ও জীবনের কথা জানেন। আর তাঁর চেহারায়, কথাবার্তায় কেমন যেন আপন আপন ভাব, তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলা যায় যেমন বলা যায় ভেলি আর নাজিমের সঙ্গে।

'ধন্যবাদ, কমরেড লেনিন, ধন্যবাদ,' বলল পেরি-খালা, 'আমাদের অসহায় লোকেদের ভার নেবার জন্য ধন্যবাদ, আপনি আর সোভিয়েত শাসন আমাদের সামনে এক নতুন উজ্জ্বল জীবনের দরজা খুলে দিয়েছেন।'

'না আমরা এখনও প্রকৃত ভাল দিন দেখি নি,' স্বরে গুরুত্ব ফুটিয়ে প্রতিবাদ করলেন লেনিন আর তাঁর কোঁচকান চোখে দেখা দিল দুশ্চিন্তা। 'আমাদের এখনো অনেক অভাব আছে। রুটি নেই। ছিট কাপড় নেই। শীত এসে গেল। আর ঘর গরম করার কাঠ নেই এমনকি হাসপাতালগুলিতে, অনাথভবনগুলিতে, পরিবহন অবস্থা খারাপ: ট্রেনগুলি কোনরকমে এগোচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনারা আমার থেকে ভাল জানেন... আর অশিক্ষা, কুসংস্কার — কি বিপজ্জনক শত্রু। না, উজ্জ্বল দিনের পথ আমাদের কাছে এখনো দূরে।' লেনিন সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে বললেন।

পেরি-খালা বুঝল লেনিনের চিন্তার কারণ কি, তবুও সে পুরো একমত হতে পারল না:

'আজেরবাইজানের কৃষকরা জমি পেয়েছে, বেকের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। এও তো এক বিরাট কাজ। আমরা নিজেরা নিজেদের মালিক।'

তার কথা লেনিনের ভাল লাগল। উজ্জীবিত চোখের দৃষ্টি পেরি-খালার থেকে সরিয়ে তিনি বাকী সব প্রতিনিধিদের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন:

'তার মানে আজেরবাইজানের মেয়েরা বুঝেছে যে সোভিয়েত শাসন তাদের এত বছরের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছে? তাই?.. তার মানে সত্যি সত্যি কৃষকরা সোভিয়েতের ক্ষমতাকে নিজেদের বলে মনে করে? আচ্ছা কমরেড... পেরি-খালা,' ভ্লাদিমির ইলিচ আড়চোখে দোভাষীর দিকে তাকালেন — নাম বলায় ভুল করলেন না তো, সে মাথা নেড়ে জানাল — ঠিক আছে। 'বলুন তো, গ্রামের কমিউনিস্টরা আর পার্টির বাইরের সোভিয়েত ক্ষমতার সমর্থকরা কি বোঝেন যে, সমস্ত পূর্বাঞ্চল তাকিয়ে আছে আজেরবাইজানের দিকে?.. আর আমাদের রাজনীতির জন্য এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের শ্রমিকরা, আপনাদের কৃষকরা, আপনাদের লালফৌজ পূর্বে সমাজবাদের পতাকা তুলেছে!'

পেরি-খালা সমাজবাদ কি বুঝল না কিন্তু তার মনে পড়ল কেমন করে খেতমজুর ভেলি গ্রাম সোভিয়েতের বাড়ীর ওপর পতাকা টাঙিয়েছিল (যে বাড়ীটা আগে শাহবাজ-বেকের ছিল), কেমন করে শত্রুর থাবা গিয়ে পৌঁছেছে পবিত্র পতাকায়, কিন্তু সভাপতি একটা নতুন পতাকা নিয়ে এসেছেন, এখন সেটা বহুদিন ধরে গর্বিতভাবে উড়ছে...

'আপনারা আজেরবাইজানকে আদর্শ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে পরিণত করুন, যাতে পূর্বের অত্যাচারিত জনগণ আমাদের সাফল্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ দেখে আনন্দ পায়!' লেনিন বলে চলেছেন উত্তেজিতভাবে। 'এই বিরাট যজ্ঞে মেয়েদের স্থান প্রথম সারিতে, তারা পাবে সম্মান, পূর্ণ স্বাধীনতা আর হবে প্রভাবশালী। সংস্কৃতির সমস্ত সুফল মেয়েদের পাওয়া উচিত!.. আর পূর্বে এই ব্যাপারটা এক বিশেষ আন্দোলনের রূপ নেবে।'

পেরি-খালা প্রতিটি কথা না বুঝলেও, লেনিনের কথার মোট অর্থ বুঝল। প্রতিনিধিরা অভিভূত হয়ে পড়ল — লেনিনের কথাগুলি যেন তাদের অনেক উপরে তুলে দিয়েছে, যেন বাজপাখীর ডানা পরিয়ে দিয়েছে।

তারপর লেনিন প্রতিনিধিদের বিশদভাবে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন কি ভাবে বেকের জমি ভাগ করা হল; তাদের ঘোড়া, লাঙলমই যথেষ্ট আছে না কি; তারা একসঙ্গে মিলেমিশে জমি চাষ করতে চায় কিনা। এ সম্পর্কে কথা বলা পেরি-খালার পক্ষে খুবই সহজ, কারণ সে তো তার নিজের জীবনের কথাই বলছে। সে একটুও বিস্মিত হল না যে, লেনিন আগ্রহ সহকারে জানতে চাচ্ছেন সেই প্রতিদিনের ছোটখাট ঘটনাগুলির কথা, বোঝা গেল এগুলি তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

যখন স্কুলের কথা উঠল, পেরি-খালা বলল যে গ্রাম সোভিয়েত সমস্ত মেয়েদের স্কুলে আনতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমনকি চল্লিশ বছর বয়সীদেরও, যদিও অনেক অপ্রিয় ঘটনাও ঘটেছে। মেয়েরা হয়ত অনেকদিন ক্লাশে অনুপস্থিত থেকেছে। আর এখন বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে থেকে অনেককে স্বামীরা আসতে দিচ্ছে না।

'আদত,' মৃদু হেসে বললেন ভ্লাদিমির ইলিচ, প্রতিনিধিরা মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন: এখনও পুরান আদত খুব জোরদার। 'ও চলে যাবে।' একটু ভেবে বললেন লেনিন। 'কিন্তু মাতৃভাষায় বইপত্তর আছে নাকি? খাতাপত্তর?'

'বাপ রে! এতদূর অবধি জানে...' পেরি-খালার প্রথমে মনে হয়েছিল একটা বর্ণপরিচয় নিয়ে পাঁচ-ছ'জন মেয়ে পড়ে এ অভিযোগ করা একটু বাড়াবাড়ি হবে। লেনিনের মাথায় এমনিতেই এত চিন্তা। কিন্তু লেনিনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারল নিজের পিতার কাছ থেকে তার লুকোবার কিছুই নেই।

'বইপত্তর? পালা করে পড়ে, খুবই খারাপ অবস্থা!.. কিন্তু আপনার কাছে আমাদের অন্য অনুরোধ আছে।'

'হুম... কি অনুরোধ?' সতর্ক হয়ে গেলেন লেনিন।

'আমাদের জেলায় তিন শ' গ্রাম। শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও খুব কম নয় কিন্তু আমাদের আজেরবাইজান ভাষায় সংবাদপত্র নেই।' বৃদ্ধ কৃষকদের মত ধীরে সুস্থে বলল পেরি-খালা। 'কারণ জেলায় ছাপাবার মেশিন নেই... যদি আপনি একটা মেশিন পাঠান আমাদের তো অন্তত মাসে একবার কাগজ বার করতে পারা যায় গ্রামগুলির খবর সমেত। অশিক্ষিতদের সন্ধ্যাবেলা পড়ে শোনান যায় খবর। খবরের কাগজ আমাদের সাহায্যে আসবে।'

ভ্লাদিমির ইলিচ নোটবুকে লিখে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে, এরপর অন্যান্য প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন।

লেনিনের অলক্ষ্যে সেক্রেটারী ইসারা করল কথাবার্তা শেষ করার জন্য, ভ্লাদিমির ইলিচ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

'কমরেড লেনিন,' পেরি-খালা উঠতে উঠতে কাঁপা গলায় বলল। 'আল্লাহ্ আপনাকে ডাইনীবুড়ী 'সময়ের' হাত থেকে রক্ষা করুন। আপনি দীর্ঘজীবি হোন!'

''সময় ডাইনী?' লেনিন উৎসুকভাবে চোখ কোঁচকালেন। 'দারুণ, দারুণ আগ্রহজনক... ডাইনী?'

পেরি-খালা উৎসাহিত হয়ে লেনিনকে সেই রূপকথার গল্প শোনাল।

'দারুণ আগ্রহজনক রূপকথা।' পুরোটা শুনে বললেন লেনিন। 'লোকেরা খুব ভালভাবেই তাদের চিন্তাধারা প্রকাশ করেছে, পুরনো সমাজে মানুষের ভাগ্য নির্ভর করত আকস্মিক কিছু ঘটনার জট পাকানোর ওপর যার ফলে লোকের সব স্বপ্ন বিফল হত। কিন্তু এখন সময় — আমাদের বন্ধু। সে আর মানুষের ভাগ্যের সুতো জট পাকাবে না বা ছিঁড়বে না। আমরা কমিউনিস্টরা সময়কে মানুষের উপকারে কাজে লাগাব... আর প্রতিবিপ্লবীদের... হুম... একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।' তারপর ভ্লাদিমির ইলিচ আনন্দিতভাবে একটু হাসলেন।

এমন সময় আপেলের ঝুড়ির কথা পেরি-খালার মনে পড়ল যা সে বাইরে রেখে এসেছে, সে প্রতিনিধিদের সরিয়ে বাইরে গেল।

'আমার বাগানের ফল। সেই বাগান, যেটা তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছ, কমরেড লেনিন।' বলল পেরি-খালা লেনিনকে। ঝুড়ি এগিয়ে দিতে গিয়ে উত্তেজনায় তার গাল লাল হয়ে গেল। 'নিজের হাতে মাটি কুপিয়েছি। জল নয় — আমার ঘামে বেড়ে উঠেছে। নাও... সামান্য উপহার, তোমার মত লোকের উপযুক্ত নয়, কিন্তু এ আমার প্রাণের দান।'

লেনিনের হাতে তুলে দিল সবচেয়ে বড় আপেলটা যেন কনে বধূর রক্তাভ গাল।

ভ্লাদিমির ইলিচ অভিভূত হলেন, আপেলটায় হাত বুলোলেন, গন্ধ শুঁকলেন, ঠাণ্ডা ঘরে যেন দক্ষিণের সূর্যের গন্ধ পাওয়া গেল।

পেরি-খালা লক্ষ্য করল যে লেনিনের হাতদুটি ছোট ছোট কিন্তু শক্তিশালী।

কি সুন্দর গন্ধ!..' নিশ্বাস ফেলে বললেন লেনিন। 'কল্পনা করুন আমি মস্কোর একজন শ্রমিককে খুব ভালভাবে জানতাম। কমিউনিস্ট, হ্যাঁ, ইভানোভ খুব ভাল লোক ছিল।' ভ্লাদিমির ইলিচ যেন কেবল পেরির সঙ্গেই কথা বলছিলেন। 'সম্প্রতি ইভানোভ যুদ্ধে মারা যায়। স্ত্রী, শিশুরা আছে। তারা আপনার থেকে এই উপহার পেয়ে কি খুশী যে হবে। ইভানোভদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!'

'এরপর মরলেও কিছু যায় আসে না,' ভাবল পেরি-খালা, চোখে জল নিয়ে লেনিনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে।

কিন্তু মরার তার কোন ইচ্ছাই ছিল না।

মস্কো থেকে প্রতিনিধিদলের ফেরার পর একমাসও পূর্ণ হয় নি, ভেোল একদিন ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ী পথে জেলা থেকে এসে বেড়ার ওপর থেকে চেঁচিয়ে বলল:

'পেরি-খালা, ছাপার মেসিন এসে গেছে!.. আর অক্ষরও যা যা দরকার সব। বাকুর থেকে কম্পোজিটর, ছাপাবার লোক সবাই এসে গেছে। লেনিন নিজের কথা রেখেছেন, তিনি আমাদের ভোলেন নি!'

'লেনিনের কথা আর কাজে তফাৎ নেই, বাবা!' দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে পেরি-খালা বলল, তারপর শান্ত আরামের ভঙ্গীতে লাল সূর্যাস্ত দেখতে লাগল।

'পৃথিবীতে কি না হয়।' ভাবল সে। 'এক চাষী মেয়ে কালকের খেতমজুরের অনুরোধ মহান লেনিন ভুলে যান নি। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে লেনিনকে এসবের জন্য প্রতিদান হিসেবে।'

দু'সপ্তাহ পরে জেলার সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যা ছাপা হল, নাম দেওয়া হল 'লেনিনের প্রদর্শিত পথে'।

মাটি কি বলে...

ব্যাপারটা হল এই যে, আমি এখন নিজের বাড়ী থেকে অনেক দূরে থাকি। কয়েক বছর আগে এমনই এক শান্ত, মেঘহীন ডিসেম্বরের দিনে এই ঘটনার সূত্রপাত। আমাকে পার্টি জিলা কমিটি থেকে ডেকে পাঠিয়ে বলা হল:

'শাকলা-খানুম, আমরা সারিতেপের যৌথখামার নিয়ে বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছি। যাকেই আমরা ওখানে পাঠাই না কেন, কিছুই কাজ হচ্ছে না। অনেক চিন্তার পর আমরা তোমাকেই ওখানে সভাপতি করে পাঠাবার ঠিক করেছি।'

বোধহয় আমার মুখচোখের চেহারা খুব পাল্টে গিয়েছিল, কেননা দ্বিতীয় সম্পাদক হামিদ-মুয়াল্লীম (আগে তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন) একটা গেলাসে জল ঢেলে আমার কাছে নিয়ে এলেন।

'আমরা অনেক পরামর্শ করেছি, সবদিক ভেবে দেখেছি।' উনি বললেন, 'বাড়ির থেকে দূরে থাকা তো খুব সহজ নয়...'

আমি উত্তেজিতভাবে ওঁকে বাধা দিলাম:

'বাড়ী থেকে দূরে থাকাটা কিছু ব্যাপারই না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার ভয় হচ্ছে। যদি আমি সবকিছু সামলে উঠতে না পারি? খামারটা এত বড়, আর তা'ছাড়া...'

হঠাৎ থমকে গেলাম, সবথেকে যেটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে সেটা আর বলতে চাইলাম না। কিন্তু প্রথম সম্পাদক বুঝতে পারলেন:

'... আর তা'ছাড়া সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। হ্যাঁ, কাজটা খুব সহজ হবে না, প্রচণ্ড খাটতে হবে। এমন একটা বোঝা বইতে পারে কেবল শক্তিমান পুরুষমানুষই...'

সম্পাদক দু'জন চোখাচোখি করে হেসে উঠলেন, যেন আমাকে একটু

চাঙ্গা করে তোলার জন্য। হামিদ-মুয়াল্লীম আমার দিকে তাকিয়ে জোর দিয়ে বললেন:

'স্কুলে থাকতেই শাকলা-খানুম ছিল সবচেয়ে সাহসী আর দৃঢ় স্বভাবের...'

'ঠিক আছে, আমি রাজী।' বললাম আমি, 'আপনাদের কথাই থাক্।'

আমার মা যখন জানতে পারলেন যে, সারিতেপের যৌথখামারের সভাপতির জন্য আমার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে, আমি ভয় পাচ্ছি দেখেও, তিনি এমনকি খুশীই হলেন:

'যা, তোর ভালই হবে। এখন দিনকাল অন্যরকম... তোর ভেতরে নিশ্চয় কিছু দেখেছে, এত বড় যৌথখামারের ভার দিয়ে যখন পাঠাচ্ছে...'

উৎকণ্ঠা নিয়ে ভাবছিলাম, বাবা কি বলবেন। টুলে বসে তিনি ভোঁতা হয়ে যাওয়া বেলচা ও কুড়ুল ধার দিচ্ছিলেন। তাঁর চমৎকার, ঘন, সাদা দাড়ি আমাকে পাহাড়ের চূড়ায় জমে থাকা তুষারের কথা মনে করিয়ে দেয়। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে হত বাবা যেন এক বিরাট পাহাড় আর প্রত্যেকবারই যখন আমি তাঁর কাছে যেতাম, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন, আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হত।

'তুমি কি বল, বাবা?' তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম।

তিনি আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

'মাটির ভাষা তুই কি এতটা বুঝিস যে এই কাজটা ঘাড়ে নিচ্ছিস?' আমার প্রশ্নের উত্তরে নিজের প্রশ্ন রাখলেন।

আমি বাবার প্রশ্নের উত্তর কখনও সঙ্গে সঙ্গে দিই নি। ছেলেবেলা থেকেই তিনি আমাকে শিখিয়েছেন প্রথমে ভালোভাবে চিন্তা করে তারপর উত্তর দিতে। যখন আমি দাঁড়িয়ে চিন্তা করছিলাম, মা ছুটে এলেন আমাকে বাঁচাতে:

'কি জ্ঞান দেখাচ্ছ তুমি! মাটি মানুষ নয় যে, গল্প করতে বসবে! মেয়েকে কোথায় দুটো ভাল কথা বলবে, সাহস দেবে, কাজ করতে যাচ্ছে...'

'তুমি খুব বেশী বোঝো।' শান্তভাবে প্রতিবাদ করলেন বাবা। 'মাটি আমাকে যত কথা বলেছে, সবকিছু লিখলে পরে একটা বিরাট বই হয়ে যাবে।'

'তুমি কি বলতে চাচ্ছ, বাবা, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু মানুষ শুরুতেই সবকিছু জানতে পারে না, সময় দরকার...'

'যদি তুই সব ভেবে স্থির করে থাকিস্‌ তবে রওনা হয়ে যা। খালি একটা কথা মনে রাখবি, যত বই-ই পড়িস না কেন সবকিছু কিছুতেই জানতে পারবি না। খামারীরা কি পরামর্শ দেয় শুনবি, মাটির কথা শুনবি, তাতে তোর ভালই হবে।'

স্যারিতেপেতে আমি বিভিন্ন ধরনের অভ্যর্থনা পেলাম, যা সব নতুন লোকের বেলায়ই হয়ে থাকে: কেউ কেউ আমাকে সৌজন্যের সঙ্গে, কেউ কেউ সতর্কভাবে গ্রহণ করল। যেখানেই যাই না কেন, আমি তাদের নিরীক্ষণকারী দৃষ্টি নিজের ওপর অনুভব করতাম। আমার প্রতি তাদের মনোভাব ছিল দু' ধরনের। যখন আমি কোনো কিছু পরামর্শ দিতাম বা নির্দেশ দিতাম সবকিছুতেই একমত হত, আন্তরিকতার সঙ্গে মাথা নাড়ত। কিন্তু তাদের চোখের গভীরে দেখা যেত গোপন চিন্তাধারা: 'তুমি কোন দরের লোক দেখা যাক্‌ আগে, সভাপতি তো আমরা এ জীবনে অনেক দেখলাম...'

কিন্তু শীগগিরই এই অবিশ্বাসের বরফ গলে গেল।

আর তা' হল এই কারণে।

আমি লোককে বিশ্বাস করি। অন্যায়, আত্মপ্রত্যয়হীনতা আর সন্দিগ্ধ মনোভাবকে আমি পৃথিবীতে সবথেকে বেশী ঘৃণা করি। সবকিছুতেই অকপটতা, স্পষ্টতা ভালবাসি। লক্ষ্য করলাম যে আমি নিজেই কিছু লোককে সন্দেহের চোখে দেখি যেন। বুঝলাম, এখানকার লোকেরা সে কথা বুঝে ফেলেছে আর তাই আমার প্রতি তাদেরও অবিশ্বাস। আমার মনে পড়ল বাবার উপদেশ: 'সব সময় সোজা পথে চলবি। আর যে তোকে সেই পথ থেকে সরাবার চেষ্টা করবে, সে যেন ব্যর্থ হয়।'

আমি আমার চারদিকের লোকেদের দিকে দেখতে লাগলাম প্রিয় বন্ধু আর সহকর্মীর চোখ নিয়ে। তার ফলে আমি খুঁজে পেলাম অনেক চমৎকার, ভাল লোককে। তাদেরও এই সন্দেহ আর নিষ্প্রাণ সম্পর্কে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল, তারাও আমার দিকে খোলা মনে এগিয়ে এল।

এখন আমি কোন কিছু প্রস্তাব করলেই চারদিক থেকে উপদেশ বর্ষিত হয়, কোন কাজ কি করে আরো ভালভাবে করা যায়।

যৌথখামারে তৈরী হল সক্রিয় কর্মীদের নিয়ে একটি দল, যাদের বাদ দিয়ে কোন কাজই শুরু করা যেত না। এই দলটি যেন গাড়ির মোটর, মানুষের দেহের হৃৎপিণ্ড যেন।

তিনবছরে আমরা অবশ্য অগ্রণী যৌথখামারগুলির সারিতে স্থান করে নিতে পারলাম না। কিন্তু এখন কেউ আর বলতে পারবে না যে: 'হয় নিজেরা খেয়ে ফেলে, না হয় গরু-বাছুরকে খাইয়ে দেয়।' সবথেকে বদমাশ লোকটাও একথা বলতে পারবে না।

প্রথমে আমরা বেছে নিলাম, কোন্ কোন্ সমস্যার এখুনি সমাধান হওয়া দরকার। সেই সব কাজের একটা খসড়া তৈরী করা হল। প্রত্যেকটা কাজের একটা নির্দিষ্ট সময় স্থির করা হল। বীজবপনকারীকে নির্দিষ্ট সময় মেনে চলতেই হয়। একটা দুটো দিন নষ্ট হলেই — সব গেল। সময়মত বপন না করা বীজ, সময়মত রোপণ না করা বৃক্ষ, আগাছা উৎপাটন না করা ক্ষেত্র হল খেতে না পাওয়া রুগ্ণ, দুর্বল মেষশাবকের মতই।

একবার আমার যখন দশ বছর বয়স বাবা আমাদের উঠোনে দুটো গাছ বসান: একটা মার্চ মাসে, একেবারে ঠিক নওরোজ উৎসবের আগে, যখন গাছে কুঁড়িগুলো পেকে উঠেছে, আর দ্বিতীয়টি অনেক পরে যখন গাছে প্রথম সবুজ অঙ্কুর দেখা দিয়েছে।

'দেখ, মনে করে রাখ,' বলেছিলেন বাবা, 'দুটো গাছ একরকম হবে না, যদি একটাকে ঠিক সময়ে বসান না হয়।'

বেশ কিছু বছর কেটে গেল। আর সত্যি, নওরোজ উৎসবের আগে বসান গাছটা এত বেড়ে উঠল যে, এখন তার ছায়া আমাদের সারা উঠোনটাকে ঢেকে দেয়। বসন্তকালে তার শাখাগুলো চমৎকার ফুলে ভরে ওঠে, আর শরতে ভরে ওঠে লাল আপেলে। অন্য গাছটিতে কখনও পাতাগুলি হলুদ হয়ে যায়, কখনও ফুলগুলো সময়ের আগেই ঝরে যায়, কখনও বা কয়েকটা দেখা দেওয়া আপেল পেকে উঠবার আগেই ঝরে পড়ে।

আর যেখানেই আমি থাকি না কেন, এই দুটি গাছ আমার চোখে ভাসে।

যখন আমি দেখি যে, সময় চলে যাচ্ছে, আর কাজ এখনো করা হয় নি, আমার মনে হয় যেন একটা অপরাধ ঘটে যাচ্ছে। আমার দুশ্চিন্তা আরম্ভ হয় আর তার ফলভোগ করেও লোকে — কিছু করার নেই, এই আমার স্বভাব।

সারিতেপের লোকেরা আমার চরিত্রের এই দিকটি লক্ষ্য করে, বিনা অজুহাতে কাজ নির্দিষ্ট সময়ে করার চেষ্টা করত।

যখন আমরা কাজের খসড়া করি, বীজ বপনের সময় নির্দিষ্ট করি

তখনই আমরা ঠিক করি যে, প্রতিটি কাজের জন্য দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন লোক খোঁজা দরকার।

আর এটা যে কী কঠিন ব্যাপার! প্রায়ই এমন হয় যে, লোকেরা নিজেরাই নিজেদের ক্ষমতার কথা জানে না, আবার এমন লোকও আছে, যাদের উদ্দেশ্য: কম কাজ করে বেশী আয় করা। ঠিক কথা, আমাদের কখনো কখনো ভুল হয়েছে, কিন্তু তাহলেও আমরা সব জায়গায় ঠিক লোককেই বসিয়ে দিলাম। এখন যৌথখামারে সবাই মনের মত কাজ পেয়েছে, দলনেতারা পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং যে কোন প্রয়োজনেই পরস্পরকে সাহায্য করে।

এর মধ্যে আমার বাবা অনেকবারই সারিতেপেতে এসেছেন, আর প্রত্যেকবারই আমরা যখন কেবল দু'জন থাকতাম আর চা খেতে খেতে গল্পসল্প করতাম, আমি অনুভব করতাম যে তিনি এসেছেন যতটা না আমাকে দেখতে, তার থেকে বেশী আমার ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য। দেখা যাচ্ছে, উনি আমার ওপর সব সময় নজর রেখেছেন, আমাদের গ্রামের কোন সাধারণ একটা খবরও তার মনোযোগ এড়িয়ে যায় নি।

কখনও ভুলব না, কিরকম গুরুত্ব দিয়ে তিনি কথা বলতেন। প্রথমবার তিনি এসেছিলেন সেই বছর, যেবার আমাদের খামার লক্ষ্যমাত্রার থেকে অনেক বেশী শস্য উৎপাদন করে। সেটা ছিল এক আশ্চর্য বছর। মার্চের শুরুতে শীত হঠাৎ কমে এলো, আর বসন্ত এলো অনেক আগে। তুলা-চাষীদের পক্ষে এটা বিরাট সাফল্য, মার্চের শেষের দিকে আমরা সব বীজ বপন করে ফেললাম। গ্রীষ্মকাল হল সেবার অত্যন্ত গরম, তিন মাস ধরে আকাশে এক কণা মেঘের দেখা নেই কিন্তু শীতকালে পাহাড়গুলিতে অনেক বরফ জমেছিল, তাই জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত নদীগুলিতে জল ছিল অনেক। উপরে সূর্যের তাপ, আর নীচে ভিজে মাটি পেয়ে তুলার ঝোপগুলি অনেক কুঁড়িতে ভরে গেল। আর শরৎ, সেই চমৎকার শরৎ ঋতু! নভেম্বর মাস পর্যন্ত উষ্ণ আবহাওয়া ছিল। নভেম্বরে কয়েকবার বৃষ্টি হল, মাটি বেশ ভালভাবে তার তৃষ্ণা মেটাল। তারপর আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে সূর্যরশ্মি দেখা দিল। রাত্রে শরতের হিমেল বাতাস আর দিনে উষ্ণ সূর্যরশ্মি — বাকী কুঁড়িগুলোও পেকে উঠে ফেটে গেল।

হ্যাঁ, সেই বছর আমাদের দারুণ সাফল্য হয়েছিল। যৌথখামার লক্ষ্যণীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, উৎপাদন এত বেশী

হয়েছে যে আমরা নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারছি না। তাই যখন আমরা নতুন লক্ষ্যমাত্রা খসড়া করছিলাম, তখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে তুলার ক্ষেত্র আমরা দেড়গুণ বাড়াব।

এখানে বলা দরকার যে, আমাদের জমির একটা অংশ একেবারে পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত গিয়ে পেঁছেছে। সেখানে বীজ ভাল অঙ্কুরিত হয়। সেখানেই আমরা তরমুজ, খরমুজ ফলাই। এই জমিটিরও এক অংশ তুলার চাষে নিয়ে নেবার পরিপ্রেক্ষিতও কম লোভনীয় নয়।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় কে যেন আমার দরজায় ধাক্কা দিল। খুলে দেখি বাবা। আমার এখানে রাত কাটিয়ে ভোর থাকতেই উঠে চলে গেলেন। সেই শান্ত রাত্রিতে তাঁর বলা কথা কখনও ভুলব না। ভর্ৎসনাপূর্ণ, শিক্ষামূলক এবং গভীর সহানুভূতিতে ভরা ছিল সেই কথাগুলি।

'তুই ভাবিস কি? পাহাড়ের নীচের জমিতে কে আবার তুলো বোনে? তিরিশ বছর, পঞ্চাশ বছরে একবার এমন চমৎকার আবহাওয়া হয়, আর তুই ভাবছিস প্রতিবার এমন হবে। আমি এদিকে ভাবছি যে আমার মেয়ে এতদিনে মাটির ভাষা বুঝতে শিখে গেছে। কিন্তু, ভুল...'

সকালে আমাদের এখানে এলেন হামিদ-মুয়াল্লীম আর যেন কথা প্রসঙ্গেই তুললেন ঐ পাহাড়ের নীচের জমিটার কথাই। শেষ পর্যন্ত আমরা এই পরিকল্পনা ত্যাগ করলাম।

আজ সন্ধ্যায় বাবা হঠাৎ সারিতেপেতে এসে হাজির। আমরা একসঙ্গে রাত্রের খাবার খেলাম, চা খেলাম, বিভিন্ন ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে কথা বললাম। শুতে যাবার সময় তিনি বললেন যে, সকালে খেতগুলো একবার দেখতে বেরোবেন, দুটো ঘোড়া যেন তৈরী থাকে। যেখানে আমাদের যাওয়া দরকার, সেখানে কোনো গাড়ী যেতে পারে না। আশীর ওপর বয়স বাবার কিন্তু ঘোড়ায় চড়তে তিনি এখনও খুবই ভাল পারেন।

রাত ধীরে ধীরে পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল। চারদিকে আদিগন্ত স্তেপভূমি। দেখা যাচ্ছে লাঙল দেওয়া কালো খেত, তুষারকণায় ঢাকা শীতের গমশষ্য দূরে রূপোর মত চিক্‌চিক্‌ করছে।

জেগে-ওঠা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন কোন দূরের স্বপ্নে ডুবে গিয়েছিলাম: আমার মনে হল যেন আমি যাচ্ছি গেক-গেলের বনের মধ্য দিয়ে অথবা ঠাকুমার বলা রূপকথার সেই চল্লিশ মেয়ের বাগানের মধ্য দিয়ে।

আমার চিন্তাধারা অনেকদূরে চলে গেছে বুঝতে পেরে বাবা লাগাম টেনে ঘোড়া থামালেন, বললেন:

'শোন্ দিকি, এই মাটিটা তোকে কি বলে...'

আমি তাকালাম আমাদের সামনের বিরাট তুলোর খেতটার দিকে। এই জমিটা নিয়ে আমরা ভীষণ ঝামেলায় পড়েছি: লক্ষ্যমাত্রা ছিল বিশ কুইণ্টাল কিন্তু প্যাওয়া গেছে মাত্র আট কুইণ্টাল। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, তুলোর ঝোপগুলি মাটির থেকে কেবল একটুখানি ওপরে উঠেছে, শেষ পর্যন্ত আমরা এই জমিটার ওপর সব আশা ছেড়ে দিয়েছি।

'মাটিটা খারাপ, বাবা, কিছু জন্মায় না।'

'খারাপ মাটি...' বললেন বাবা। 'আর আমি শুনতে পাচ্ছি, মাটিটা তোকে দোষ দিচ্ছে। বলছে যে ওর প্রতি ভাল মনোযোগ দেওয়া হয় নি... খারাপ মাটি? কেননা, এত বছর ধরে ওর সমস্ত রস শুষে নেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে তোরা ওকে কি দিয়েছিস? কিছু গোবর ঢালা হয়েছে কি হয় নি। তুই ওর কথা কি শুনতে পাচ্ছিস না? কান পেতে শোন!..'

আমি চিন্তায় ডুবে গেলাম। আমার মনে হল, যেন আমি এই সামনে পড়ে থাকা জমিটার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। যেন সে বলার ভাষা পেয়েছে: 'আমি বেঁচে আছি হাজার হাজার বছর, আমার জীবনে সবথেকে স্মরণীয় দিন হল সেই সময় যখন আমার বুক নরম রাখা হত, বীজ বপন করত, আমার বুকে আগাছা জন্মাতে দিত না...'

'মাটিও মানুষের মতই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।' বললেন বাবা। 'তারও শক্তিক্ষয় হয়, তারও যতন করা দরকার।'

তিনি লাগামে টান দিয়ে চলতে আরম্ভ করলেন। আমি অপরাধবোধ নিয়ে তাকালাম ঐ জমিটার দিকে।

'মাটির আছে অনেক রহস্য, বুঝলি,' বলে চললেন বাবা, 'সার দাও, ভাল করে খাওয়াও, তারও নতুন শক্তি দেখা দেবে... মাটির অনেক রহস্য, তার ভাষা বুঝতে শেখ্, মূল্য বোঝ।'

বাবার কথা শুনছিলাম আর মনে হচ্ছিল মাটি যেন বিরাট এক রসায়ন গবেষণাগার, যেখানে বস্তু এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, আর মানুষের জন্য সৃষ্টি করে বিপুল ঐশ্বর্য। আমার মনে পড়ল রসায়নের সেইদিকটার কথা যা মাটিকে তার ক্ষয় হওয়া শক্তির কিছুটা পূরণ করে দিতে পারে। মানুষের মেধার মহিমা হয়ত সেখানেই যে সে

পৃথিবীর প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করবার সময়, প্রকৃতির শক্তি পুরোপুরি কাজে লাগাবার জন্য তার পরিবর্তন সাধনও করে।

'বাবা, রসায়নশাস্ত্র অদূর ভবিষ্যতে এমন সব সার যোগাবে যে জমির শক্তি দশগুণ বেড়ে যাবে, যা ফলন অনেক বাড়াতে সাহায্য করবে...'

'হাত পা' গুটিয়ে বসে থাকবে নাকি,' বাবা আমাকে থামিয়ে দিলেন। 'যতদিন না তোমরা সবকিছু হাতের কাছে তৈরী অবস্থায় পাবে, আর জমি, রূপকথার গল্পের মত হঠাৎ উর্বর হয়ে উঠবে। তা' হয় না। খাটতে হবে। সত্যিকারের মাথা খাটাতে হবে।'

বাবা ঘোড়া ঘুরিয়ে তৈরী হওয়া ছাউনিটার দিকে এগিয়ে গেলেন। 'এ আবার কি ?' অবাক হয়ে বললেন তিনি।

আমি দেখলাম সেখানে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে একগাদা রাসায়নিক সারে ভর্তি প্যাকেট। কাগজের প্যাকেটগুলি জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে আর কাছাকাছি মাটি নুনের মত সাদা সুপারফসফেটে ঢাকা পড়ে গেছে। লজ্জা আর ঘৃণায় আমার দম বন্ধ হয়ে এলো। আমি বাবাকে কি উত্তর দেব ? কোন হতচ্ছাড়া দলনেতা যে এই প্যাকেটগুলোকে এখানে ফেলে রেখেছে...

যেন আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই বাবা বললেন:

'কোন কোন ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা বিরাট অপরাধ। এই সারগুলি এক মিনিটও খোলা আকাশের নীচে ফেলে রাখা উচিত নয়। বৃষ্টি হোক, বরফ হোক — ভিজে গেলেই হয়ে গেল। দেখ্, রাতের শিশির প্যাকেট-গুলোকে কেমন নষ্ট করে দিয়েছে। কে ওগুলো এখানে এনে ফেলে রেখেছে ? ওই জমিটা আমাদের এই অবহেলার কথাই বলছিল। সার যে মাটির খাদ্য। আর এখানে তা' পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে...'

আমি আর রাগ চাপতে পারলাম না:

'আজই হাসানের কথা তুলতে হবে। ওকে আর দলনেতা করা হবে না!..'

বাবা আমার দিকে ফিরলেন:

'আরে!.. আমি ভাবতাম তুই কেবল মাটির কথা শুনতে পাস না, এখন দেখছি লোকের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তাও তুই শিখিস্ নি। তুই হাসানকে ওর ভুলটা বুঝিয়ে দে, ওর লজ্জা হোক, পরের বার এসব

ব্যাপারে আর এমন করবে না... সাজার ভয় পাবার দরকার নেই, কাজের ভক্ত হয় যেন...'

বাবা ঘোড়াকে চাবুক মেরে এগিয়ে গেলেন। আমি তাঁর পিছনে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম এই আশীবছরের বৃদ্ধের শক্তি আর স্পষ্ট চিন্তাধারার কথা।

কিছুক্ষণ পরে বাবা ঘোড়া থামালেন একটা জমির সামনে, যেখানে বহু বছর ধরে হাল, কোদাল চলে নি, ট্রাক্টরের আওয়াজ শোনা যায় নি। জমিটাতে আগাছা ভর্তি হয়ে গেছে, জায়গায় জায়গায় পাথরের টুকরো জমে আছে, পড়ে আছে অসংখ্য গাছের গুঁড়ি। আমার দিকে না তাকিয়ে বাবা বললেন:

'আর এই জমিটা তোকে কি বলে ?'

'এখানে নদীগর্ভ ছিল, বাবা।' আমি বলি। 'আগে কখনো এই নদীগর্ভের দুই তীরেই ছিল তুত, পপলার, চিনার গাছের সারি আর ছিল নলখাগড়ার ঝোপ। কিন্তু আমার আসার কয়েক বছর আগে জল ক্রমশ কমতে কমতে নদী শুকিয়ে যায়। শুকিয়ে যায় গাছগুলিও, পড়ে থাকে কেবল এই গুঁড়িগুলি। আর ওপারে কবে যেন ছিল এক কবরখানা, এই সব পাথরগুলি সেখানে সমাধিশিলা ছিল।

'প্রথমবার দেখেই আমি এসব বুঝতে পেরেছি। এটা ভাল জমি, যাই বসা না কেন দু'তিন বছর ভাল ফসল দেবে। খালি গুঁড়িগুলো উপড়ে ফেলতে হবে আর পাথর সরিয়ে ফেলতে হবে।'

'এত সব করা খুবই কঠিন, বাবা। আমাদের হাতে এখন অনেক বেশী জরুরী কাজ আছে।'

'কৃষিজীবির হাতগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু চিন্তাধারা নয়। পরিশ্রমকে ভয় পাবি না তা সে যত কঠিনই হোক না কেন, সেই পরিশ্রম যে তোকে মস্ত বড় সুখ এনে দেবে।' প্রতিবাদ করলেন বাবা।

তিনি হালকা কুয়াশায় ঢাকা স্তেপভূমির দিকে দেখতে দেখতে, কি একটা গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে আস্তে আস্তে চলতে লাগলেন।

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আনন্দ আর বিস্ময় নিয়ে ভাবতে লাগলাম জীবনের প্রতি তাঁর আগ্রহ, ভালবাসার কথা। তাঁর সম্বন্ধে অসম্ভব গর্ববোধ করতে লাগলাম। হঠাৎ তিনি ঘোড়া থামালেন, আমার ঘোড়া

যখন কাছে এল, তিনি যেন বন্ধুকে নিজের কোন গোপন কথা বলছেন এমনভাবে আস্তে করে বললেন:

'জমি আমাকে এমন সব গল্প বলে, যে আমি একশ' বছর ধরেও তা' শুনতে রাজী।'

আমি তাঁর এই কথাগুলি চিন্তা করে তার মধ্যে গভীর অর্থ খুঁজে পেলাম। বাবা মাটিকে ভালবাসেন, আর মাটিও এই ভালবাসা অনুভব করে, তাঁর কাছে নিজের মন খুলে দেয় বন্ধুর মত।

এখন আমি যেখানেই যাই না কেন মাটির কণ্ঠস্বর শোনার চেষ্টা করি। যখন অন্ধকার মরুভূমি, পাহাড়, উপত্যকাকে ঢেকে ফেলে, রাত্রির সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে মাটি কিন্তু ঘুমোয় না, বিশ্রাম করে না: সে তখন তার চিরন্তন সংগীত গাইতে থাকে। এই গানের মধ্যে আমি শুনতে পাই দশবছর, একশ' বছর আগে মৃতব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর আর ভবিষ্যতের মানুষের কণ্ঠস্বর।

হ্যাঁ, মাটি আমাকে সব সময় ডাকে, আমাকে বাধ্য করে চিন্তা করতে, পরিশ্রম করতে, বাগান আর খেতের জমি চাষ করতে, ফুলের চাষ করতে...

লাল দিগন্ত

ঘন ঘন বসানো বোরিং টাওয়ারের বেড়ায় ঘেরা সাবুনচির পুরানো তৈলশিল্পাঞ্চলে গোধূলি নামছে। হঠাৎ অন্ধকার নামল, যেন পৃথিবীর ওপর একটা কালো চাদর ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আকাশের বিরাট সীমাহীনতায় দেখা দিল প্রচণ্ড উজ্জ্বল একটামাত্র আলোর ফুলকি — প্রথম জ্বলে ওঠা তারার আলো, স্বপ্নের মত সুন্দর আর স্বপ্নের মতই অনেক দূরের।

চওড়া কাঁধ, সুগঠিতদেহ, শ্যামবর্ণের আলি মোটা মোটা তক্তা আর কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী বোরিং টাওয়ারের (সে সময়ে সব বোরিং টাওয়ারই কাঠের হত) কাছে দাঁড়িয়ে আত্মমগ্ন হয়ে তারাটি দেখছিল। ভারী ঘূর্ণায়মান চাকার, পুলির, গিয়ারের অবিরাম আওয়াজ, ড্রাইভিং বেল্টের শোঁ শোঁ শব্দ অথবা মেশিনের একঘেঁয়ে ঘুম পাইয়ে দেওয়া ঠকঠকানি কিংবা বাটালি দিয়ে মাটি কাটার আওয়াজ কোনটাই তার কানে ঢুকছে বলে মনে হয় না।

হঠাৎ পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। সে চমকে উঠে কান খাড়া করে রইল: কে যেন চুপিচুপি অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে আসছে, তার দ্রুত নিঃশ্বাসের আওয়াজে বোঝা যায় যে, ভয় পাচ্ছে কেউ তার পিছু নেবে। তেলচিটে টুপিটা সে চোখের ওপর অনেকখানি টেনে দিয়েছে কিন্তু তার হাঁটার ধরণ, লম্বা গড়ন আর চটপটে গতিবিধি দেখে আলি বুঝতে পারল যে এই লোকটি পিওতর। কি রোগা হয়ে গেছে সে, গালদুটি হলুদ হয়ে গেছে, গর্তে বসে গেছে, যেন অনেকদিন রোগে ভুগে উঠেছে।

'আলি, শীগগির এই কাগজগুলি লুকিয়ে ফেল, এর মধ্যে আছে পার্টিসংক্রান্ত দলিলপত্র, আমাদের সংগঠনসংক্রান্ত সব কিছু। দেরী কোরো না।'

লোকটি আলির হাতে একটা বাণ্ডিল গ‍ুঁজে দিল আর তাকে সঙ্গে করে টেনে নিয়ে গেল অন্ধকার টাওয়ারের ভেতর। দ্বিধা বা চিন্তা-ভাবনার সময় ছিল না — আলি মেশিনের আড়ালে ছ‍ুটে গিয়ে তার স্লাইডের নীচে কাগজগ‍ুলি ল‍ুকিয়ে ফেলল।

ফিরে এসে সে জিজ্ঞাসা করল: 'পিওতর, হয়েছে কি ?'

পিওতরের বড় বড় নীল চোখে উৎকণ্ঠা। নিঃশ্বাস ফেলে টুপিটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে বলল:

'ধরপাকড়। মিটিংয়ের সময়ে। আমি কোনোরকমে জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ি, আর সাশা ধরা পড়েছে !'

'সাশা গ্রেপ্তার হয়েছে ?'

আর বেশী কিছ‍ু ব‍ুঝিয়ে বলার দরকার ছিল না, এমনিতেই সব পরিষ্কার। ভয়ংকর, ঘোলাটে এক রাগের বোধ আলিকে চেপে ধরল, অনেক কষ্টে সে উত্তেজনাকে দমন করে বিরক্তির সঙ্গে থ‍ুতু ফেলে ফিসফিসিয়ে বলল:

'তোমায় সাবধান হতে হবে, পিওতর! ওরা তোমায় বহ‍ুদিন ধরে খ‍ুঁজছে, একেবারে পায়ে পায়ে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। যদি ওদের খপ্পরে একবার পড় তো আমাদের কাজকর্ম...'

'ভয় পেও না, বন্ধ‍ু! ওদের অত ক্ষমতা নেই। ঠিক পালিয়ে যাব। খালি হ‍ুঁশিয়ার আর শক্ত হতে হবে।'

একেবারে দরজার কাছেই পায়ের জোর আওয়াজ পাওয়া গেল; অন্ধকারে অদৃশ্য লোকটি কাঠের তক্তার ওপরে ব‍ুটের নালের আওয়াজ তুলে নিশ্চিন্তভাবে হাঁটছে। আলি ব‍ুঝল, ফোরম্যান গিয়াস বোরিং মেশিনগ‍ুলো দেখে বেড়াচ্ছে।

'এই দিকে, এই দিকে, বয়লার র‍ুমের ভেতর দিয়ে চলে যাও। ঐ যে দরজা।'

পিওতর বন্ধ‍ুকে ধন্যবাদ জানাবারও অবকাশ পেল না, নীচু হয়ে দরজার মধ্যে গিয়ে ঢুকল আর সঙ্গে সঙ্গে বোরিং টাওয়ার আর পেট্রোল রিজার্ভয়ারের ভীড়ে হারিয়ে গেল। গ‍ুমোট, ভারী বাষ্পময় ভরা রাতের অন্ধকার তাকে সম্প‍ূর্ণ ঢেকে ফেলল।

ইতিমধ্যে কালো ফারের ককেশীয় টুপি মাথায় গিয়াস ভুঁড়ি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির ধাপে আর সন্দিগ্ধভাবে অন্ধকারের মধ্যে দেখার

চেষ্টা করছে, যেন আশা করছে যে দেখতে কিছু না পেলেও একটা কিছু আঁচ পাবে।

'কে এসেছিল এখানে?'

'কেউ না।'

'তাই নাকি?'

'কে আর আসবে রাত্রিবেলায়।' আলি বোকা সাজল।

'সত্যি করে বল, নাহলে তোর বাপকে শুদ্ধ পুড়িয়ে মারব, কাউকে ছাড়ব না।' ছেড়ে ছেড়ে কর্কশভাবে এই কথাগুলো বলে ফোরম্যান আলিকে হিঁচড়ে টেনে আনল নিজের কাছে; কিন্তু সেই মুহূর্তে একটু দূরে এক ভীত কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

'গিয়াসসাহেব, উনআশী নম্বরে দুর্ঘটনা ঘটেছে — রড ভেঙ্গে গিয়ে যন্ত্রপাতি সব কূয়োর মধ্যে পড়ে গেছে।'

ফোরম্যান মুখখিস্তি করে উঠে পিছন ফিরল আবার বুটের আওয়াজ উঠল, তারপর সব চুপ হয়ে গেল।

দরজা বন্ধ করে আলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হঠাৎ তার নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত বলে মনে হল, যেন গোটা দিনটা সে মেশিনের কাছে দাঁড়িয়ে থেকেছে। 'এখানে পার্টিসংক্রান্ত দলিলপত্র আছে,' তার মনে পড়ল পিওতরের কথাগুলি। চিন্তা কোরো না বন্ধু, আলি মরে গেলেও শত্রুকে গোপনীয় তথ্য জানতে দেবে না।

পঁচিশ বছরের আলির চওড়া, রোদেপোড়া মুখমণ্ডল, বড় নাক, ঠোঁট খুব লাল নয়, গালের মতই বিবর্ণ। ভীড়ের মধ্যে তার দিকে হয়ত নজরই পড়বে না, কিন্তু তার ঘন ভ্রূর নীচে চোখের একাগ্র, স্থির দৃষ্টির দিকে দেখলে মনে হবে যেন ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে বাতিঘরের চোখধাঁধান আলো সবাইকে নিজের দিকে টানছে...

অনেক দুঃখ অনেক দুর্ঘটনার সাক্ষী এই দুটি নবীন চোখ।

আলির জীবনটা ছিল যেন শরতের উত্তাল কাস্পিয়ান সাগরে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছোট ভঙ্গুর জেলে নৌকা। ঢেউগুলি বৃথাই নৌকাটিকে ধাক্কা মারছে, উঁচু তীরের গায়ে আছড়ে ফেলবার বৃথাই চেষ্টা করছে — নৌকাটি ডুবল না, ভাঙলও না, সাহসী কর্ণধারও মরল না, বরং তার শক্তি আরও বেড়েছে, বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তার হৃদয় আরো শক্ত

হয়েছে, সে এখন যৌবনের সবথেকে নির্ভীক আবেগপ্রবণ দিনগুলিতে এসে পেঁৌছেছে।

সে দেখেছে, মর্মে মর্মে অনুভব করেছে নির্যাতন, কিন্তু সে ভেঙে পড়ে নি, একান্ত আগ্রহে রাত ভোর হবার প্রতীক্ষা করেছে।

সে স্বপ্ন দেখত যেন শীঘ্রই কোন শক্তিশালী হাত পৃথিবীর ওপর থেকে এই কালো চাদরটা টেনে খুলে দেবে। আর প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়, কষ্ট পাওয়া অত্যাচারিত মানুষ, আর এক টুকরো রুটির জন্য, এক ফোঁটা জলের জন্য, এক বাটি সুপের জন্য যারা সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়েছে, যাদের হাতেই শুধু বেড়ি পরান নয়, বেড়ি পরান যাদের ধ্যান-ধারণাতেও, তারা দেখবে মেঘহীন নির্মল আকাশে সূর্য এবং তারা হবে স্বাধীন, সুখী ও আনন্দিত।

বাবা মারা যাবার পর পনের বছর বয়স্ক আলি গ্রামে রাখালের কাজ করত, পাহাড়ে ভেড়ার পাল পাহারা দিত, কিন্তু সেই বছর ফসল ভাল না হওয়ায়, মালিক তাকে ছাড়িয়ে দেয়, তাই সে শহরে এসে তৈলশিল্পাঞ্চলে কাজ নেয়। এখানে সবাইকেই কাজে নেওয়া হত, এমনকি ছোট ছোট ছেলেদেরও: বড়রা মাইনে পেত অতি সামান্য আর ছোটরা পেত আরও কম। আলি ব্যারাকে নিজের জায়গা করে নিল। প্রথমে তার মনে হয়েছিল আধপেটা খাওয়া, ফোরম্যানের মারধর আর বার ঘণ্টা ডিউটির এই নিরানন্দ জীবন সহ্য করতে পারবে না; কিন্তু ভাগ্যবশত এখানে সে পিওতরের দেখা পেল। সে এই গ্রাম্য রাখাল ছেলেটির সঙ্গে নিকট আত্মীয়ের মত ব্যবহার করত, মিষ্টি করে কথা বলত; সে তাকে শিখিয়েছিল কেমন করে এক মাইনের দিন থেকে আর এক মাইনের দিন পর্যন্ত টেনেটুনে চালান যায়, সে-ই দর্জির, মুচীর কাছে তার হয়ে বলেছিল তারা যেন ধারে তাকে কোনরকম জামাজুতো করে দেয়।

আর যখন আলির আঠার বছর পূর্ণ হল, যখন তার গায়ে শক্তি বাড়ল লম্বা হয়ে উঠল, যখন কেবল শিল্পের কাজই শিখে নিল না, জীবন সম্পর্কে জ্ঞান সচেতনতাও এল তার মনে, তখন পিওতর তাকে নিয়ে এল গুপ্তচক্রের কাজে। সেখানে আলি অনেক কিছু শিখল এবং তার এই দৃঢ় ধারণা জন্মাল যে বাঁচতে হবে খালি নিজের জন্যই নয়, বাঁচতে হবে পরের জন্য, জনগণের জন্য এবং এই বিশ্বাস অন্যদের চোখে এমনকি তার নিজের চোখেও তাকে অনেক বড় করে তুলল। কিন্তু অন্যদিকে সে বোকা-

সোকা সাধারণই রয়ে গিয়েছিল: সে বুঝতে পারত না শ্রমিকশ্রেণী এখনও পর্যন্ত কেন ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে না আর ম্যালিক-শিল্পপতিদের এই ছোট্ট একটা গোষ্ঠীর উচ্ছেদ করতে পারছে না। উপায় কি? এমনকি তৈলশ্রমিকের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বেশ কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকও আছেন যাঁরা রাজনৈতিক সংগ্রামের থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করতেন, বলশেভিকদের ধারেকাছে ঘেঁষতেন না এবং তাদের আহ্বানে কান দিতেন না, কেবলমাত্র নিজেদের সুখ — সৌভাগ্যের কথাই চিন্তা করতেন। কিন্তু জীবন — কঠোর, তিক্ত, যন্ত্রণাময় জীবন — প্রতিনিয়ত নিজের কথা মনে করিয়ে দিত। আর আলি দেখেছে বাকুর রাস্তায় রাস্তায় অনাহারে মরণাপন্ন শিশুদের, দেখেছে ছেঁড়া পোষাকে আবৃত কম্পমান, রোরুদ্যমান মাদের যারা ভিক্ষা চাইছে। আর যদি কখনো সন্ধ্যাবেলায় বড়লোকদের এলাকায় বেড়াত তখন তৈলশিল্পপতিদের সেই সব বিরাট বাড়ীগুলির আয়নার মত চকচকে জানলাগুলি তার সামনে তুলে ধরত মর্মর, গিল্টিতে জাঁকজমকপূর্ণ ঘরদোর আর মহামূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত মহিলাদের দৃশ্য। কিন্তু এসবই ছিল একই আকাশের নীচে, একই শহরে, একই সময়ে — নগ্নপা শিশুরা আর এই বিরাট উজ্জ্বল প্রাসাদগুলি, যাদের দরজার কাছে রঙ-করা ফিটনগাড়ী দাঁড়িয়ে থাকত, তাদের বিরাট বিরাট উজ্জ্বল আলোকিত হলগুলিতে ভোজউৎসব, আমোদ-আহ্লাদ হত, খেলা, নাচ আর ব্যভিচারে গা ভাসিয়ে দেওয়া হত।

এই সমস্ত কিছু তার কাছে দুর্বোধ্য ছিল, এ কথা চিন্তা করতে করতে তার মাথা খারাপ হয়ে যেত, সে বুঝতে পারত না কেন অত্যাচারিত, অবহেলিত এবং অসহ্য দুঃখকষ্ট সয়ে থাকা মানুষ এই সংগ্রামে নিজের স্বার্থ বুঝতে পারে না এবং তা থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে।

এই সব চিন্তা-ভাবনা সে বন্ধুকে খুলে বলে, পিওতর বিস্মিত হয় না, সে তার নিজের জীবনে এত দেখেছে যে তাকে বিস্মিত করা সম্ভব নয়, সে নরম প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলল: 'তাড়াহুড়ো করলে হয় না। সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। অপেক্ষা কর। আমরা সমস্ত জনগণকে জাগিয়ে তুলব, সবাইকে খাড়া করব।'

অনেক সন্ধ্যা পিওতর তার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছে, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে সেই আলির চোখ খুলে দিয়েছে আর আলির চোখেও কিছুটা দূরদৃষ্টি এসেছে, সে ধীর, নিশ্চিতভাবে

ভবিষ্যতের দিকে দেখতে শিখল এবং বুঝল যে পৃথিবীর ভাগ্য নির্দ্ধারিত হবে শ্রমজীবি মানুষের দ্বারা... প্রতিদিনের আকাশের দিগন্ত ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে গেল। চিরন্তন পথিক সূর্য নিশ্চয়ই তার সঞ্জীবনী রশ্মি দিয়ে শরতের মেঘের ভীড় সরিয়ে দেবে এতে আলির আর কোন সন্দেহই ছিল না এখন। তার সামনে মানবজাতির সুখী ভবিষ্যতের পথ খুলে গেছে।

সে এখন পিওতরের কথা কেবল শুনতই না, লোভীর মত গিলতে তার প্রতিটি কথা, যেন এটা একটা আবিস্কার। সে নিজেও শ্রমিকদের কাছে যেত, দ্বিধাগ্রস্তদের বোঝাত, ভীরুদের সাহস দিত, তাদের লেনিনের কথা বলত, কারণ নিজে অনুভব করত যে সর্বহারার শক্তি তার একতায়। একহাতে নাল সোজা করা যায় না বা শিকল ছেঁড়া যায় না, তার জন্য দরকার হাজার হাজার কড়াপড়া, মাংসপেশীপুষ্ট হাত।

এখন জারবাহিনী জাঁকজমক করে জয়োৎসব পালন করুক — যেমন অহংকারী মল্লযোদ্ধা মঞ্চের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দর্শকদের তার সঙ্গে শক্তির পাল্লায় নামার জন্য আহ্বান জানায়। কিন্তু লেনিন, পার্টি আর শ্রমিকরা চরম লড়াইয়ে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

সাশার সঙ্গে আলির মাঝে মাঝে দেখা হত, এই সদাহাস্যময় ছেলেটি কখনও কখনও এত সাহসী যে আত্মবিস্মৃত হত আবার কখনও কখনও বৃদ্ধদের মত সতর্ক; কেউ, এমনকি পিওতরও তার আসল নাম জানত না। গুপ্তচক্রের কাজ পরিচালনার পরে শ্রোতাদের সঙ্গে একটু-আধটু হাসিঠাট্টা করে, তাদের সবথেকে গোলমেলে কঠিন প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে সাশাই প্রথম ঝড় বৃষ্টিভরা রাতে বাইরে বেরিয়ে যেত। তার কোনো চিহ্নই দেখতে পাওয়া যেত না। কেউ না, এমনকি পিওতরও জানত না কোথায় তার আশ্রয়স্থান। আর এখন সে গ্রেপ্তার হল। বেচারা... আলির মনে হল যেন গভীর অন্ধকারের মধ্য থেকে আন্তরিক আনন্দভরা সাশার বুদ্ধিমান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চোখদুটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। কে জানে, তার ভাগ্যে কী কষ্ট লেখা আছে... সে কি বেঁচে আছে? যার বাঁচবার আর লড়াই করার ছিল অদম্য আকাঙ্ক্ষা, যার হৃদয় ছিল জনগণের জন্য ভালবাসা আর সহানুভূতিতে পূর্ণ তাকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। না, আমাদের ওকে বাঁচাতেই হবে!

অন্ধকার রাত, কাছের আর দূরের বোরিং মেশিনগুলো একঘেঁয়ে আওয়াজ করছে; বাটালির ভূগর্ভে কামড় বসাবার আওয়াজ উঠছে,

দেওয়ালের ফাটলের মধ্য দিয়ে হাওয়ার করুণ শিস্ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ অসমান কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী দরজার কাছে খস্‌খস্ আওয়াজ শোনা গেল। তারপর জোরে কি একটা পড়ার আওয়াজ হল।

'ওখানে কে?'

'আলি, খোল্, আমি গিয়াস।'

'এই জন্তুটার এখানে আবার কিসের দরকার?' দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সে ভাবল, 'তবে কি...'

যেন তার মনোভাব বুঝতে পেরেই ফোরম্যান দরজার গায়ে একেবারে লেপ্‌টে গিয়ে অনুনয় করে বলল:

'ভয় পাস না, খোল্, নিজের কথা ভাব্, শুধু শুধু মরবি কেন... তোকে আমি ড্রিলিং মেশিন চালাবার কাজে লাগিয়ে দেব। আমি জানি যে এখানে পিওতর এসেছিল। ও কোথায় বল্, তুই পুরস্কার পাবি।'

দরজার ফাঁকের কাছে মুখ এনে আলি স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে বলল:

'কিছু বলবও না আর তোমাকে এখানে ঢুকতেও দেব না। আমি তোমার মত হয়ে উঠতে পারি নি যে, অন্যের দুর্দশার বিনিময়ে নিজের সৌভাগ্য তৈরী করব। ঐ সব কথা বলে বোকাদের ঠকাও গিয়ে আর অসৎ লোকদের কিনে নাও গিয়ে।'

'বুদ্ধু...' হতাশ স্বরে বলল ফোরম্যান, 'নাকি তোর বাঁচার ইচ্ছে নেই? এখানে কেন এসেছিল পিওতর? কোথায় ও?'

'বৃথা চেষ্টা করছ, সারা পৃথিবী উল্টোপাল্টা হয়ে গেলেও বলব না।'

'তোকে এমনি না মেরে ফেলে, ফুটন্ত জলে সেদ্ধ করা উচিৎ,' প্রচণ্ড রাগে নড়বড়ে দরজাটায় লাথি মেরে চেঁচিয়ে উঠল গিয়াস।

'আমরা না বেঁচে থাকলে তাগি-বেক বা তার চেনেবাঁধা কুকুর কেউই বেঁচে থাকতে পারবে না।' ঠাণ্ডা মাথায় আলি প্রতিবাদ করল, 'আমাদের রক্তেই তোমাদের পেট ভর্তি। দেখা যাবে, কে শেষ অবধি টিঁকে থাকে।' মাত্র এক ঘণ্টা আগেও সে ভাবতে পারত না যে তার মধ্যে এতখানি স্থৈর্য আর আত্মসংযম আছে।

আলির বাপ-চৌদ্দপুরুষকে গালি আর অভিশাপ দিতে দিতে ফোরম্যান কোথায় যেন চলে গেল। কিন্তু মিনিটখানেক বাদেই ফিরে এল হাতে একটা ভারী শাবল নিয়ে। সেটা দিয়ে দরজা ভাঙতে আরম্ভ করল।

'তার মানে, ও বুঝতে পেরেছে যে পিওতর আমার কাছে কাগজপত্র

রেখে গেছে।' আলির মাথায় এই চিন্তা খেলে গেল, সে বুঝতে পারল আর কিছু করার নেই, ক্ষেপে ওঠা নেকড়েকে কথায় ভোলান যাবে না, মাটিতে পড়ে থাকা পাইপের একটা ভাঙা টুকরো সে হাতে তুলে নিল।

দরজা খুলে গেল, গিয়াস অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়াল দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে, কিন্তু তখুনি তার মাথার ওপর নেমে এল একটা প্রচণ্ড আঘাত, সে ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেল, পচা গাছের গুঁড়ির মত।

ঘন অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের হলুদ ঘোলাটে আলো। আজকের রাত গভীর উৎকণ্ঠায় পূর্ণ, মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে তীক্ষ্ম শিসের শব্দ। সমুদ্রের দিক থেকে আসা জোর হাওয়া ছাতে ভাঙা লোহার পাতে আওয়াজ তুলছে, নুয়ে পড়া বেড়াকে দোলাচ্ছে। এই রকম খারাপ আবহাওয়ায় ঘরে গরম চুলার কাছেই বসে থাকার কথা। কিন্তু রাস্তায় মাঝে-মধ্যে এক-আধজন পথচারীকে দেখা যাচ্ছে, ঝুঁকে পড়ে, জ্যাকেট বা তুলোর কোটের কলার উঁচু করে তুলে দিয়ে জলকাদায় পা ফেলে হাঁটছে, পরম নিশ্চিন্ততায় দ্রুত গতিতে, বোঝা যাচ্ছে তারা কোন কিছুকেই ভয় করে না।

ভেজা সুড়ঙ্গঘরের দরজায় ঢুকবার মুখে তারা আবার টানা শিসের আওয়াজ শুনতে পায়, অন্ধকারে চেনা যায় না কে একজন প্রত্যেক আগন্তুকের মুখের কাছে তুলে ধরছিল প্রায় নিভে আসা ছোট্ট মোমবাতির আলো, আগন্তুক দলের লোক একথা নিশ্চিত হবার পর তাকে বিনাবাক্যব্যয়ে ঢুকতে দিচ্ছিল।

ভেতরেও আধা-অন্ধকার, একটা গাছকাটা গুঁড়ির ওপর মোমবাতি জ্বলছিল, সবাই মাটিতেই পা ছড়িয়ে বসেছিল আর চুপ করে সিগারেট খাচ্ছিল।

'মনে হয় সবাই জড় হয়েছে। গুদরেত্ তুই বাইরে গিয়ে পাহারা দে,' বলল পিওতর।

গুদরেত্ আলোটা ঘরের মধ্যে রেখে বেরিয়ে গেল। দরজা কাঠের পাটা দিয়ে ভাল করে বন্ধ করে দেওয়া হল। সবাই আগের মতই চুপ, যেন অসাবধানে কোন কথা বলে ফেলার বা বিস্ময়োক্তি দিয়ে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করার ভয়ে।

'কমরেডগণ,' নিজের অল্প কয়েকজন বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে নীচুস্বরে বলল পিওতর। কম্পমান ছায়াগুলি তাদের ক্লান্ত, অবসন্ন

মুখগুলিকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলেছে কিন্তু তাদের চোখে জ্বলছে ক্রোধ আর দৃঢ় সংকল্প। 'কমরেডগণ। আমাদের প্রিয় সাশাকে মেরে ফেলেছে !.. আমরা দাঁড়িয়ে উঠে তার আত্মাকে সম্মান জানাব।'

কড়াপড়া হাতগুলি মাথা থেকে তেলকালির গন্ধমাখা টুপিগুলো টেনে খুলে ফেলল। লোকগুলি ধীরে ধীরে মাটি থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে উঠে দাঁড়াল, এই নিস্তব্ধতা ছিল অশুভ ও পীড়াদায়ক। সবাই বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন, চীৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল তাদের, কিন্তু আবার মাটিতে বসে পড়ে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে রইল। আর প্রত্যেকেই ভাবছিল কবে যে এই ভয়ঙ্কর দিনগুলির শেষ হবে।

তাদের মধ্যে সবথেকে তরুণ আবেগপ্রবণ ছেলেটি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল:

'পরপর এইভাবে মানুষগুলো মরছে। সাশাও এখন প্রাণ দিল। আর সহ্য করা উচিৎ নয়। এবার আমাদের অস্ত্র হাতে নিতে হবে !'

ঘরের অন্ধকারে একটা বিষণ্ণ হাসি শোনা গেল:

'আহ্-হা... বলা তো সোজা, কিন্তু জনগণকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য জাগিয়ে তোলা — এ তোমার ছেলের হাতের মোয়া নয়।'

আলি কিছু বলতে চাইল। তার ভেতরটা ফুটছিল একেবারে, প্রত্যেকটা শিরা ফুলে উঠেছে, হাতে দারুণ ধারাল তরবারি নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু সে কথা আরম্ভ করল ধীরে সুস্থে, বিচক্ষণভাবে:

'জনগণ এখন এরকম অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত নয়, তারা আমাদের সমর্থন করবে না। তার জন্য প্রয়োজন আত্মসংযম, শৃঙ্খলা আর সঙ্ঘবদ্ধতা।' সে সাশা আর পিওতরের কথারই পুনরাবৃত্তি করছিল, কিন্তু পুনরাবৃত্তি করছিল এত অকপট আর আত্মবিস্মৃতভাবে যেন মনে হচ্ছিল এই কথাগুলো এখুনি তার ভেতরে জন্ম নিয়েছে।

'পার্টি সেলকে রক্ষা করতে হবে, জোরদার করে তুলতে হবে। প্রত্যেক মেহনতী মানুষের মনে শ্রেণীচেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে। শত্রুরা তো হারিয়ে যাচ্ছে না: আমাদের নেতাদের মেরে ফেলছে আর দুর্বলদের ভয় দেখাচ্ছে, কখনো কখনো অল্প কিছু অর্থ দিয়ে তাদের বশ করছে। এখন সমস্ত তৈলখনিশ্রমিকের কাছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রাখতে হবে, যাতে শ্রমিকরা আমাদের চারদিকে জড়ো হয়।'

'এটা ভাল কথা, মালিকের সঙ্গে যৌথ চুক্তি করতে হবে, এতে সব শ্রমিকই রাজী হবে।' আলির পাশে বসা একজন বলল।

একটু চিন্তা করে পিওতরও আলিকে সমর্থন করল, 'ভাল কথা, যৌথ চুক্তির জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের অর্থনৈতিক স্বার্থও রক্ষা করব এবং শ্রমিকদের ঐক্য দৃঢ় করব।'

'চুক্তি ছাড়া কি অবস্থা দেখ,' বলল আলি, 'কর্তৃপক্ষ দু'ঘণ্টা ডিউটি বাড়িয়ে দিয়েছে। চোদ্দ ঘণ্টা কাজের দিন, ভাবো, কি করে পারা যায়। ডিউটির পরে এমনিতেই আর দাঁড়াবার শক্তি থাকে না। আর কেন কর্তৃপক্ষ বিনা বাধায় প্রভুত্ব করে যাচ্ছে ? কারণ চুক্তি নেই।'

কিন্তু বদমেজাজী গুরবানের ওপর এই বিচক্ষণ বক্তৃতা তেমন ফলপ্রসূ হল না। সে উত্তেজিতভাবে অধৈর্য প্রকাশ করল, 'হয় বাঁচা, নয় মরা ! অন্য পথ নেই। শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। অনেক কথা বলা হয়েছে, আর দরকার নেই !.. কালই কাজে নামতে হবে। সমস্ত আমলা, মালিক আর পুঁজিপতিদের ছেঁটে ফেলতে হবে, একেবারে গোড়া থেকে। ওদের জায়গায় নিজেরাই বসব। অসুবিধা হবে না, কাজ চালিয়ে নেব। তখন জনগণ ঠিকই আমাদের সঙ্গে আসবে।'

গোলমাল আরম্ভ হল, সবাই উত্তেজিতভাবে তর্ক আরম্ভ করে দিল। দেখা গেল, আরো অনেকেই গুরবানের সঙ্গে একই মত পোষণ করে। কেবল যাদের পরাজয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে, যারা ভয়ঙ্কর অসমান সংগ্রামে পোক্ত হয়েছে, তারাই আলিকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করল।

পিওতর বুঝল, এবার তার কথা বলা দরকার — এতক্ষণ সে খালি শুনছিল যেন প্রত্যেকটি গুপ্তকর্মীর সাহস, স্থৈর্য আর বৈপ্লবিক চেতনার মান নির্দ্ধারণ করছিল।

'না কমরেডগণ,' বলল সে কণ্ঠে দৃঢ় বিশ্বাসের সুর ফুটিয়ে, সে অনুভব করল যে উপস্থিত সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ তার দিকে। 'আমরা ভাল করে না ভেবে, হঠাৎ তাড়াহুড়োর মধ্যে কোন কিছু করে বসার ঝুঁকি নেব না। যদি তা' করি তাহলে জার সরকারেই তাতে সুবিধে হবে। আর অবশ্যই কেন্দ্রীয় কমিটির ও কমরেড লেনিনের অনুমোদন ছাড়া আমরা একপাও এগোব না। মালিক শিল্পপতিদের, কর্তৃপক্ষ, আমলাদের মেরে ফেলা মানেই সফল বিপ্লব হয় না। যখন আমাদের সঙ্গে আসবে হাজার হাজার লোক, এই আজকের মত মুষ্টিমেয় কয়েকজন নয়, তখনই আমরা কাজে নামব !'

'ঠিক, কমরেড পিওতর !'

'উপযুক্ত কথা।'

গুরবান মাথা নিচু করে অসন্তুষ্টভাবে শুনছিল, তার কাছে পিওতরের কথাগুলি মনে হচ্ছিল শূন্য, অর্থহীন। যেন মোল্লা ধর্মোপদেশ দিচ্ছে!.. যদি পিওতরের উপদেশ মেনে চলতে হয় তবে স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে কম করেও একশ' বছর। তরবারির এক আঘাতেই পুরনো জগৎটার ধ্বংস করে দেওয়া যায়। বেশী কিছু লাগে না। কেন যে পিওতর কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের কথা বলে, গ্রামে পার্টি-প্রচারের কথা বলে? কুসংস্কার আর অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন গ্রামগুলির প্রতি গুরবানের কোন আগ্রহ নেই। সে অভিজ্ঞ তৈলশ্রমিক, বাকুর অধিবাসী। সে শ্রমিক — তার মানে সে যোদ্ধা।

অবহেলাভরে একটা 'হুঃ' আওয়াজ করে গুরবান পিওতরকে থামাল:

'এই অশিক্ষিত লোকগুলো যারা এক কাজ থেকে আর এক কাজে ছুটে বেড়ায় যেখানে বেশী মাইনে পাবে, তাদের মাথায় তুমি কিছুতেই ঢোকাতে পারবে না যে প্রকৃত স্বাধীনতা আসলে কি। এদের ওপর মোটেই আশা করা যায় না।'

তাকে কথা শেষ করতে দেওয়া হল না, চারদিক থেকে তার ওপর ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ আর মন্তব্য বর্ষিত হল। অহঙ্কার দেখ! এই তো সেদিন ও নিজেই গেটের কাছে ভীড় করে ধাক্কাধাক্কি করছিল আর ফোরম্যানকে অনুরোধ করছিল যেন ওকে কোনো না কোনো কাজে অন্তত দশ কোপেক মাইনেয় হলেও নেয়। আর যেই কাজ পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে দিন-মজুরদের থেকে পৃথক করে ভাবছে।

খালি টেরাচোখো করিম গুরবানকে সমর্থন করার একটু চেষ্টা করছিল কিন্তু তার ওপরও এমন আক্রমণ বর্ষিত হল যে সেও সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল।

আলিও এই তর্কে অংশগ্রহণ করছিল, কিন্তু গুরবানের কথা শুনতে শুনতে তার অধৈর্যটাকে বুঝতে পারছিল, নিজের কথা তার মনে পড়ল। সেও এইরকমই ছিল আত্মসংযমহীন, উত্তেজিত, অসাবধানী, জলের গতি না বুঝেই ঝাঁপ দিতে চাইত। আনন্দের কথা এই যে, সাশা আর পিওতর তাকে অনেক সাহায্য করেছে জানতে বিপ্লবের আসল পথ কোথায়, তারাই তাকে শিখিয়েছে পার্টির কাজ যত ধীর, যত শ্রমসাধ্যই হোক না কেন, আপাতদৃষ্টিতে তাকে যত ছোটই মনে হোক না কেন তাকে অবহেলা না করতে, কারণ তার মধ্যেই রয়েছে বিজয়ের বীজ।

পিওতর সব সময়ই খুব সংক্ষেপে নিজের বক্তব্য বলত, কিন্তু এবারে

তাকে অন্যান্যবারের চেয়ে বেশীক্ষণ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হল গুপ্তকর্মীদের এর পরের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে। অবশেষে যখন সে স্থির নিশ্চিত হল যে, শ্রমিকরা কেউই গুরবান আর করিমকে সমর্থন করছে না, এবং তারা সবাই হঠাৎ জ্বলে উঠা অভ্যুত্থানের অসম্ভাবনা ও অপ্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছে, তখন সে ঘোষণা করল মীটিং শেষ।

গুদরেত হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে একজন একজন করে কমরেডকে ঘর থেকে বেরোতে দিচ্ছিল। ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে এ'টেল নোংরার মধ্য দিয়ে সেও ঘন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তখনও কোথাও কোথাও শিসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু মিনিটখানেক পরেই সব শান্ত হয়ে গেল, কেবল বোরিং মেশিনগুলির ঠক্‌ঠক্, ঝনঝন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল আর ক্রুদ্ধ সমুদ্রের বাতাস ফাঁকা মাঠের ওপর গর্জন করে বেড়াচ্ছিল।

পিওতর ও আলি রাস্তার মোড় পর্যন্ত গিয়ে কোন কথা না বলে করমর্দন করে দু'জন দুদিকে চলে গেল।

ফোরম্যান গিয়াসের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে: মাঝে-মধ্যে সে আসত টাওয়ারগুলিতে, শান্ত, আত্মমগ্নভাব, শ্রমিকদের কাজের খুঁত ধরত না, গজগজ, গালাগালি করত না, এমন একটা বিষণ্ণভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াত যেন তার দুঃখের সীমা-পরিসীমা নেই।

বেশীর ভাগ তৈলশ্রমিকই আলির সঙ্গে ফোরম্যানের সংঘর্ষের ব্যাপারটা জানত না, আর যারা শুনেছিল এ সম্পর্কে তারা চুপচাপ থাকত, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করত, আলির প্রশংসা করত যেন সে প্রাচীন লোককথার নায়ক: 'একেই বলে সাহস।'

ফোরম্যান দিনে দিনে আরো মনমরা হয়ে পড়ল, প্রতিশোধ নেবার জ্বলন্ত আকাঙ্খা তার মধ্যে এখনও টগ্‌বগ্ করে ফুটছে, কারণ আলি অদৃশ্য, যেন আকাশে মিলিয়ে গেছে বা মাটির মধ্যে ঢুকে গেছে। গিয়াসসাহেব শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করেছে কোথায় সেই ছেলেটি, কিন্তু তারা অস্বীকার করেছে, হতবুদ্ধি হয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়েছে।

যতই তাকে লুকিয়ে, ঢেকে রাখুক না কেন, গিয়াসসাহেব ওকে ধরবেই আর পুরোপুরি তার ধার শোধ করবেই। ভাবতেই পারা যায় না — সাধারণ শ্রমিক ফোরম্যানের গায়ে হাত তোলে!.. একথা কখনও কেউ শুনছে? আলির মত অনেক অনেক ছেলেকে গিয়াসসাহেব পোষ মানিয়েছে,

অনেককে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এই বেহায়াটার কপালেও ঠিক তাই ঘটবে — ওর মরাদেহটা ফোরম্যান সারা খনিঅঞ্চলে টেনে টেনে ঘুরবে যাতে লোকেরা সবাই দেখে ভয়ে নুয়ে পড়ে কাঁপতে থাকবে।

বিদ্বেষে তার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল, যেন একটা বিড়াল তার হৃদয়ে ধারাল নখ দিয়ে আঁচড় কাটছে, কিন্তু আলির আর কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না।

ফোরম্যান একান্তই নিশ্চিত ছিল যে, আলির মত এই ধরণের অধঃপতিত লোকদের সাচ্চা মুসলমান বলে কিছুতেই অভিহিত করা যায় না, এরা আসলে মানুষই নয়, এদের মাটিতে ফেলে, পা দিয়ে মাড়িয়ে, দলে মেরে ফেললে আল্লাহ্‌র মর্জি পূর্ণ করা হয়।

নাস্তিক ছোঁড়াগুলো যদি এমনি অহংকার নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর উপরওয়ালাদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করে তো এটা তাদের অজ্ঞানতারই পরিচায়ক। কেনই বা এরা শান্তশিষ্টভাবে থাকতে পারে না? নিজেরাই নিজেদের মুখ থেকে, নিজেদের শিশুদের মুখ থেকে রুটির শেষ টুকরোটাও কেড়ে নেয়। এই নোংরা, টাওয়ারের সঙ্গে অদৃশ্যশেকলে বাঁধা লোকগুলি কী যে চায়? হঠাৎ গিয়াসসাহেবের মনে পড়ল, হরতালের দিনগুলিতে শ্রমিকদের সভায় পিওতর স্বাধীনতার কথা, সুখী জীবনের কথা বলছিল। পাগলের দল! হরতাল, অভ্যুত্থান আর ব্যারিকেড দিয়ে জীবনের গতি পরিবর্তন করতে চাচ্ছে। বোকার দল!.. চোদ্দ ঘণ্টার ডিউটি তোমাদের যথেষ্ট নয়, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য তোমাদের মেশিনে আটকে রাখা উচিত, তাহলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

গিয়াস শ্রমিকদের ঘৃণা করত, কিন্তু তাহলেও সোজাসুজি তাদের চোখের দিকে চাইতে পারত না, ভয়ে বুক হিম হয়ে যেত। তার মনে হত যেন তাদের ক্রুদ্ধ অভিশাপবর্ষণকারী দৃষ্টি নিঃশব্দে চীৎকার করে বলছে: 'বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতক!'

বোরিং মেশিনের দিকে তাকিয়ে ফোরম্যান বুড়ো গুলামের মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখতে পেল, কাছে এগিয়ে এসে রাগে তার সাদা ধপধপে গোঁফজোড়া ধরে টান মারল:

'বুড়ো থুত্থুরে হয়েছিস, এবারে বিশ্রাম নেওয়া দরকার... আর নেকড়ের মত দাঁতগুলো দেখ না, কেমন শক্ত এখনো, নড়ে নি, পড়ে নি।'

বুড়ো গুলাম তিক্ত হাসি হাসল:

'দাঁত আমাদের দরকার সাহেব, বাসী শক্ত রুটি চিবোবার জন্য। দাঁত ছাড়া শ্রমিকের জীবন রাখাই অসম্ভব।'

ফোরম্যান এই কথাগুলির আসল অর্থ বুঝতে পারল এবং ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল যেন কেউ কাঁটা দিয়ে তার হৃদয় আঁচড়ে কাটছে।

'হ্যাঁ, গুলামচাচা তুই বুড়ো হয়েছিস, আরাম করা শুয়ে থাকা দরকার, তোর জায়গায় আমরা গ্রামের কোন সুস্থ ছেলেকে কাজে নেব, তাহলে সব ঠিক চলবে, বাড়ী যা, বিশ্রাম কর্‌!'

দুঃখ আর সহানুভূতির সঙ্গে যেন মাথা নাড়ল, কিন্তু বিবর্ণ হয়ে যাওয়া গুলাম আর হতবুদ্ধি শ্রমিকেরা ফোরম্যানের কথার এই অর্থ বুঝল যে, 'বাড়ী গিয়ে খিদের জ্বালায় মর্‌...'

পরের মেশিনে গিয়ে গুরবানকে দেখতে পেয়ে তাকে কাছে ডাকল গিয়াসসাহেব:

'এই, এদিকে আয় তো!'

গুরবান সাবধানে বড় রেঞ্চটা মাটিতে রেখে এগিয়ে এল: 'বলুন, সাহেব।'

ফোরম্যান অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তার চোখের দিকে তাকাল, মুখে রাগের ভঙ্গী করল, ছেলেটিকে প্রথমেই বিস্মিত করে আর ভয় পাইয়ে দিতে চাইল।

'গুরবান সত্যি বল্‌, একটি পবিত্র সত্য। জানি যে তুই গুপ্তচক্রের মধ্যে আছিস, মালিকও জানেন, পুলিস জানে। তোরা সবাই ধ্বংস হবি। গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেব। যদি বাঁচতে চাস তো বলে ফেল্‌ পিওতর আর আলি কোথায়?'

গুরবানও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল:

'সাহেব, আমি মুসলমান না কাফের বলে আপনি মনে করেন?'

সঙ্গে সঙ্গেই ফোরম্যান গলায় আদরের সুর এনে বলল: 'নিশ্চয়ই শীগগিরই তুই সাচ্চা মুসলমান হয়ে উঠবি।'

'তোমার মাথার দিব্যি করছি,' গুরবান ধূর্ত বাঁকা হাসি হেসে যেন ঠাট্টা করে হাতের মুঠি দিয়ে গিয়াসসাহেবের বুকে আঘাত করল, 'তোমার আত্মার দিব্যি, ধর্ম আর বিশ্বাসের দিব্যি দিয়ে বলছি কিছু জানি না, কিছু দেখি নি।'

বড় ভারী মুঠির এই আঘাতে ফোরম্যান দু'পা পিছিয়ে গেল।

'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? আমি তোকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছি।'

গুরবান আবার তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে এমন আঘাত করল যে ফোরম্যান একেবারে নুয়ে পড়ল, 'তোমার মূল্যবান জীবনের দিব্যি দিয়ে বলছি কিছু জানি না।'

ফোরম্যান প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিয়েও মৃদু হেসে হিসহিসিয়ে বলল:

'তোরা প্রত্যেকে সমান ইতর, জীবন্ত অবস্থায় তোদের নরকে ছুঁড়ে ফেললেও রাগ যায় না!'

তাড়াহুড়ো করে হোঁচট খেতে খেতে সে দূরে সরে গেল আর গুরবান হাস্যউদ্রেককারী জোর গলায় তার পেছনে চীৎকার করে বলল:

'সাহেব, একটু অপেক্ষা কর! কোথায় ছুটছ? একটু কথা বলার ছিল!'

পেছনে না তাকিয়ে ফোরম্যান কাছের টাওয়ারটার পেছনে গা-ঢাকা দিল।

আলি বিবি-আইবেত তৈলখনিতে সাধারণ মজুরের কাজ নিয়েছে — ঠেলাগাড়ীতে করে জঞ্জাল, কাঠের গুঁড়া, ইঁট বয়ে নিয়ে যায়। সাবুনচি থেকে এখানে কাজ করা আরো কষ্টকর, শ্রমিকরা রুটির সন্ধানে বাকুতে এসে সবথেকে কষ্টকর কাজে খুব নীচু মাইনেতেও রাজী হত। এই সামান্য মাইনে থেকেও তারা কৃপণভাবে অর্থ জমাত। গজগজ বা বিরক্তি বোধ করত না তারা এই ব্যবস্থায়, যেহেতু পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই এই প্রথা চলে আসছে — একদল ধনী, অপরদল দরিদ্র, একদল ঠেলা নিয়ে চলেছে, অন্যদল অর্থ নিয়ে। 'আল্লাহ্‌র মর্জি' অনেকে ভাবত। এই নতুন ধনীশ্রেনী তেলের রাজাদের আবির্ভাবকে তারা ভাগ্যের গোপন, দুর্বোধ্য খেলা বলেই ভাবত।

ধূমপানের বিরতির সময়গুলিতে আর কাজের পরে ব্যারাকে আলি তাদের সঙ্গে আলোচনা করত, তাদের শোনাত পৃথিবীর সম্পদে আর সুখে প্রতিটি মানুষের অবিসংবাদিত অধিকারের কথা, যে সম্পদ সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র শ্রমিক আর কৃষকের শ্রমের দ্বারাই। তার সঙ্গে কেউ তর্ক করত না, একগুঁয়েভাবে চুপ করে থাকত, হতবুদ্ধি হয়ে কাঁধ ঝাঁকাত: ভাগ্যের চাকার গতি কি কখনও ফেরান যায়?

আলি ভেঙে পড়ত না, এই তো সেদিনও নিজেই ছিল এইরকমই অত্যাচারিত, দলিত, অশিক্ষিত।

কিন্তু তাহলেও মাইনে পাওয়ার পরে দেখা গেল শ্রমিকদের মধ্যে কেউ কেউ নির্বাসিত ও বন্দী বিপ্লবীদের জন্য সাহায্য ভাণ্ডারে সম্ভবমত সাহায্য দিতে রাজী হয়েছে। শুরু হিসাবে এটাই বা মন্দ কি: তার মানে আলির কথা বিশ্বাস করেছে, তারা মন দিয়ে শুনেছে হৃদয়ের থেকে বেরিয়ে আসা তার উত্তপ্ত কথাগুলি।

তাদের মধ্যে অনেক তার্কিক লোকও ছিল যারা আলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করত: পৃথিবীতে ধনীও থাকবে না দরিদ্রও থাকবে না এটা কি সম্ভব নাকি? যদি তা সত্যিই সম্ভব হয়, তো তার থেকে ভাল আর কিছু হতেই পারে না, তবুও এরকম একটা অসম্ভব স্বপ্নের সত্যিতে পরিণত হওয়া বিশ্বাস করাও কঠিন।

আলি উত্তেজিত হত, তর্ক করত, বোঝাতে চেষ্টা করত, সে নিজেই নিশ্চিতভাবে অনুভব করত যে এইসব কথোপকথনের মধ্য দিয়েই সে আরও বড় হয়ে উঠছে। তার আরো আনন্দের কারণ হল এই যে, যারা তার সঙ্গে একমত হত না, তারাও তাকে প্রায়ই বলত, 'তোমার মনটা ভারী ভাল গো, ছেলে, তুমি লোকদের ভালবাস।'

সাবুনচির পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিন্ন হয় নি, গোপনে তাদের সঙ্গে দেখা করে খোঁজখবর নিয়ে আসত। যখন সে জানতে পারল যে ক্রুদ্ধ গিয়াসসাহেব শেষ পর্যন্ত গুরবানকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে আর সে বুড়ী মা, স্ত্রী আর ছোট্ট তিনটি বাচ্চা নিয়ে অনাহারে আছে, তক্ষুণি আলি তার সাহায্যের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে শুরু করল; যদিও শ্রমিকরা মাথা চুলকে দেব কি দেব না ভাবছিল তবুও কয়েক রুবল সংগ্রহীত হল এবং আলি তক্ষুণি সেটা নিয়ে বন্ধুকে দিতে চলল।

তৈলখনিগুলিতে পরিস্থিতি ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছিল: কেউ আর এখন শিশুর মত অত্যাচার আর ব্যর্থতায় কাঁদে না, এখন তারা একে অপরকে কেবল সহানুভূতিই জানায় না সাহায্যও করে, তাদের মধ্যে ঐক্য আর সুনিশ্চয়তার অনুভূতি আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। আলি দেখেছে এই তৈলখনিগুলি যেন ফুটছে, যেন শ্রমিকেরা যে কোন মুহূর্তে লড়াইয়ে নিজেদের হৃদয় বোমার মত ছুঁড়ে দিতে তৈরী!.. গুপ্তচক্রের কর্মীরা অনেক কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করে পিটার্সবুর্গ আর মস্কোর বলশেভিকদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগ স্থাপনে সফল হয়েছে। না, শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় নি, বিপ্লবের ভাগ্য ছিল খুব শক্ত হাতে। আর

বৈপ্লবিক সংগ্রামকে একেবারে চেপে দেওয়া যায় না, যদি প্রতিদিন হাজার হাজার মেহনতী মানুষ এসে পার্টিতে যোগ দেয় আর সংগ্রামীদের সঙ্গে এসে কাঁধে কাঁধ মেলায়।

যেন হাজার হাজার হৃদয় থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা আগুনের ধারা পাহাড়ের চূড়া থেকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে উপত্যকায় আর যে বাঁধ কালও ছিল অটল, তাকে ধ্বংস করে উড়িয়ে দেবে — এই হল আলির দেখা ভয়ংকর দণ্ডদানকারী বিপ্লবের চিত্র।

আলি তার বন্ধু-সহযোগীদের থেকে অনেক বেশী দূরদর্শী অনেকের চোখেই জীবনের দিগন্ত তখনও অন্ধকার ছিল, কিন্তু আলি আশা আর আলোকিত বিশ্বাস নিয়ে দেখেছে সবে জেগে ওঠা সূর্যের প্রথম রশ্মিতে পূর্বদিক কেমন লালে লাল হয়ে যায়।

এই সব মুহূর্তগুলিতে সে কোন বিপদেরই ভয় করত না — নির্বাসন, হাজত, মৃত্যু কিছুই না; যদি সমস্ত মানবসমাজ বিপ্লবের লাল দিগন্ত দেখতে পায় সেই জন্য সে কোন দ্বিধা না করেই এমনকি নিশ্চিত মৃত্যুর পথেও এগিয়ে যেতে পারত।

একদিন বালাখানি গ্রামে তার দেখা হল গুরবান, গুলাম আর করিমের সঙ্গে, ওদের কাছে আলি জানতে পারল যে পিওতর কোন জরুরী কাজে তৃবিলিসি চলে গেছে। বুড়ো গুলামকেও কাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে: এরকম বুড়ো শ্রমিক রাখা মালিকের পক্ষে বিশেষ লাভজনক নয়। আলিকে নিজের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে গুলাম কেঁদে ফেলেছিল। বাচ্চাগুলোর কি হবে ? কি করে ওদের খাওয়াব ?

আলি বুড়োকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিল:

'কাজ কোনো একটা খুঁজে নেওয়া যাবে, আর আপাততঃ আমরা কিছু অর্থ, খাদ্য দিয়ে সাহায্য করব। শ্রমিকের ভাণ্ডার — এ বড় অদ্ভুত জিনিস — একই সঙ্গে শূন্য আর অফুরন্ত ! চোখের জলে কিছু হবে না, লড়াইয়ে নামতে হবে !'

গুরবানের প্রকৃতি খুব কঠোর — ওর থেকে কান্নাকাটি আশা করা যায় না। এখন ওকে মনে হচ্ছে যেন খাঁচায় বন্দী সিংহ, লড়াইয়ে নামার জন্য তৈরী, যেন ওর শিরায় শিরায় রক্ত বইছে না, বইছে গলিত ক্রোধ।

'গুলামচাচা, আমি ওকে এমনি ছেড়ে দেব না।' বুড়োকে সে আশ্বাস দিত। 'গিয়াসসাহেবের কাছে আমি এর শোধ নেব। আমার কথা যদি শুনত

আগে, তবে এই ক্ষেপা নেকড়েগুলোকে সব ক'টাকে কবেই কেটে ফেলা যেত। চাচা, তোমার আমার দুঃখ একই, কিন্তু আমরা বাঁচতে চাই বিভিন্নভাবে। এবারে আমি আর কারুর কথা শুনব না, যা ভাল মনে করব তাই করব। আজকেই আমি গিয়াসের সঙ্গে হিসাব মিটাব।'

গুলামচাচা একরাশি সাদাচুলে ভরা ভারী মাথাটা নাড়িয়ে বলল:

'তুমি, বাবা, আসল জিনিসটা দেখছ না। লেনিনের আদর্শ অনুযায়ী ভাবছ না। ওদের কেটে ফেললে কি আমি সঙ্গে সঙ্গে কাজ পাব, না আমার বাচ্চারা পেট ভরে খেতে পাবে?'

আলি বৃদ্ধকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করল:

'আমি তোমার সঙ্গে পুরোপুরি একমত। গিয়াসসাহেব ভাড়া করা চাকর, মালিকের উঠোনে বসে হাড়-চিবুনো কুকুর। ওকে মারলে একেবারে কিছুই পরিবর্তন হবে না। আর একটা কুকুর রাখবে আরও ভয়ঙ্কর, আরও রাগী। মালিকের হাতে যতক্ষণ হাড় থাকবে, কুকুর ঠিকই ছুটে আসবে। আমাদের কাজ বিরাট বড়, কিন্তু সম্ভবপর — মালিকদের কাছ থেকে শিল্প, কারখানা, অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া, মালিক ছাড়া তাদের চেনে-বাঁধা কুকুরগুলোও মরে যাবে, আর গিয়াসসাহেবের মত বদমাশ লোকগুলোও হাওয়া হয়ে যাবে।'

আলির কথা পুরো না শুনেই ঘৃণার সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে গুরবান বলল, 'তবে অপেক্ষা করতে হবে অনেক দিন,' তারপর রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা ধড়াম করে বন্ধ করে দিল।

কী অদ্ভুত চরিত্র! কোনো সময়ে সে ধীর, স্থির, ঠাট্টা আর চিমটি-কাটা কথা দিয়ে শত্রুকে তাতিয়ে সাদা করে তোলে, আবার একটু পরে সে হয়ত হয়ে উঠবে অসহ্য, যুক্তি বুদ্ধি কোনো বিচার করে দেখবে না, জয় অথবা হীনতা যে কোনটার জন্যই প্রস্তুত।

উদ্বিগ্ন আলি তখুনি করিমকে নির্দেশ দিল যেন উত্তেজিত গুরবানের ওপর নজর রাখে, প্রয়োজন হলে ওকে যেন বোঝায়, বাধা দেয়।

'শীগগীর যা, চোখ রাখ ওর ওপর, ঐ প্রতিশোধের চিন্তায় ও আমাদের সবকিছু নষ্ট করে দেবে। আর এমনি অবস্থা যে পিওতরেরও দেখা নেই!..'

যখন করিম নাকের ডগা পর্যন্ত টুপিটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, আলি বুড়ো গুলামের সঙ্গে আগামী মিটিংয়ের ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগল। স্থির হল, আবার গুপ্তচক্রের কর্মীদের মিটিং হবে পোড়ো মাঠে,

সুড়ঙ্গঘরটিতে, যার নামটি বড় অদ্ভুত "ডাকঘরের সামনে"। আলি বলল যদি বুড়ো এখন তৈলখনিতে ঘুরে বেড়ায়, শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে, তাতে পুলিস, চর বা ওপরওয়ালা কারুরই নজরে পড়বে না: যেন কাজের খোঁজে ঘুরছে...

'আমার জন্য তুই চিন্তা করিস না,' বলল গুলাম, 'চিরজীবনই খালি কাঁদব নাকি। মিটিং এখন একটা অবশ্যই করা দরকার — মাইনে যত কম, জীবন যত নীচু মানের, ততই ওদের সাহস বাড়ে।.. এখন একটা হরতাল ডাকারও ঝুঁকি নেওয়া যায়: আমরা সবার সমর্থন পাব।'

'তোমার কথাটা ঠিকই,' অনেকক্ষণ চিন্তা করে আলি বলল, 'কিন্তু পিওতর ত্বিলিসি থেকে না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

'নিশ্চয়ই। ওর অপেক্ষা করা উচিত।'

'বোধ হয়, এখন এমন অবস্থা যে মালিকেরা কথা না বলে মেনে নেবে,' বলে চলল আলি যেন নিজের মনে মনে চিন্তা করে।

হঠাৎ জানলার বাইরে অন্ধকার গলিতে বন্দুকের গুলির ফাঁপা আওয়াজ পাওয়া গেল। আলি আর বুড়ো চমকে দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল। আলি হালকাপায়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিল কিন্তু গুলাম তাকে থামিয়ে দিল: 'দাঁড়া, আগে জানা দরকার, কি হয়েছে।'

কয়েক মিনিট পরে করিম আর একজন অজানা শ্রমিক ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত গুরবানকে নিয়ে ঢুকল।

'আলি পালা! পুলিশ! শীগগির!' হাঁফিয়ে বলল করিম।

'গুলি করল কে?'

'পুলিশ। গুরবান গিয়াসসাহেবকে ছুরি মেরেছে, গলিতে ছুটে গিয়েছিল অন্ধকারে গা-ঢাকা দেবার আশায়, কিন্তু গার্ড ততক্ষণে গুলি করে দিয়েছে।

'হায়! কথা শুনল না!' আলি গোঙানির সঙ্গে বলল।

এই সময় দরজায় ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হল, কর্কশ গলার আওয়াজ, বুটজুতোর আওয়াজ শোনা গেল: গুরবানকে নিন্দা করা বা সহানুভূতি জানানোর আর সময় নেই।

যখন খিল ভেঙে দরজা হাট হয়ে খুলে গেল আর ঠেলাঠেলি করে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল পুলিশের দল, আলি তখন পালিয়েছে, খোলা জানলার পরদাটা কেবল একটু একটু দুলছিল যেন হাওয়ায় কাঁপছে।

পুলিশরা থানায় নিয়ে গেল বুড়ো গুলাম আর করিমকে আর সেই সঙ্গে সেই অজানা পথচারীকেও, যার একমাত্র দোষ হল আহত গুরবানের দেহটা দয়াবশতঃ ব্যারাকের ভেতরে আনতে সাহায্য করা। ব্যারাকের আশপাশের ঘরগুলিতেও একটু চোখ চালিয়ে তারা আরও কয়েকজনকেও সঙ্গে নিয়ে চলল: এদেরকেও একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার, বড্ড বাড় হয়েছে...

'পিওতর ত্বিলিসিতে, আলি মুক্ত,' ভাবল গুলাম আর সগর্বে সাদাচুলেভরা মাথাটা পেছনে ঠেলে দিয়ে শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে বিজয়ী পুলিশবাহিনীর পিছনে পিছনে চলল।

তাগি-বেকের মেজাজ ভাল নেই, অনিদ্রায় ভুগছে। তার কড়া নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিদিন পাঁচ-ছ'জনকে, কখনও কখনও বা জনা-দশেক একগুঁয়ে শ্রমিককে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের জায়গায় সঙ্গে সঙ্গে লোক নেওয়া হয় গেটের কাছে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামের ছেলেদের মধ্য থেকে। মনে হয় যেন এদের মত বিনয়ী নম্র ছেলে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাইনের দিনগুলিতে এরা চোখে জল নিয়ে মাটিতে হাঁটু ঠেকিয়ে ফোরম্যানদের, ম্যানেজারদের ধন্যবাদ জানাত, প্রতিটি কোপেক ধরতে হাত কাঁপত আর তারপর, দেখ, কয়েক সপ্তাহ পরে সেই ছোঁয়াচে অবাধ্যতা রোগ তাদেরও ধরেছে। কি যে লাভ কে জানে? কাজে এসেছিলি খালি পেট নিয়ে, যে রুটি তোদের দয়া করে দিচ্ছে তাগি-বেক তা আর মুখে রুচছে না, যেন গলা কেটে যাচ্ছে, যেন ক্ষীণদেহকে আরও দুর্বল করে দিচ্ছে। নিজেরাই শান্তিতে থাকতে চায় না, অকৃতজ্ঞ সব!..

মালিক তার বিশ্বস্ত সহকারীদের মতই কিছুতেই এ কথা বুঝতে পারত না। ওরে বোকার দল। আল্লাহ্‌র এই দুনিয়াতে এতকাল ধরে যে আইন চলে আসছে তোরা তাকে ভাঙার স্বপ্ন দেখছিস! আর এই ভিখারী, দারিদ্র্যের চাপে বন্য হয়ে যাওয়া মানুষগুলো কোন অধিকারেই বা সাচ্চা মুসলমান তাগি-বেকের সুন্দর-করে-গুছিয়ে-নেওয়া সম্পত্তিতে হাত বসাতে চায়? কোরানে, শরীয়তে কোথাও এই অধিকারের কথা কিছু লেখা নেই।

যাক্ অধিকারের কথা, এদিকে হাঙ্গামাকারীরা আবার জল ঘোলা করছে, হরতালের উস্কানি দিচ্ছে এই বলে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ আর মাইনে সামান্যই।

তাগি-বেকের বিনিদ্র রাত্রিগুলি কাটছিল এই সব যন্ত্রণাদায়ক দুশ্চিন্তায়। অবশেষে সে এই সিদ্ধান্তে এল যে, চাবুকের ব্যবহার করা উচিত একেবারে চরম অবস্থায়, আরো কোনো ধূর্ত উপায়ে শ্রমিকদের হাত করতে হবে। দরকার সজাগ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দালাল আর চরের। শিকারীরা শিকারের জন্য সঙ্গে নিয়ে যায় স্তেপের সোনালী ঈগল, তারা বলে 'পাখি দিয়ে পাখি ধরা'। তার মানে, শ্রমিকদের মধ্য থেকেই খুঁজে নিতে হবে বিশ্বস্ত কয়েকজনকে যারা তাগি-বেকের জন্য জীবন দিতে পারে।

ভেবে-চিন্তে সে এটাই স্থির করল।

যখন তার কাছে গিয়াসসাহেব এল, শীর্ণ মুখে বিষণ্ণভাব, ঘোড়ার মত লম্বা মুখটা শুকিয়ে গেছে, তাগি-বেক তাকে অভ্যর্থনা জানাল সৌজন্য আর আনন্দের ভাব নিয়ে।

'আশা করি, তোমার ক্ষত সেরে আসছে, তুমিও পুরোপুরি সেরে ওঠার পথে।'

'ওঃ মালিক, তুমি যদি বুঝতে আমি কি যন্ত্রণা ভোগ করছি,' যন্ত্রণার ভাবে মুখ কুঁচকে ঘ্যান-ঘ্যানে সুরে বলল ফোরম্যান। 'রক্তঝরানো ক্ষত আমাকে কষ্ট দেয় নি, দিচ্ছে এইখানের ক্ষত,' বলে সে নিজের বুকের ওপর হাত রাখল, 'এখানে জ্বলে যাচ্ছে, অন্য ক্ষত এখানে ব্যথায় টনটন করছে। মনে হচ্ছে এই কষ্টই আমাকে কবরে পেঁাছে দেবে। এই বদ্‌মাশগুলো যে কী চায়? কেন যে ওরা আমাদের শরীয়তের আইন অনুযায়ী সৎভাবে রোজগার করা রুটি শান্তিতে খেতে দেবে না?' দুলে দুলে বিলাপ করে বলল গিয়াসসাহেব, 'কালকের ছোঁড়াগুলো, রাস্তার বদ্‌মাশ আর কলমঠেলা লোকগুলো শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিচ্ছে, ওদের সত্যের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! এই কষ্টেই আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে! আল্লাহ্‌র কসম, এই জঘন্য বদ্‌মাশ বলশেভিকগুলোর টুঁটি দাঁতে ছিঁড়ব! যদি রক্তমাখা চোখের জল নিয়েও পায়ে ধরে বাঁচবার জন্য তাহলেও ছেড়ে দেব না!'

তাগি-বেক বহুবছরের অভিজ্ঞতার ফলে জানত: কুকুরের রাগ যত বাড়ে, তার মালিক ততই শান্তিতে ঘুমোতে পারে। তাই গিয়াসসাহেবকে প্রশংসা করল পবিত্র শরীয়তের আইনের প্রতি তার আনুগত্যের জন্য এবং সেই সঙ্গেই চাইল ওকে একটু উত্তেজিত করে তুলতে।

'তোর কথা ঠিক গিয়াস, প্রাচুর্যের মধ্যে থাকতে গেলে নির্মম কঠোর

হতে হবে ইস্পাতের ফলার মত, গ্রানাইট পাহাড়ের মত অনড় আর পাথরের মত মৌন হতে হবে। শক্তিমান লোকের শক্তিমান ইচ্ছাকে মেনে নিতেই হয়, তার কাছে মাথা নোয়াতেই হয়!.. এই ভাবেই জগৎটা তৈরী, তুই আমি এটাকে এভাবে তৈরী করি নি, তোর আমার সঙ্গে এর শেষও হবে না। আমি এই প্রথাকে পুরোপুরি সমর্থন করছি না, কিন্তু জানবি ব্যাপারটা এমন যে যদি অন্যের মাথায় পা দিয়ে না চলিস্ তো তুই নিজেই বাঁচতে পারবি না। যেই দয়া না দেখিয়ে লোকেদের টুকরো করতে, গুঁড়ো করতে আরম্ভ করবি অমনি সমাজের চোখে তোর দাম বেড়ে যাব।'

মালিক একটুখানি পায়চারি করল, তারপর ক্লান্তভাবে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল থলথলে দেহটা লম্বা করে দিয়ে।

'তোর মনে আছে, আমি অনেকবার তোকে বলেছি গুরবানকে সরাবার সময় হয়েছে?' গিয়াসসাহেবকে সে মনে করিয়ে দিল, 'তুই রাজী হস্ নি, ভয় পাচ্ছিলি ওর বন্ধুদের চটিয়ে দিতে, আর হলটা কি? ওই সেই হিতৈষীর গায়ে হাত তুলল! না, এই শ্রমিকগুলি ধূর্ত, অবিশ্বাসী, প্রতিহিংসাপরায়ণ। পায়ের জুতো দিয়ে ওদের লেজ চেপে ধর, সঙ্গে সঙ্গে ওরা তোর হাত চাটবে, দয়া পাবার জন্য মিউমিউ করবে। আর যেই ছাড়া পাবে — তোকেই হুল ফোটাবে। গিয়াস, তুই তো আমাকে বহুদিন জানিস। আমি কি ওদের কম উপকার করেছি, এই তৈলখনি খুলেছিই তো বিশেষ করে সেইজন্যই যাতে ওরা পুত্রপরিবার নিয়ে অনাহারে না মরে। আর এখন প্রতিদিন ওরা আমার অপকার করছে, এই দয়ালুহৃদয় আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে!'

ফোরম্যান মালিকের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হল, উত্তেজিতভাবে বলল সে:

'এবার আমার চাবুক ওদের পিঠের ওপর চলবে। বুঝুক আমি কেমন লোক। মূল্য দাও নি? নাও তোমার পাওনা!'

'গিয়াস, তোর ওপর আমি কতটা নির্ভর করি তা বলাই বাহুল্য,' ক্লান্তস্বরে বলে চলল তাগি-বেক, 'আল্লাহ্‌র কসম, এই ব্যবসা তো আসলে সবই তোর, আমার নয়, ইচ্ছে হয় সব জ্বালিয়ে দে, ইচ্ছে হয় — বাঁচিয়ে রাখ! তবে একে আগলে রাখাই বোধ হয় ভাল, তোরও সুখের জীবন আর আমারও কিছু থাকবে। কিন্তু মনে রাখবি: ক্ষেতে যেন একটাও আগাছা থাকে না, যে সব লোকেরা শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়াচ্ছে, তাদের

শেষ করা চাই, বিনা দ্বিধায়। বুঝতে পারছিস, কাদের কথা বলছি: পিওতর আর আলি। পুলিসকে ঐ অভিশপ্ত বিপ্লবীগুলোকে ধরতে সাহায্য করতে হবে। আর ঐ কাফেরগুলোকে ধরার জন্য চাই শ্রমিকদের মধ্যে... হুঁম... নিজের চোখ, নিজের কান, বুঝলি ?'

'নিশ্চিন্ত হও।' ফোরম্যান হাত নাড়িয়ে অবজ্ঞার ভঙ্গী করে বলল কিন্তু তখনই কেঁপে বেঁকে উঠল ক্ষতস্থানের ব্যথায়। 'আলি আর পিওতরই প্রধান প্ররোচক, ওরাই আমাকে মারার জন্য লোক পাঠিয়েছে। ওদের ওপর আমি আমার কষ্টের শোধ তুলবই।'

'তোর উদ্দেশ্যের তারিফ করতে হয় গিয়াস, তুই সত্যিই বাহাদুর, সৎ, নির্ভীক যোদ্ধা, তোর নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে,' অলসভাবে গুণগুণ করে বলল তাগি-বেক আর এমনভাবে পা ছড়াল যে খাটের স্প্রিংগুলি আওয়াজ করে উঠল।

'তোমার মাহাত্ম্যকে ধন্যবাদ মালিক,' আবেগে কেঁপে বলল ফোরম্যান, 'তোমার দয়ার কথা কখনও ভুলব না।'

ভৃত্য ট্রেতে করে সুস্বাদু খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। ভাজা মাংসের সুগন্ধ মালিক আর সহকারী উভয়েরই নাকে সুড়সুড়ি দিল আর যখন মদের কলসের আবির্ভাব হল তখন তাগি-বেক আর গিয়াসের একেবারেই নেশার ঘোর লেগে গেল।

'খা-খা, লজ্জা করিস না।'

'সম্মানিত মালিকের স্বাস্থ্যপান করছি। ভাগ্য তোমার প্রতি সদয় হোক।'

ফোরম্যান এত মাতাল হয়ে গেল যে, সমানে মালিকের হাত চাটছিল, চুম্বন করার চেষ্টা করছিল, যদিও খুঁতখুঁতে স্বভাবের তাগি-বেকের এতে বিরক্ত লাগছিল আর সে সরে আসছিল অনুগত চাকরের গায়ে পড়া থেকে তবুও সে তাকে তাড়িয়ে দিল না, থাক্, কুকুরের মত কাছে কাছে ঘুরুক, লেজ নাড়ুক, পায়ে গা ঘষুক।

'প্রিয় উস্তাদ,' প্রতি অক্ষরে আটকে আটকে বলল গিয়াস নিজের বুকে হাতের মুঠি দিয়ে আঘাত করে, 'আমি বিশ্বাসী লোক একজনকে ইতিমধ্যেই পেয়েছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ !.. সাহসী, ভাল ছেলে।'

তাগি-বেক সঙ্গে সঙ্গে উজ্জীবিত হয়ে উঠে কৌতূহল নিয়ে তার দিকে তাকাল। খোরাশান আর খিবার গালিচা দিয়ে সাজান আসবাবহীন ঘরের

চারদিকে ভয়ার্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গোপন কথা বলার ভাব নিয়ে মালিকের দিকে ঝুঁকে পড়ে একেবারে কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল: 'করিম।'

করিম যখন সন্ধ্যাবেলাগুলিতে ব্যারাকে অথবা নাইট ডিউটিতে নিজের জীবনের কথা ভাবত তখন ওর মনে হত যেন সে একটা গভীর গর্তে পড়ে গেছে, যার থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারবে না।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। দেরী করে বাড়ী ফেরার পথে যেন পথিক আচমকা এক ঝড়ের মুখে পড়েছে, সে পথ হারিয়ে বিশ্বাসঘাতকদের খুঁড়ে রাখা এক গর্তে পড়ে গেছে আর সেই গর্তে আছে সাপ, বিষাক্ত মাকড়সা ও আরও অনেক কিছু।

মানুষের জীবনটাও এইরকম গর্তের মত নয় কি? মানুষও একে অপরকে বিনাশ করছে, হুল ফোটাচ্ছে, বিষ দিচ্ছে, দুর্বলদের গিলে ফেলছে। যার মাথা আছে, সে সত্য দিয়ে হোক, মিথ্যা দিয়ে হোক এই দুর্গন্ধময় গর্ত থেকে বেরিয়ে যাবে। আর যদি তার জন্য প্রয়োজন হয় পাশের লোকের কাঁধে ওঠার, আর তার মুখটা সাপের দঙ্গলের মধ্যে চেপে ধরার, তো নিজে রক্ষা পাবার জন্য তাও করতে হবে।

সময় পাল্টে গেছে: মানুষের হৃদয় থেকে সততা, দয়া সব মুছে গেছে। সুখী হতে চাও? তাহলে জানবে যে, সুখ তুমি পাবে না অন্য কারুর ক্ষতি না করে, এমনকি সে তোমার খুব কাছের, খুব ভালোবাসার জনও হতে পারে।

পৃথিবীতে সুখ পায় কেবল শক্তিশালী, চালাক, চটপটে, উদ্যমশীল লোকেরাই। করিম ঠিক করল সেও শক্তিশালী, উদ্যমশীল আর ধূর্ত হবে।

প্রথম প্রথম সে বোকার মত আশা করত কেউ সুখকে তার কাছে নিয়ে আসবে সোনার ট্রেতে করে, কিন্তু দেখা গেল সবক্ষেত্রেই তাকে সবাই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীর আলো দেখল এক দরিদ্র মানুষের সংসারে জন্ম নিয়ে, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে, তৈলখনিতে কাজ পেল অনেক কষ্টে, তোষামোদ করে আর ঘুষ দিয়ে বোরিং মেশিনে একটা জায়গা করে নিল, কিন্তু কি জানি কেন কারুর মাথায় আসছে না তাকে বেশী মাইনের ফোরম্যানের পোস্টটা অথবা অন্তত পক্ষে ড্রিলিং মেশিনের কাজ দেওয়ার কথা। আর মাইনেও তাকে এত সামান্য দিচ্ছে যে তাতে বাঁচাও যায় না, আবার খিদেয় মরাও যায় না।

আহ্, তোমরা আমাকে মিষ্টি পিঠের কাছে, তেলগড়ান চমৎকার রান্না করা ক্যফতা-সন্পের কাছে এমনিতে যেতে দেবে না? তাহলে আমি কৌশলে কোনো ঘন্রপথে ঠিক সেখানে যাবই। তাই, করিম গন্প্তচক্রে যোগ দিল, 'সোশ্যালিস্ট' হল, কারণ সে দেখল যে মালিক ও তার সহকারীরা সবাই তাদের কী প্রচণ্ড ভয় করে, যেন রাত্রির অগ্নিকাণ্ড। এমনকি 'সোশ্যালিস্ট', 'বলশেভিক' এই কথাগন্লিকে পর্যন্ত ভয় করে। প্রথমে সে খানিকটা দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল, এমনকি ভুলেও গিয়েছিল যে সে কী নীচ লজ্জাকর উদ্দেশ্য নিয়ে এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার ধারায় সেও ভেসে গিয়েছিল, নিজে প্রতিরোধের কোনো চেষ্টা করে নি, খালি প্রতিদিন খোদার কাছে প্রার্থনা করেছিল যেন ভালয় ভালয় এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে... ক্রমশ সে এদের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেল, এবং বন্ঝতে পারল নিজের একান্ত স্বার্থসিদ্ধি এখানে আশা করা যায় না, উল্টে জেলে যাওয়া খন্বই সহজ। আর এখন সে যান্ত্রিকভাবে গোপনে হেসে হেসে প্রতিধন্নি করত সেই সব শ্লোগানগন্লির যেগন্লি সে কিছন্দিন আগেই মিটিংয়ে সম্পন্র্ণ অন্তর থেকেই চীৎকার করে বলত: 'ব্যক্তিগত মালিকানার ধন্ংস কর!', 'সমস্ত ক্ষমতা কৃষক ও শ্রমিকের হাতে!' 'পন্ঁজিবাদের ধন্ংসস্তূপে স্বাধীন জীবন গড়!' ফুঃ, যত সব ফাঁকা বন্লি! ক্ষন্ধার্ত মন্রগী খালি দানার স্বপ্নই দেখে... আর দিনের পর দিন করিম আরো বিশ্বাস করতে লাগল যে, পৃথিবীর আইন অপরিবর্তিত, চিরন্তন, তাকে ধন্ংস করা যায় না, পৃথিবীর সৃষ্টির সময় যা শন্রন্ হয়েছে, তাই চলে যাবে যন্গ যন্গ ধরে।

কোথায় সন্খ! তার স্বপ্ন দেখারই কোন মানে হয় না। এই মাথা ঘন্লিয়ে দেওয়া গোলমাল, সংঘর্ষ, বিপদের মধ্যে কোনো রকমে বেঁচে থাকাই দায়।

কিন্তু করিমের ভয় ছিল যে, সে যদি অমনি এই সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে আসে তাহলে তাকে তক্ষন্ণি সবাই ভুলে যাবে, বন্ধন্রাও, শত্রন্রাও... ঠিক এই সময়ই গিয়াসসাহেব এসে তার কাছে শরীর, কাজকর্মের কথা জানতে চাইল। সে করিমের প্রতি খন্ব সম্মান দেখিয়ে কথা বলল, কারণ সে তার মধ্যে দেখতে পেল তারই নিজের প্রতিবিম্ব।

বিনাবাক্যব্যয়েই তারা পরস্পরকে বন্ঝে ফেলল, আর করিম বন্ঝল যে, বেহেশ্তের দরজা ইতিমধ্যে তার জন্য একটুখানি খন্লেছে, খন্বই

একটুখানি বটে, কিন্তু দরজার ঐ সরু ফাঁকটায় একটু চাপ দিলেই গলে ভেতর চলে যাওয়া যাবে।

করিমের মাইনে অনেক বেড়ে গেছে, তৈলকারখানার মালিকের ডান হাত গিয়াসসাহেবের অনুগ্রহ আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিই দিচ্ছে।

এখন, ঘুমোবার সময়, তেলচিটচিটে তুলোর কম্বলের নীচে আরামে শুয়ে করিম মিষ্টি স্বপ্নের মধ্যে ডুবে ছিল — শীগগির তার বিরাট মর্যাদা হবে, আঙুরের বাগানওলা নিজের বাড়ী হবে। নাকি চায়ের দোকান খোলা বেশী লাভজনক হবে? হ্যাঁ, শ্রমিকদের ব্যারাকের কাছে চায়ের দোকান খুলতে হবে, তাহলে তৈলশ্রমিকরা মদ খেয়ে যে সব কথা বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে তা' শোনার সুযোগ পাওয়া যাবে আর বেশ ভালোভাবে গিয়াসসাহেবকে বিভিন্ন ধরণের খবর পেঁাছে দেওয়া যাবে!

একদিন করিম এইরকম কম্বলের নীচে ঢুকে আরাম করে লম্বা হয়ে শুল, হাত মুড়ে মাথার নীচে রাখল, চোখ বন্ধ করে সুখের স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যাবার উদ্যোগ করল, এমন সময় হঠাৎ দরজায় কার কঠিন করাঘাত শোনা গেল।

রেগে গিয়ে চীৎকার করে করিম বোনকে বলল:

'এই মেস্‌মে, দেখ শয়তান আবার কাকে এনে হাজির করেছে!'

সতের বছরের লম্বা সুশ্রী একটি মেয়ে পাশের কুঠরী থেকে বেরিয়ে এল আর দরজার খিল না খুলে জিজ্ঞাসা করল:

'কে?'

'আমি... আমি গিয়াস, ভাই বাড়ীতে আছে?'

করিম বিবর্ণ হয়ে গেল, লাফিয়ে তক্তপোষ থেকে উঠে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরতে লাগল। কী কারণে ফোরম্যান গরীব শ্রমিকের বাড়ীতে পা দিয়েছে? কিছু ঘটল নাকি?.. মেস্‌মেও ভয় পেয়ে গিয়েছে, কাঁপা কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিল।

নীচু হয়ে তোষামুদে ভঙ্গীতে করিম তার আজ্ঞাকারীকে অভিবাদন জানাল।

'ভেতরে আসুন। আমার বাড়ী, আপনার বাড়ী। নিজের বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র যেমন অসীম রহমৎ মালিকেরও তেমন নিজের ভৃত্যের প্রতি দোয়া।'

সাবধানে অতিথির হাতটা ধরে তাকে নিয়ে বসাল সম্মানের আসনে, আর সম্মানে কথা বলে যেতে লাগল:

'আপনার আগমনে আমার এই দীনকুটীর সূর্যালোকের থেকেও বেশী আলোকিত হয়ে উঠেছে!'

গিয়াসসাহেব উদাসীনভাবে তার এই নাছোড়বান্দা সেবা উপভোগ করছিল — এই দাম্ভিক উদাসীনতা সে তাগি-বেকের দেখাদেখি শিখেছে।

'তুই বোস্ ত'।'

'যা আদেশ হয় সাহেব!' করিম বিনয়ে একেবারে কেঁপে উঠল, 'দাঁড়িয়ে থাকি, পাগুলো তো আমার নিজের... বোনটি, শীগগির চা করে নিয়ে আয় এই সম্মানিত অতিথির জন্য সুগন্ধ, কড়া চা।'

'বোস্।' গলা উঁচিয়ে গিয়াস তাকে বসতে আদেশ দিল।

হাঁফিয়ে, নিজের তোষামুদে আশ্বাসগুলি ভুলে গিয়ে করিম টুলের এক ধারে বসল।

দু'জনেই চুপ: গিয়াসসাহেব মাথা নীচু করে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন, আর করিম কিছু ভেবে না পেয়ে মনিবের দিকে তাকাচ্ছিল কেবল।

'করিম।'

'আদেশ করুন, মালিক।'

'জানিস, কি জন্য এসেছি?'

'সাহস হয় না আন্দাজ করার। আপনার আদেশের অপেক্ষায়, সম্মানিত গিয়াসসাহেব।

'করিম, আল্লাহ্ জানেন আমি দয়ালু লোক, নিজে একটা মুরগীরও গলা কাটতে পারি না, প্রতিবেশীকে ডাকতে হয়... আমার মনে খালি একটাই ইচ্ছা — কি করে লোকের ভাল করব।'

'নিশ্চয়ই, গিয়াসসাহেব, এটা যে কত বড় সত্যি, কেউ কখনো দেখে নি আপনাকে খারাপ কাজ করতে, শোনে নি খারাপ কথা বলতে!' করিম ভালবাসায় গলে গিয়ে বলল।

'মিথ্যা, নির্লজ্জ মিথ্যা!' চেঁচিয়ে গিয়াসসাহেব হতবুদ্ধি করিমকে ধমক দিল, কিন্তু তারপরেই বন্ধুভাবে মৃদু হাসল, 'ছিল এমন লোকেরা, যাদের আমি অনেক ক্ষতি করেছি, আর তুই পাজী তাদের কথা জানতিস্... কিন্তু তারা কারা? যারা দুধ খাবার সময় মায়ের বুক থেকে শুষে নিয়েছে বিষ, আল্লাহ্-বিরোধী মাদক, যারা রহমতী আল্লাহ্র তৈরী এই দুনিয়াকে

ধ্বংস করে ফেলতে চাইছে। হাজার ছল আর ধর্মবিরোধী মিথ্যায় ওরা তোর আমার মত সাচ্চা মুসলমানের শান্ত জীবনের গতিকে ম্লান করে দিতে চাইছে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই গিয়াসসাহেব, সব নষ্ট করে দিচ্ছে এই কাফেরগুলো।' শেষ পর্যন্ত সমর্থন জানাল করিম এই সব গোলমেলে, ধোঁয়াটে কথাবার্তায় একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে।

'আর এও জানি যে, এক সময় তুইও, ব্যাটা মোষের বাচ্চা, ওই ঘৃণ্য দাঙ্গাবাজগুলোর সঙ্গে মুখ শোঁকাশুঁকি করেছিস। দাঁড়া!' করিম কেঁপে উঠে তার পায়ে ক্ষমা চাওয়ার উদ্যোগ করছে দেখে গিয়াস হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল। 'আর আমি এও জানি যে, আল্লাহ্‌র রহমতে তুই সেই ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা পেয়েছিস, তাই তোর খারাপ কাজগুলোর কথা পুলিসকে কিছু জানাই নি।'

'আমার জীবন আপনার হাতে, সাহেব, আপনি বললে ফাঁসির দড়িতে লটকাব, আপনার জন্য জাহান্নমের যত যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করব!..'

'দাঁড়া, দাঁড়া,' রাগতে আরম্ভ করে চেঁচিয়ে উঠল গিয়াস, 'কিন্তু তোকে তোর গুনাহের দাগ ধুতে হবে আমাদের দয়ালু রক্ষক তাগি-বেকের কাছেও। শুনলাম, হরতালের তোড়জোড় চলছে। অভ্যুত্থানও হতে পারে। এখানেও বরাবরের মতই দলের সরদার আলি আর পিওতর। আমি নিশ্চয়ই আজ অথবা কাল ওদের ধরতে পারব আর আচ্ছা শিক্ষাও দিয়ে দেব, কিন্তু তুই...'

'যে কোন আদেশ পালনে প্রস্তুত, সাহেব।'

'তোকে অবিলম্বে জানতে হবে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে এই দুই বদমাশ। এটা তাগি-বেকের হুকুম। আর এই তোর মজুরি।' এই কথা বলে গিয়াস পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা মোটা প্যাকেট বের করে আনল, 'কাজে লাগবে!'

আড়চোখে দ্রুত ব্যাংকনোটগুলো গুনে করিম নিজের আরো বেশী দাম চাইবার প্রয়াসে, মুখচোখের অসহায় ভঙ্গী করে ঘ্যান ঘ্যান করে বলল:

'আল্লাহ্‌র কসম সাহেব, কাজটা খুবই কঠিন, ঝামেলার...'

এই ইঙ্গিত বুঝতে গিয়াসের কষ্ট হল না, সঙ্গে সঙ্গে সে টেবিল থেকে টাকার প্যাকেটটা নিয়ে আবার পকেটে রাখার উদ্যোগ করল।

'খিদের জবালায় মরার যদি তোর ইচ্ছে হয়ে থাকে তো আমার কিছন করার নেই।'

করিম কাঁপতে কাঁপতে এমন ঝাঁপিয়ে পড়ল টেবিলের উপর, একটা রাস্তার কুকুরও মরা জন্তুর দেহের ওপর তেমন ঝাঁপিয়ে পড়বে না। সে টাকাটা বনক দিয়ে চেপে ধরল আর তার চোখে এমন এক উম্মত্ততা দেখা দিল যে তাই দেখে গিয়াসেরও গা ঘিনঘিন করে উঠল।

এই তো দীন করিমের সামনে বেহেশ্‌তের দরজা খনলে গেছে; ওঃ কী সনখী সে। কিন্তু করিম যে এখনও জানে না কোথায় আলি আর পিওতর লনকিয়ে আছে, কে ওদের লনকিয়ে রেখেছে। টাকার বদলে কাজ তো দিতে হবে। কিন্তু ভাগ্য দেখা গেল করিমের প্রতি সদয়, তার মনে পড়ল গনপ্তচক্রের আগামী মিটিংয়ের কথা, উত্তেজিতভাবে ফিসফিসিয়ে বলল:

'তিন দিন পরে মিটিং... পিওতর আর আলি নিশ্চয়ই আসবে। ওদের ছাড়া কোন কাজই হবে না, ওরা আসবেই। তিয়াত্তর নম্বর পনরনো বোরিং মেশিনের পাশে, পোড়ো মাটির সনড়ঙ্গঘরে 'ডাকঘরের সামনে'।'

'হনম-ম...' গিয়াস আরাম করে দেয়ালে হেলান দিল আর ক্ষতসারার পরে বিশ্রী সাদা, মাংসল হাত ঘষে বলল। 'ভাল খবর! আমি বলি কি... তুইও যাবি, আমরা তোদের সবাইকে একসঙ্গে গ্রেপ্তার করব, তারপর তোকে আমি ছেড়ে দেব — কাজে লাগবি। সবথেকে বড় কথা, তোকে যেন কেউ সন্দেহ না করে।'

ঘরে ঢুকল লজ্জান্বিত সনন্দরী মেস্‌মে চোখ নামিয়ে হাতে তার ট্রের উপর সনগন্ধি ধোঁয়া-ওঠা চায়ের গেলাস আর বাটিতে জ্যাম।

'আর কে আসবে?'

'সবাই আসবে: হাসান, ইভান, গনদরেত,' অসাবধানে বলে ফেলল করিম।

মেয়েটির মনখ সাদা হয়ে গেল, হাতের ট্রে কেঁপে গিয়ে গেলাস বাটি সবকিছন উল্টে মাটিতে পড়ে কাঁচের টুকরোয় চার দিক ভরে গেল।

'কানা হলি নাকি?' রেগে চেঁচিয়ে হাত নাড়িয়ে করিম বলল। 'মাথার গোলমাল হল নাকি, গাধা কোথাকার? শীগগির অন্য গেলাসে চা নিয়ে আয়! এমন সম্মানিত অতিথির সামনে বাড়ীর মান নষ্ট করছিস।'

'ঠিক আছে করিম, ও কিছন না,' প্রশ্রয়ের সনরে গিয়াসসাহেব ক্রুদ্ধ করিমকে শান্ত করতে লাগল, এই কথা ভেবে আনন্দিত হয়ে যে ওই ঘৃণ্য

হাঙ্গামাসৃষ্টিকারীরা শীঘ্র অন্ধকার কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হবে। 'মেয়েদের কখনও বকাবকি করতে নেই। শরীয়তের আইন অনুযায়ী মেয়েদের খালি আদর করতে হয়। মিষ্টি কথা বলতে হয়।'

পাশের ঘরে উচ্চৈঃস্বরে মেসুমে কাঁদছিল: 'বেচারা, আমার বেচারা গুদরেত।'

শীতের দিনে ধোঁয়াভরা কুয়াশায়, ভিজে অন্ধকারে কলকারখানাগুলির সকাল ছ'টার ভোঁ শ্রমিকদের ডাকে। এখনও দিগন্ত দেখা যাচ্ছে না, এখনও ভোর হতে অনেক দেরী, কিন্তু ভোঁ করুণসুরে বেজেই চলেছে, সে থামবে তখনই যখন রাস্তায় দেখা যাবে পুরো ঘুমোতে না পাওয়া, আধপেটা খাওয়া শ্রমিকদের। ঠাণ্ডায় তাদের হাড় পর্যন্ত কাঁপে; মাথা ঘাড়ের মধ্যে গুঁজে দিয়ে, টুপিটা সামনে টেনে দিয়ে তারা হাঁটে তাড়াতাড়ি, এই আশায় যেন ঐ বোরিং মেশিনগুলির কাছে পেঁছিলেই আর এত ঠাণ্ডা লাগবে না।

প্রত্যূষের আধা অন্ধকারে মধ্যযুগীয় মিনারসদৃশ বোরিং টাওয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে গুদরেত হুসেনের অপেক্ষা করছিল, অধৈর্যের সঙ্গে সে পা-বদল করছিল আর ঘন কুয়াশার মধ্যে চোখ চালাবার চেষ্টা করছিল। অবশেষে বন্ধুকে দেখতে পেয়ে, সে তার কাঁধে হাত দিয়ে একধারে তাকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল:

'আজকের মিটিংয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছে।'

'কি বাজে বকছিস!' হুসেন বিশ্বাস করল না। 'কি করে তুই বুঝলি? স্বপ্ন দেখেছিস? শয়তান বা জিন এসে তোকে বলে গেছে?'

'না রে না, জিনও না শয়তানও না, ব্যাপারটা মোটেই ভাল না। যদি সাবধান না হই, তবে অন্ধকার জেলে পচে মরতে হবে!' সমানে চারদিকে চোখ রাখতে রাখতে উত্তেজিতভাবে বলল গুদরেত। 'পিওতর, আলি,' উদ্বেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, 'আঃ বিশ্বাসঘাতক! আঃ নোংরা চরিত্র! রাগেতে আমার বুক কাঁপছে। জ্বলে যাচ্ছে। এই শিয়ালের মত দুমুখো লোকগুলোকে সহ্য করতে পারি না! নিজের হাতে প্রতিশোধ নিলে রাগ যায়!'

'খুলে বল সবকিছু!' হুসেনও উদ্বেগে বিবর্ণ হয়ে বলল, 'সবকিছু এত ভালভাবে, কৌশল করে প্রস্তুত করা হল, সামনেই হরতাল... এখন তুই কি চেঁচামেচি আরম্ভ করে দিলি? কেন যে তুই এমন আতঙ্কগ্রস্ত কিছুই বুঝতে পারছি না'

'বেচারী হুসেন, হরতাল আর তোকে করতে হবে না। তোকে, আমাকে দু'জনকেই আজ...' গুদরেত হাত দিয়ে গলা ছুঁয়ে শিস দিয়ে উঠল।

আর সহ্য করতে না পেরে হুসেন বন্ধুকে ধরে এমন জোরে ঝাঁকানি দিল যে তার দাঁতগুলো ঝনঝন করে উঠল।

'শীগগিরি বল্, কি হয়েছে? বল্!..'

তারা বোরিং টাওয়ারের আড়ালে আরো সরে গেল, সাদা তুষারঢাকা কাঠের তক্তার গায়ে সেঁধিয়ে গিয়ে গুদরেত বলল বিশ্বাসঘাতক করিমের সঙ্গে গিয়াসের মাঝরাত্রির সাক্ষাতের কথা, ঠাণ্ডায় বা ভয়ে তার কথাবার্তা গুলিয়ে যাচ্ছিল।

'হতে তো পারে এ ঐ মেয়েটিরই মস্তিকপ্রসূত? হয়ত ঠাট্টা করেছে?'

'অমন মেয়ে!' গুদরেত অপমান বোধ করল, 'আর আমাকে ভালবাসে। ওকে না বিশ্বাস করার মানেই হয় না।'

'ঠিক আছে, তার মানে সত্যি। মিটিংয়ের জায়গা আর সময় বদলাতে হবে তাহলে।'

'বলা খুবই সহজ!' বাঁকাহাসি হেসে বলল গুদরেত, 'নিজেদের মধ্যে সবাইকে তো আমরা খবর দিতে পারি, কিন্তু পিওতর আর আলিকে তো চিলেও খুঁজে পাবে না।'

নেতারা সত্যিই সত্যিই একেবারে ঠিক ঠিক সময়ে আসবে মিটিংয়ের জায়গায়; দিনের বেলা জনবিক্ষুব্ধ শহরে তাদের খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। নিরুপায়, নিরাশ পরিস্থিতি... পাশের বোরিং মেশিনের বন্ধুদেরকেও হুসেন আর গুদরেত বিপদের কথা জানিয়ে দিচ্ছিল। সবাই বেইমান করিমকে অভিশাপ দিচ্ছিল, মালিকের কুকুর গিয়াসকে গালাগাল দিচ্ছিল, কিন্তু নিজেদের অক্ষমতাও বুঝতে পারছিল: আলি আর পিওতরকে পুলিশ পোড়ো জমিতে যাবার পথেই ধরবে। এই বিপদের থেকে কি পরিত্রাণ নেই? সবথেকে ভয়ঙ্কর কথা আলি আর পিওতর করিমের বেইমানির কথা সন্দেহও করবে না, জানতেও পারবে না তাদের বিনাশ কত কাছে।

'আমাদের ওদেরকে বাঁচাতেই হবে।' দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে বলল হুসেন।

'কিন্তু কি ভাবে?'

'আমি কাজ ছেড়ে ওদের খুঁজতে যাব। বলব, বাড়ীতে কোনো দুর্ঘটনা

ঘটেছে। কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবে? দিক্। চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে আলি আর পিওতরের মৃত্যু দেখব নাকি? যদি খুঁজে না পাই তো গলিতে গলিতে পিকেট বসাব, তাতেও যদি না হয় তো আমরা তাদের পুলিসের থাবা থেকে ছিনিয়ে নেব! বন্ধুদের বাঁচাবার জন্য সব কিছুই করব।' পশমের মাফলারটা গলার চারদিকে জড়িয়ে, টুপিটা সামনে টেনে দিয়ে, কোটটা গায়ে দিয়ে — যেটার একটাই মাত্র নাম হতে পারে গর্তের ভেতর গর্ত — হুসেন ছুটে বেরিয়ে গেল।

গুদরেতের সিগন্যাল অনুযায়ী শ্রমিকরা আওয়াজ তোলা ড্রিলিং মেশিনটা চালিয়ে দিল। ডিউটি আরম্ভ হল। যাই হোক্ না কেন, কাজ করতেই হবে, তা' নাহলে মাইনের দিন ঘরে শূন্যহাতে ফিরতে হবে।

কয়েক মিনিট পরে দরজায় পা দিয়ে ধাক্কা দেবার আওয়াজ পাওয়া গেল। গুদরেত দরজার ফাটলে চোখ রেখে দেখে পিছিয়ে এল। নাম না নিতেই বোরিং মেশিনে গিয়াসসাহেবের সশরীরে আবির্ভাব, ঐ যে ঢোকার দরজার মুখে আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আছে, খরখরে গোঁফগুলো নড়ছে...

'এসেছে।'

'কে?'

'গিয়াসসাহেব।'

'ভাল সুযোগ!' শ্রমিকদের মধ্যে কে যেন বলল।

গুদরেত চিন্তা না করেই কুড়ুলটা হাতে নিয়ে সজোর আঘাতে বেল্টটা কেটে ফেলল। মেশিন কড়কড় আওয়াজ করে থেমে গেল।

গিয়াসের মেজাজ আজ দারুণ ভাল। তার কোন সন্দেহই ছিল না যে, সন্ধ্যাবেলায় এই কুকর্মকারীরা পুলিসের হাতে ধরা পড়বে, জেলে যাবে আর তখন তৈলকারখানায় শান্তি নেমে আসবে, আর তাগি-বেক তার বিশ্বস্ত ভৃত্যকে দরাজ হাতে উপহার দেবে... কিন্তু দিনের বেলায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটু দেখতে হয় কাজকর্ম কেমন চলছে বোরিং মেশিনগুলিতে, খবরটা নিয়ে পুলিসের কাছে তার পরে গেলেও চলবে; হয়ত সেখানেও এই খবরের জন্য টাকা পাওয়া যাবে, মালিক যা দেবে তার থেকে হয়ত বেশীই পাওয়া যাবে।

দরজা খুলে গেল আর গিয়াস ঢোকামাত্র শ্রমিকরা তাকে দু'বাহু বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

'একেবারে ঠিক সময়েই সাহেব এসেছেন! বেল্টটা কেটে গেছে।'

গিয়াসকে ফাঁকি দেওয়া সহজ ছিল না, আর শ্রমিকদের তার প্রতি প্রীতির ভাবটাও সে বিশ্বাস করছিল না। গুদরেতের ঘাড়টা ধরে তাকে ঝাঁকানি দিল।

'মর্ ব্যাটা! ড্রিলিং মেশিনের কাজ করবে! কতবার বলেছি মেশিন চালাবার সময় সাবধানে কাজ করবি?'

'হয়ে গেছে, সাহেব, কি করব? আমরা তো খুবই সাবধানে কাজ করি!'

নীচু হয়ে গিয়াস বেল্টের ছিঁড়ে যাওয়া অংশটা পরীক্ষা করে দেখল, অর মুখ লাল হয়ে উঠল যেন একটা ঘষা তামার পয়সা।

'এই শুয়ার কা বাচ্চা, আমাকে গাধা পেয়েছিস? নিজেই বোধহয় কুড়ুল কি শাবল দিয়ে কেটেছিস আবার বলা হচ্ছে 'সাবধানে কাজ করি...' চুপ থাকলেও তো পারতিস।'

'দোষ হয়েছে, মাফ করে দেবেন, স্যার,' বিড়বিড় করে বলল গুদরেত কিন্তু অনিচ্ছাকৃত একটুখানি বাঁকা হাসি লুকোতে পারল না এবং এটাই শেষপর্যন্ত গিয়াসের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাল।

সে গুদরেতের মুখে প্রচণ্ড জোরে চড় মারল, তারপর দ্বিতীয়বার মারার জন্য হাত উঠাল — এই ভাবে সে অনেক শ্রমিককে শিক্ষা দিয়েছে — কিন্তু আজকে অবাক করা ঘটনা: গুদরেত শক্ত হাতে ওর কব্জিটা এত জোরে চেপে ধরেছে যে হাড় মড়মড়িয়ে উঠল।

'আরে বিদ্রোহ!' চীৎকার করে বলল গিয়াস আর কোমরের বেল্টে ঝোলান রিভলবারের দিকে হাত বাড়াল অবাধ্য শ্রমিককে গুলি করার জন্য, কিন্তু সেই মুহূর্তে সমস্ত শ্রমিক একসঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাতদুটোকে পেছনে চেপে ধরল।

গুদরেত ঘৃণার সঙ্গে গিয়াসের মুখের ওপর চীৎকার করে বলল: 'আঃ বিশ্বাসঘাতক!'

'জন্মেছিস্ আমাদের কষ্ট দেবার জন্য!.. এস ছেলেরা এদিকে, এদিকে, পাগুলো ধর্!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

গিয়াসের মুখে চেপে রুমাল গুঁজে দেওয়া হল, দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে এক মিনিটের মধ্যে মাথা নীচের দিকে করে গভীর গর্তের মধ্যে ফেলে দেওয়া হল।

করিমের আজ দারুণ সুখের দিন — একেবারে যেন পরব লেগে গেছে! যদিও সে এখনও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করে নি, কিন্তু অন্ততপক্ষে বেহেশ্‌তের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ম্যানেজারের সহকারী করা হয়েছে যথেষ্ট ভাল মাইনেতেই। অবশেষে ভাগ্য তার প্রতি হেসেছে। আর এ সব তো আপাততঃ, পিওতর, আলি আর সব হাঙ্গামাকারী আর প্ররোচকদের গ্রেপ্তারের আগে। আর যেইমাত্র ওদেরকে জেলে ভরা হবে অমনি,তাগি-বেকের উদার হাত করিমকে সোনায় ভরিয়ে দেবে।

ম্যানেজারের সহকারী — এটা একটা কিছু বটে: গোঁফটাকে একটু ফুলিয়ে নিতে হবে, চামড়ার টুপি হাঁকাতে হবে, বহুদিন আধপেটা খেয়ে থাকার ফলে ভেতরে ঢুকে যাওয়া পেটকে একটু উঁচু করতে হবে। সরে যা, ভিখারী! শিখে নাও, কেমন করে বাঁচতে হয়।

উল্লাসে শিস দিতে দিতে করিম মোটরঘরের ভেতর দিয়ে গুদরেতের বোরিং টাওয়ারের ভেতর গিয়ে ঢুকল আর ভয়ে যেন পাথর হয়ে গেল, হাত-পা বাঁধা গিয়াসসাহেব গর্তে নিক্ষিপ্ত দেখে তার ভয়ে দমবন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়।

'সাহেব! এই, কে আছো...' অচৈতন্যভাবে গুঙিয়ে বলেই করিম ছুটে দরজার দিকে গেল সাহায্যের জন্য লোক ডাকতে।

গুদরেত আদেশের সুরে চেঁচাল: 'ধর্, ধর্ ওকে!'

একেবারে সিঁড়ির ধাপে ভোরবেলার ধূসর আকাশের নীচে, দশটা শক্ত আঙুল করিমের গলাটা টিপে ধরল আর বেইমানের টানা চীৎকার বন্ধ হয়ে গেল। এক মুহূর্তের নির্দয় সংঘর্ষ — আর সেও মুখ থুবড়ে গর্তে পড়ল নিজের হিতৈষীর অনড় দেহটার ওপর।

কে যেন নির্মম কঠোর স্বরে গুদরেতকে বলল, 'ব্রেক ধর্ গিয়ে।'

আর গুদরেত অদ্ভুত স্থৈর্যের সঙ্গে, অসুস্থ অসাড় ভাবে এগিয়ে গেল ব্রেকের দিকে — বোরিং মেশিন আওয়াজ করে নড়ে উঠল আর তার ভারী ইস্পাতের বাটালি ধীরে, অতি ধীরে নেমে গেল গর্তের মধ্যে...

দিনের বেলায় আলি আর হুসেন সেখানে এসে পেঁছল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন পাহারাদারদের ভয় না করে, পোড়োজমির মাঝে একটা গোপন পায়েচলা পথ দিয়ে আলি ছুটে চলে এল, কারণ সে জানত এখানে তার অনেক বিশ্বাসী বন্ধু, যারা তাকে ধরিয়ে দেবে না, যে কোন আঘাত

থেকে তাকে বুক দিয়ে বাঁচাবে... জিজ্ঞাসু, উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে সবাই তার দিকে এগিয়ে এল।

'হ্যাঁ, কমরেডরা, মিটিং স্থগিত রাখা হচ্ছে। তোমরা যা করেছ সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ! তোমরা সংগঠনকে বাঁচিয়েছ। যদি আমরা এইভাবে ভবিষ্যতেও কাজ চালিয়ে যাই তাহলে আমাদের হরতাল নিশ্চয়ই সফল হবে।'

'তাগি-বেক যে মাথা নীচু করে আমাদের সব দাবী মেনে নেবে, এতে কোন সন্দেহ নেই,' গুদরেত বলল নিজের ভেতর অদ্ভুত শক্তি, বিশ্বাস আর স্থৈর্যের জোয়ার অনুভব করে।

'না মানলে জোর করে মানাব!' স্পষ্টভাবে বলল আলি। 'আমাদের জয় হবে!'

তার 'আমাদের জয় হবে' কথাটা যেন তার চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রমিকদের মুখ দীপের আলোকে আলোকিত করে তুলল, আর তারা তাদের ক্ষমতা অনুভব করে মৃদু হাসল, পরস্পরের কাছে আরো ঘনিষ্ট হয়ে এসে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। তাদের দৃষ্টি দূরে সূর্যের প্রথম রশ্মিতে আলোকিত লাল দিগন্তে নিবদ্ধ।

নবীন গুদরেতের চোখে যেন আরও কিসের দ্যুতি — মেসুমের কাজল আঁখির ঔজ্জ্বল্যের দীপ্তি নাকি?

সে স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে জিজ্ঞাসা করল:

'আলি, তোর কি মনে হয়, ভাগ্য কি আমাদের প্রতিও সদয় হবে? আমরা চির-স্বাধীনতার ভোর দেখতে পাব?'

আলি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, কণ্ঠে এককণা সন্দেহও না রেখে বলল:

'দেখব, অবশ্যই দেখব!'

জন্মদিন

ছোটখাট মানুষটি, কাঁধে ঝোলান ব্যাগের ভারে আরো ছোট বলে মনে হচ্ছে, তাড়াতাড়ি করে ভীড়ের রাস্তাটা পার হচ্ছিল। যখন সে সকালবেলায় পোস্ট অফিস থেকে বার হচ্ছিল তখন ব্যাগটা খবরের কাগজ আর চিঠির ভারে ফেটে যাবে মনে হচ্ছিল, কিন্তু এখন প্রায় খালি।

এই রোদেপোড়া ছোটখাট মানুষটি নিজের কাজ যে কেবল অধ্যবসায়ের সঙ্গেই করত তা নয়, এতে তার আগ্রহও ছিল — সারা দিন ছুটোছুটি হৈ-চৈ-এর মধ্যে কাজের দিন যে কখন শেষ হয়ে যেত লক্ষ্যই করত না।

বাড়ীতে তার অপেক্ষা করত গুলের-খানুম, ঠিক যেন সরু ফুলের ডাঁটির মতই ক্ষীনকায়া।

ভগবানের দোহাই, ভেবে বসবেন না যেন কোন এক তরুণী ভদ্রমহিলার কথা বলা হচ্ছে। আসলে, গুলেরের বয়স মাত্র পনের বছর, সে এই বুড়ো পিয়নটির নাতনী, কিন্তু করিম-দাই* আদর করে তার নামের সঙ্গে খানুম যোগ করে বলে থাকে। দাদু আর নাতনী — এই তাদের সংসার, তিনকুলে আর তাদের কোথাও কেউ নেই।

গুলের বুঝদার, কাজের মেয়ে, লেখাপড়াতেও ভাল, সেই রান্নাবান্না করে, দাদুর জামা ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে দেয়। প্রতিদিনই সে ছেলে মানুষের মত উদ্দাম হয়ে ছুটে এসে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে, টেবিলের কাছে বসায়, খাবার এনে দেয়, কড়া করে চা তৈরী করে দেয়, দাদুর থেকে চোখ না সরিয়ে স্কুলের কথা গল্প করে।

করিম-দাই ভেবেছিল আজ ঠিক সময়ে বাড়ী ফিরবে। একটু আগেই বাড়ী ফিরলে বিরাট কিছু একটা অন্যায় হবে না, আজ তো আর যে সে দিন নয়, তার গুলেরের পনেরো বছর পূর্ণ হল আজ।

---

* দাই — চাচা। — সম্পাঃ

পাঁচতলা বাড়ীটার নিচের তলায় একটা খেলনার দোকান আছে। করিম-দাই সেখানে গ্যুলেরের জন্য কিছু উপহার কিনবে ঠিক করল।

সে, ঠাট্টার হাসি হেসে, বেছে নিল উজ্জ্বল-ভায়োলেট রঙের জামা পরান গোলমুখো একটা পুতুল। 'এটা ওর নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।' সে ভাবল।

বাকুতে জানুয়ারী মাসের এই দিনগুলি ছিল শান্ত, হাওয়াবিহীন। উষ্ণ সূর্যালোকে আলোকিত বিরাট উঠান, লন, খেলায় মগ্ন শিশুরা। বাড়ির উঠানে সবাই এই পুরনো পরিচিতকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল, আর লম্বা, পাকাচুল প্রফেসর তার দিকে এগিয়ে এলেন।

'এই যে, করিম-দাই, শরীর কেমন? গ্যুলের-খানুম কেমন আছে?'

'এই চলছে... আপনার নামে চিঠি আছে, আপনি নেবেন, না ওপরে দিয়ে আসব খবরের কাগজের সঙ্গে?'

'কষ্ট করার দরকার নেই, আমায় দাও, আমি নিজেই ওপরে যাব।'

খবরের কাগজ বার করতে গিয়ে পুতুলটাকে টেনে বার করতে হল। প্রফেসর চোখ বড় বড় করল:

'এ আবার কি?'

'নাতনীর জন্য কিনলাম। আজ ওর পনেরোবছর পূর্ণ হল, কয়েকটি বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছে...'

বছরকুড়ি হল করিম-দাই প্রফেসরের জন্য চিঠি, খবরের কাগজ নিয়ে আসছে, তখন তিনি প্রফেসর হন নি। আর পিয়নের থেকে তিনি বয়সে বড়, তবু তাকে আত্মীয়তা আর সম্মান দেখিয়ে 'দাই' বলে ডাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

তার কাছে ছুটে এল এলোমেলো চুলওলা একটি ছেলে:

'করিম-দাই, আমাকে দিন খবরের কাগজ, আমি নিয়ে যাব।'

প্রত্যেক বাড়ীর উঠানেই তার এই রকম সাহায্যকারীরা ছিল, যারা করিম-দাইকে সাহায্য করে আনন্দ পেত।

'গ্যুলের-খানুমকে আমার শুভেচ্ছা জানিও!' পেছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন প্রফেসর।

এরপর পিয়ন তিননম্বর ব্লকে ঢুকে অভ্যাসমত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

হঠাৎ সে থেমে গেল। তার বুকের বাঁদিকে সরু সরু ইস্পাতের ছুঁচ

ফুটতে লাগল। তারা আরো গভীরে ঢুকছে আর তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

সে আস্তে আস্তে বুককে মালিশ করতে লাগল। 'আরো অপেক্ষা করতে হবে, গুল্যেরকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তবে আমার ছুটী।' বুকের ব্যাথাটা যেন তার এই কথা শুনতে পেল। ছুঁচ ফোটান বন্ধ হল।

হাঁফ ছেড়ে করিম-দাই আরো তিনটে ধাপ উঠে, আঠারো নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে থামল, লেটার বক্সে চিঠি, খবরের কাগজ ফেলে দিল। এই ফ্ল্যাটটা হল ইঞ্জিনীয়র নাদিরের, তার স্ত্রী হাসপাতালে সার্জন। দু'জনেই রাত করে বাড়ী ফেরে।

করিম-দাই মেয়েদের একটি পত্রিকা লেটার বক্সে ফেলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ফেলল না। এঁরা এই পত্রিকার জন্য নাম পাঠান নি। রফিগা-খানুম এক দিনের জন্য ডিসেম্বর সংখ্যাটা চেয়েছেন। সাধারনত পিয়ন জানে কোন বাড়ীর লোক কি কাজ করে, তাই তার পক্ষে আন্দাজ করে নেওয়া শক্ত নয়, কি ব্যাপারে তাদের আগ্রহ জেগেছে, এবারেও যদিও দেখতে ইচ্ছে করছে রফিগা-খানুমের পত্রিকাটা কিন্তু গায়ে পড়ে চাওয়াচায়ি করতে ইচ্ছে করে না।

তাহলে পত্রিকাটাকে নিয়ে কি করবে? বাক্সের মধ্যে ঢুকছে না, ভাঁজ করতে হবে, দুমড়ে যাবে... রফিগা-খানুম পরিপাটী ভদ্রমহিলা, তাঁর এটা ভাল লাগবে না। রোববারে একেবারে হাতে দেওয়াই ভাল...

চারনম্বর ব্লকের দিকে যাবার সময় সেই এলোমেলো চুল ছেলেটি তার কাছে ছুটে এল:

'করিম-দাই, কাগজগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি, আর আপনাকে দেখা করতে বলেছেন তেরনম্বরের ভদ্রমহিলা।'

'ঠিক আছে। ঐ ঝগড়াকুটি ভদ্রমহিলার আবার কি দরকার পড়ল? কোন কিছু বলেছিলেন নাকি, আমি ভুলে গেছি?'

পিয়ন খুব ভাল করেই জানত যে, এই ভদ্রমহিলা চেঁচামেচি করার একটা সূত্র খুঁজতেন কেবল। সপ্তাহে অন্তত একবার তাঁকে কারুর সঙ্গে ঝগড়া-চেঁচামেচি করতেই হবে, নাহলে বেঁচে থাকারই কোন মানে হয় না।

এবারে আবার কি ফন্দী এঁটেছে কে জানে? অপ্রীতিকর অনুভূতি নিয়ে সে তের নম্বর ফ্ল্যাটে ঘণ্টা বাজাল। দরজা খুলে গেল। রঙীন

হাউসকোট পরা ভদ্রমহিলা তার দিকে চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে রইলেন সতর্ক দৃষ্টি মেলে।

'আমি মানি-অর্ডারের অপেক্ষা করছি, মস্কো থেকে।'

'মানি-অর্ডার নেই।'

'আমার হিসেব অনুযায়ী আজ আসার কথা।'

'যদি থাকত, নিয়ে আসতাম...'

'বলছি তোমায়, আজ আসার কথা। খুঁজে দেখ, তোমার ব্যাগে।'

করিম-দাই নিজের ব্যাগে না খুঁজে হাঁটা লাগাল।

উঠানে তার জন্য আবার অপেক্ষা করছিল সেই এলোমেলো চুল ছেলেটি:

'করিম-দাই, রফিগা-খানুম আপনাকে একবার যেতে বলেছেন।'

'উনি বাড়ীতে?' অবাক হয়ে বলল পিয়ন। সে আবার চলল তিননম্বর ব্লকের দিকে।

ঘণ্টা বাজাবার আগেই রফিগা-খানুম নিজেই দরজা খুললেন। অন্যদিনের মত তাঁর মুখে সৌজন্যের ভাব ছিল না, ম্লান দেখাচ্ছিল তাঁকে।

'মাফ করবেন, করিম-দাই, আমার আর কোন উপায় নেই, তাই আপনাকে বিরক্ত করতে হল। আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের ডাক্তারদের একটা দল গ্রামাঞ্চলে রওনা হবে, আমার তাদের সঙ্গে থাকার কথা, কাগজপত্র সব তৈরী, সব আমার হাতে...'

তিনি নিশ্বাস ফেললেন ঘাড় টান করে, যেন একটা দলা গিললেন:

'আপনাকে নিজের লোক ভেবে বলছি — হাসপাতাল থেকে এখুনি ফোন এসেছিল, অফিসে নাদিরের শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ে, আমি এখন ওর কাছে যাব। আর আপনাকে অনুরোধ করছি এই কাগজপত্রগুলি শফকেত-খানুমকে দিয়ে আসতে, তাকে আপনি আমাদের এখানে দেখেছেন, সে অন্যদের সঙ্গে আমার জন্য অপেক্ষা করছে বাসস্টপেজে। আর বলবেন...'

'জানি।' থামিয়ে দিল তাকে করিম-দাই। 'চিন্তা করবেন না, ভগবান করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে, নাদির সেরে উঠবে...'

বেরিয়ে আসার আগে পত্রিকার কথাটা মনে পড়ল, নীরবে সেটিকে টেবিলের ওপর রেখে দিল।

আর আবহাওয়া, যেমন আমাদের এখানে হয়, হঠাৎ বদলে গেল। যতই হোক, জানুয়ারী মাস মাঝে মাঝে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। জোর

উত্তরে হাওয়া উঠল, ন্যাড়া গাছগুলিকে দুলিয়ে দিয়ে আর ছেঁড়া পোস্টারের খস-খস আওয়াজ তুলে।

'বিষ্টি হলে ভাল। শুকনো ধুলোয় চোখ করকর করবে না।' যেই ভেবেছে করিম-দাই, আর তখনই রাস্তার কোণায়, বইয়ের দোকানের কাছে আবার তার বুকের বাঁদিকে ইস্পাতের ছুঁচ ফুটতে লাগল। ছুঁচগুলো ক্রমশ আরো গভীর যেতে লাগল, কপালে তার ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিল, এই ব্যথাটা ছাড়া আর কিছুই তার মাথায় ঢুকছিল না। জোর হাওয়ার দমক তাকে ঠেলে নিয়ে গেল পুরনো বাড়ীটার দেওয়ালের কাছে, তার মাথা ঘুরে গেল। একটু কমতে সে দেওয়াল ধরে বুকে মালিশ করতে করতে ভাবল, 'বুকের ব্যথায় বড় কষ্ট।'

বাসস্টপেজে সে কোনরকমে টেনে হিঁচড়ে যখন পেঁছিল, তখন বাস ছেড়ে যাবার উদ্যোগ করছে।

শফকেত-খানুম সঙ্গে সঙ্গেই ওকে দেখতে পায়নি, সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, রফিগার অপেক্ষায় নিশ্চয়ই। করিম-দাইয়ের সঙ্গে কথা বলার পর তার হতাশ ভাব পরিবর্তিত হল উদ্বেগে।

'আপনার শরীর খারাপ লাগছে?' সে ওকে হাত ধরে নিয়ে গেল ছাউনির নীচে, যেখানে হাওয়া একটু কম, বেঞ্চিতে বসিয়ে দিল।

... চোখ মেলল সে হাসপাতালে। তার মাথার কাছে সাদা এপ্রনপরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমেই তার মনে হল গুল্যের-এর কথা। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে ঘরের কোণায় নিজের ব্যাগটা দেখতে পেল, তার থেকে ভায়োলেট রঙের জামার কোণা দেখা যাচ্ছে। 'বন্ধুরা আসবে বাদামের পিঠে খাবে, চলে যাবে, আর ও একলা পড়ে থাকবে। আমাকে ছাড়া ওর কি হবে? না, গুল্যের-খানুম, আমার অসুখ করা চলবে না। বাদামের পিঠে তৈরী কর...'

হঠাৎ দরজা হাট হয়ে খুলে গেল, ডিউটিরত ডাক্তার ঘরে ঢুকল, রাগে মুখচোখ কুঁচকে টেবিলে গিয়ে বসল আর কাগজপত্র হাঁটকাতে লাগল। নার্স আড়চোখে করিমের দিকে তাকিয়ে নিয়ে, আস্তে করে ডাক্তারকে কিসব বলতে লাগল কিন্তু ডাক্তার তাকে থামিয়ে দিল: 'জায়গা নেই।'

করিম-দাই ভাগ্যকে কখনও দোষ দিত না, কিন্তু এখন বোধ হয় জীবনে প্রথমবার তার নিজের প্রতি মায়া হল। সে ওঠার চেষ্টা করল।

'শুয়ে থাকুন, আপনার ওঠা উচিত নয়।' উদ্বেগের সঙ্গে বলল নার্স।

'আমি বাড়ী যাই। জায়গা নেই যখন...'

'ওঃ আবার রাগ হল!' ডিউটিরত ডাক্তার করিমের মুখের ওপর উদাসীন দৃষ্টি বুলিয়ে বলল। 'শুয়ে থাকো, বুড়ো, তোমার নড়াচড়া বারণ, নাহলে...'

তার কথা শেষ হল না, ঘরে ঢুকল আর একজন ডাক্তার। ডিউটিরত ডাক্তার তার দিকে এগিয়ে গেল, তার গলার স্বর শোনাল নরম, বিষণ্ণ দুশ্চিন্তার সুর মেশান:

'নতুন এসেছে। খালি বেড নেই, জানি না কি করব।'

'চিন্তা করবেন না।' করিম-দাইয়ের ভাঙা ভাঙা গলা শোনা গেল। 'আমি বাড়ী যাব...'

দ্বিতীয় ডাক্তারটি তার গলা শুনে পিছন ফিরল, চেপে বন্ধ করা ঠোঁটদুটি ফাঁক হল স্মিত হাসিতে।

'কোথায় যাবে, করিম-দাই? যদি তোমার মত লোককে সারিয়ে না তুলি তো আর কাকে সারাব!'

এর পর সবকিছু পাল্টে গেল। যেন দেওয়ালগুলোও একেবারে হাসতে লাগল। ডিউটিরত ডাক্তারের মুখেও হাসির ভাব দেখা গেল।

পিয়ন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিছুতেই সে মনে করতে পারছে না কোথায় এর আগে এই ডাক্তারটির সাথে দেখা হয়েছে!

ডাক্তারও, বোধ হয়, তার চোখের ভাবে একথা বুঝতে পারে, মনে করিয়ে দিল তাকে:

'করিম-দাই, আমি চিঙ্গিজ, জয়নাব-খানুমের ছেলে। মনে নেই, আমরা যখন পুরনো বাড়ীতে থাকতাম, তুমি আমাদের ডাক দিয়ে আসতে। বাচ্চাছেলেগুলো সবাই তোমাকে ভালবাসত। বাড়ীতে লোকজন যখন আসত, হয়ত তাদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করত: 'চিঙ্গিজ, তুই বড় হয়ে কি হবি?' — 'করিম-দাইয়ের মত পিয়ন হব।' না না, তোমার কথা বলা উচিত নয় এখন।'

তারপর ডাক্তার প্রায় ফিসফিস করে বলতে লাগল:

'তুমি জান না, একবার তুমি আমাদের বাড়ীতে কি আনন্দের খবর নিয়ে এসেছিলে। বাবা তখন যুদ্ধফ্রণ্টে, খারকভের পথে, আমরা মা'র পেন্সনের ওপর পুরোপুরি নির্ভর। মনে পড়েছে, জয়নাব-খানুমকে? মা একবার খবর পেলেন যে বাবা শত্রুদের হাতে বন্দী হয়েছেন। এমন সময়ে

তুমি তোমার কালো ঝোলাটা নিয়ে হাজির হলে। আর তোমার ঐ ঝোলাটা যে কত ভাল ভাল খবর এনে দিত সবাইকে! সে সময় তোমার আনা সেই চিঠি পড়ে কেঁদেছি আনন্দে। আসল ঘটনাটা হল, বাবা গেরিলাদের সঙ্গে একসঙ্গে লড়াই করছিলেন, শত্রুদের হাতে পড়েননি। এই হল ব্যাপার, করিম-দাই... মানুষ কোনোটাই ভুলতে পারে না, ভালও না, খারাপও না...'

হেড ডাক্তারের কথাগুলি বৃদ্ধের মনে দার্শনিক চিন্তার উদয় করল। সে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার জীবনের কথা ভাবতে লাগল। গুলেরের কথা তাকে সত্যি সত্যি ভাবিয়ে তুলছিল। নিজের জন্মদিনে যখন বেচারী জানবে যে দাদুকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে কি যে করবে কে জানে। পুতুলটা পাঠাতে পারলেও হয়।

সে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠল নার্সকে ডাকবার জন্য, কথা বলার জন্য, এমন সময়ে দরজায় দেখা দিল চিঙ্গিজ। ওকে পুতুলের কথাটা বলা যায় না, ভাবলে বুড়োর মাথা খারাপ হয়েছে...

সৌভাগ্যবশতঃ সে নিজেই বলল:

'আরে করিম-দাই, তুমি তো বেশ বিখ্যাত লোক দেখা যাচ্ছে, প্রফেসর তোমার শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। বললেন, তুমি চিন্তা কোরো না, উনি তোমার নাতনীর কাছে আছেন। বাদামের পিঠে খুব চমৎকার হয়েছিল। নিজের ড্রাইভারকে পাঠাচ্ছেন পুতুল নিয়ে যাবার জন্য। কোন পুতুল?'

করিম-দাই এবারে আর পারল না, জল বেরিয়ে এল চোখ দিয়ে।

সে শুয়ে রইল হাসপাতালের বিছানায় আর যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে অনেক অনেক মানুষের মুখ তার সামনে দিয়ে ভেসে যেতে লাগল: কোনো মুখে উদারতা প্রকাশ পাচ্ছে, কোনোটায় বিষণ্ণতা আবার কোনোটায় বা সমবেদনা...

এই তো তার গুলের-খানুম বন্ধুদের সঙ্গে বাদামের পিঠে খাচ্ছে। ডাক্তার রফিগার চোখ ও দেখতে পাচ্ছে, সুস্থ নাদিরের গলা শুনতে পাচ্ছে আর প্রফেসরকেও দেখছে। সেই ঝগড়াকুটি ভদ্রমহিলাকেও দেখতে পেল, এবারে তার চোখে ঠাণ্ডা অবিশ্বাসের ভাব নেই...

স্মৃতিস্তম্ভ

শরতের মাঝামাঝি। কিসলভোদস্কে* আবহাওয়া পরিষ্কার, শান্ত। শরতের সূর্য আরামদায়ক উষ্ণতা দিচ্ছে। স্বচ্ছ-নীল আকাশ মেঘহীন, কাছাকাছি পাহাড়গুলির আর এলব্রুসের তুষারাচ্ছাদিত চূড়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এখানে ক'দিন দারুণ ভাল আবহাওয়া যেন চিকিৎসার জন্য আসা লোকেদের আনন্দ দেওয়ার জন্যই!

সূর্য পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে। দু'জন চেঞ্জার নারজান গ্যালারী** থেকে বেরিয়ে কিসলভোদস্কের বড় পার্কের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে যাচ্ছিল ক্রাসনিয়ে কামনির দিকে।

'ঝরাপাতা যখন পায়ের নীচে সরসর করে তোমার ভাল লাগে?' একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করল। 'চমৎকার, তাই না?'

'প্রাণমন ভরে যাচ্ছে,' অন্যজন উত্তর দিল। 'এত সুন্দর এখানে...'

প্রথমজন মস্কোর লোক, সেখানকার এক বিরাট কারখানার ফোরম্যান। সে মাঝারি লম্বা, তার রোগা চেহারা আর চুল হালকা রঙের। তার স্বভাব ছিল স্বচ্ছ পরিষ্কার, নীল চোখের মনোযোগী দৃষ্টি তার সঙ্গীর ওপর অনেকক্ষণ ধরে রাখা। আচার আচরণে সে ছিল সংযমী যদিও বিশেষভাবে লক্ষ্যে পড়ত ছোঁয়াচে হাসিখুশী স্বভাব। এ ছিল এমন আকর্ষণকারী ব্যক্তিত্ব যে তার সঙ্গে কথা বললে যেন আপনা থেকেই মন খুলে যায়, অনুভূতি আরো গভীর হয়, চিন্তাধারা পরিষ্কার হয়।

---

* কিসলভোদস্ক — ককেশাসের একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। — সম্পাঃ

** নারজান গ্যালারী — নারজানের খনিজগুণ সম্পন্ন জলে স্বাস্থ্যোদ্ধারকারীদের স্নান করার জন্য এই গ্যালারীতে আছে কতকগুলি স্নানঘর। — সম্পাঃ

দ্বিতীয় জন আজেরবাইজানের লোক, আর্কিটেক্ট। পঁয়ত্রিশবছরবয়সী বাকুর এই অধিবাসী এর মধ্যেই বহু জায়গায় ঘুরেছে: ছিল খাবারভস্কে*, মুরমানস্কে**, মিলিটারী সার্ভিসে ছিল পামিরে, ফিনল্যাণ্ড ফ্রণ্টে লড়াই করেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সে বার্লিনে লড়াই করেছে। আর্কিটেক্ট-এর ফোরম্যানের সঙ্গে কোনোই মিল ছিল না, না মুখচোখের চেহারায়, না স্বভাবে। লম্বা, সুঠাম চেহারা, ভাবব্যঞ্জক মুখচোখ, সবসময়ই সে চিন্তামগ্ন। তবুও এই দুই বিভিন্ন চরিত্রের লোকের মধ্যে যথেষ্ট মিল — দু'জনেরই জীবন সম্পর্কে অগাধ অভিজ্ঞতা আর জীবনের এই অভিজ্ঞতা নিয়ে গুছিয়ে গল্প বলতেও তারা দু'জনেই ওস্তাদ।

কিসলভোদস্কে তাদের পরিচয় হয়। একই দিনে তারা স্যানাটোরিয়ামে এসে পেঁছায়, একই সঙ্গে তাদের নাম রেজেস্ট্রি করা হয়। তার পরে একই সঙ্গে বসে অপেক্ষা করছিল কখন ডাক্তারের ঘরে ডাক পড়বে। এই সময়ই তারা আলাপ করে নেয়। ডাক্তারের ঘর থেকে ফোরম্যান বেরোবার পর, আর্কিটেক্ট ঢুকল সেখানে। ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে দেখে সেখানে ফোবম্যান বসে আছে, তারা দু'জনেই খুব খুশী হল।

'আরে, চেনা মুখ যে! আমরা তার মানে একসঙ্গে থাকব।' খুশীভাবে বলল ফোরম্যান।

তারা সব জায়গায় একসঙ্গে যেত, নারজানের জলে চান করতে, খেতে, বেড়াতে। সাধারণত তারা সন্ধ্যাবেলাগুলি কাটাত রেস্টরুমে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের সঙ্গে আরো কয়েকজন লোক যোগ দিল। রাত্রের খাবার পরে সবাই যখন রেস্টরুমে জড় হত, তারা দু'জনে পড়ত, ডোমিনো খেলত আর সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেত গল্প করে। তারা তখন গল্পে এমন মশগুল হয়ে যেত যে যখন শুতে যাবার সময় আসত কিছুতে আর বিদায় নিতে ইচ্ছে করত না ভাবটা ছিল যেন, যে বিষয়ে তারা এখন আলোচনা করছিল সেই আলোচনা আর কখনো এমন জমে উঠবে না। কিন্তু এমন চিন্তার কোন কারণ ছিল না — তারা সেই বিষয়ে আবার ফিরে আসত এবং আরো উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা চলত। দিনের বেলা ফাঁকা সময়গুলিতে তারা পার্কে

---

* খাবারভস্ক্ — সোভিয়েত সুদূর প্রাচ্যের এক শহর। — সম্পাঃ

** মুরমানস্ক্ — উত্তর-মহাসাগরের তীরবর্তী একটি শহর। — সম্পাঃ

বেড়াত। ধীরে ধীরে চারপাশের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে তারা হাঁটত।

এখনও তারা সেইরকম বেড়িয়ে ফিরছিল। সূর্য পাহাড়ের আড়ালে ডুবে গেছে, সূর্যাস্তের শেষ আলোটুকুও মিলিয়ে গেছে। আকাশে উঁকি দিচ্ছে প্রথম তারাগুলি।

ক্রাসনিয়ে কামুনি পর্যন্ত এসে তারা গতি কমিয়ে দিল, উঁচুতে ওঠার ফলে তারা হাঁফিয়ে গিয়েছে, এবার তারা বাঁদিকে ঘুরে স্যানাটোরিয়ামের দিকে চলল।

ফোরম্যান আর্কিটেক্ট-এর দিকে মুখ তুলে দেখে নিয়ে বলল: 'আজ রাত্রের খাবার পরে দাবা খেলা যাক্, আমি তোমায় হারাব।'

আর্কিটেক্ট ক্লান্তভাবে বলল: 'দেখা যাবে।'

ফোরম্যান বন্ধুর এই উত্তর থেকে বুঝতে পারল যে আজ খেলা জমবে না। আর সত্যি যতই চেষ্টা করুক না কেন সে কিছুতেই সঙ্গীকে উত্তেজিত করে তুলতে পারল না। তার নিজেরও খেলার ইচ্ছে চলে গেল। প্রথম দান খেলার পরে কেউ আর ঘুঁটিগুলো আবার সাজাতে আরম্ভ করল না। ঘুঁটিগুলো এলোমেলোভাবে পড়ে রইল আর দুই বন্ধু গল্প আরম্ভ করে দিল।

জীবন এখন কত সুন্দর, মানুষের দীর্ঘদিন বাঁচার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। তারপরে তারা ভাবল বাঁচার আসল অর্থ কি? মানুষের কেমন ভাবে বাঁচা উচিত? কার সম্বন্ধে বলা যায় যে নিজের জীবনে সুখ পেয়েছে?

প্রত্যেকেই নিজের চিন্তাধারা অনুযায়ী এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিচ্ছিল। আর্কিটেক্ট বলল:

'জীবন হল সৃষ্টি। মানুষকে সৃষ্টি করতেই হবে, যাতে তার বলার অধিকার থাকে যে সে বেঁচে আছে। আর মানুষের সুখ? সেও সৃষ্টির মধ্যেই।'

'কিন্তু কি মানুষকে সৃষ্টির জন্য প্রেরণা দেয়?' জিজ্ঞাসা করল ফোরম্যান।

আর্কিটেক্ট সংক্ষেপে উত্তর দিল: 'জীবন নিজেই। যে বেঁচে আছে, সে সৃষ্টি না করে পারে না।'

'সেকথা ঠিকই, কিন্তু এমন লোকও কি নেই, যারা অনেক দিন বেঁচে থাকে কিন্তু সমাজ তাদের থেকে কোন উপকারই পায় না?'

'তাহলে তোমার ধারণায় বাঁচার অর্থ কি ?'

'আমার মতে, সে যে একটা বড় উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করছে সেই সচেতনতাই মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তোলে। আমি মাতৃভূমিকে ভালবাসি, আমি চাই যে মাতৃভূমি স্বাধীন হোক, সুখী হোক। যদি এই আকাঙ্ক্ষা থাকে আমার চিন্তাধারায়, আমার হৃদয়ে, আমার রক্তে, তো আমি সৃষ্টি না করে পারব না। তখনই আমি সুখী। কোন একটা কিছু বিরাট মঙ্গলজনক কাজ করার প্রচেষ্টাই মানুষকে বড় করে তোলে।'

আর্কিটেক্ট শুনতে শুনতে যেন আরো বেশী করে চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। মনে হতে পারে সে অবাক হয়ে গেছে এই দেখে যে সাধারণ শ্রমিক জীবনের প্রকৃত অর্থের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। আর্কিটেক্ট যেন অন্যেরা তার মনের কথা বুঝে ফেলার ভয়ে তাড়াতাড়ি করে বলল:

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, যে মানুষ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই বেঁচে থাকে, তার কাছে কিই বা আশা করা যায় ?'

কিন্তু ফোরম্যান ধোঁয়াটে কথাবার্তা পছন্দ করত না।

'উদ্দেশ্য বিভিন্ন ধরণের হতে পারে,' প্রতিবাদ করল সে। 'সেই সব উদ্দেশ্য যা সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলসাধন করতে পারে সেগুলিই মানুষকে বড় করে তোলে। তাই ভাবি: আমাদের জনগণ কেন এত উন্নত হয়ে উঠেছে ? কত বড় বড় নিষ্ঠুর আক্রমণের সম্মুখীনই না হতে হয়েছে তাকে। শত্রুরা যেন কাকের মত হাজারে হাজারে উড়ে এসেছে ! ইংল্যান্ড, আমেরিকা আর জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা — সবাই এই দেশটিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। আর হিটলারবাহিনীর আক্রমণ ! অন্য কোন দেশের জনগণ এমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারত আর তার মাধ্যমে নিজের শক্তি বাড়িয়ে নিত ? কোথায় তুমি এর কারণ খুঁজবে ? সোভিয়েত জনগণ কোথা থেকে এই শক্তি পায় ? তার স্বাধীনতা, সুখ লাভের প্রচেষ্টা মূর্ত হয়ে ওঠে সাম্যবাদের ধারণায়। এই হল আমাদের জয়লাভের গোপন কথা।'

আর্কিটেক্ট পকেট থেকে বার করল লাল, কাঁচের মত চকচকে সিগারেটের বাক্স, ফোরম্যানের দিকে বাড়িয়ে ধরল। কোন কথা না বলে ফোরম্যান সিগারেট নিল। দু'জনেই সিগারেট খেতে লাগল। সিগারেট দাঁতের ফাঁকে ধরে আর্কিটেক্ট চিন্তায় ডুবে গেল। ফোরম্যানও চুপ করে ছিল।

'আমি তোমার মত সমর্থন করি।' কথা আরম্ভ করল আর্কিটেক্ট। 'আজকের দিনে সাম্যবাদের ভাবধারার জন্য কাজ করার মধ্যেই মানুষের

প্রকৃত সুখ। যে সাম্যবাদের প্রাসাদ তৈরীতে এমনকি একটা ইঁটও এনে বসিয়েছে, সেই অমর হবার যোগ্য। যারা এমন আদর্শের জন্য কাজ করে তারা মরে না।'

ফেরম্যান ছাইদানির ধারে সিগারেটটা রেখে আবেগের সঙ্গে বলল:

'এটা তুমি ঠিক বলেছ। দেখ, কেউ হয়ত বেঁচে আছে পঞ্চাশ বছর, আর তার সম্বন্ধে বলতে গেলে পঞ্চাশটা শব্দও বলা যায় না। আর একজন হয়ত মাত্র কুড়ি বছর বেঁচে ছিল কিন্তু তার সম্বন্ধে একটা গোটা বই লেখা যায়।

ফেরম্যান নিভে-আসা সিগারেটের দিকে দেখল, যেন আর একবার সিগারেটে টান দিতে চাইল কিন্তু কি ভেবে ছুঁল না। ধূমায়ান সিগারেটের দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে থেকে সে চিন্তামগ্নভাবে বলল:

'আমি তোমাকে একজনের কাহিনী শোনাতে চাই। যখন আমি তার কথা মনে করি... আচ্ছা শোন...'

মস্কোর আশপাশের বনগুলি বরফে ঢেকে গেছে। উঁচু উঁচু দেবদারু গাছগুলির শাখাপ্রশাখাগুলি জোর হাওয়ায় নড়ছিল আর আওয়াজ তুলছিল। হাওয়া যেন বিরাট এক দৈত্যের মত মুখের ওপর মুঠি মুঠি বরফ ছুঁড়ে মারছিল। এই রকম আবহাওয়ায় স্কাউট আলেকসান্দর নিকিশিন বুকের কাছে স্টেনগানটা চেপে ধরে গাছের ফাঁকে ফাঁকে আস্তে আস্তে হাঁটছে। সুড়ঙ্গঘরটিতে সে আর বসে থাকতে পারছে না। চব্বিশ ঘণ্টা হল সে কোন কাজের নির্দেশ পায় নি। সেই সকালে লড়াই আরম্ভ হয়েছে, এখনও থামে নি, আর তার প্রতি আদেশ দেওয়া হয়েছে: 'অপেক্ষা কর।' কম্পিত হৃদয় নিয়ে নিকিশিন গুলির আওয়াজ শুনছিল, আগুনের ঝলকে আলোকিত হয়ে ওঠা মেঘ দেখছিল আর ঐ সুড়ঙ্গঘরটির কাছে সমানে পায়চারি করছিল। তার সোনালী কোঁকড়ান চুলের ওপর ঢাকা দেওয়া ধূসর রঙের টুপিটা হচ্ছিল যেন বরফের গোলা। তার হাল্কারঙের সরু ভ্রূদুটি, লালচে কপাল, লম্বা ধূসর কোট, হাইবুট — সমস্ত কিছু বরফে একেবারে সাদা। খালি স্টেনগানের উপর বরফ ছিল না, মাঝে মাঝে সে কোটের হাতা দিয়ে তার ওপর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলছিল। তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন চোখগুলি সমানে আশেপাশে নজর রাখছিল।

সে ধীরে ধীরে হাঁটছিল, কিন্তু হাঁটার ধরণে তার শক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল।

পায়ের নীচে বরফ মড়মড় করে ভাঙছিল, এই আওয়াজটা, মনে হয়, তার ভালই লাগছিল। তার স্বাপ্নিল মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে যেন তার কোন গোপন স্বপ্ন মূর্ত হচ্ছে: এই ঠান্ডা, হাড় কাঁপিয়ে দেওয়া বাতাস, এই অবিরাম বরফ পড়া, যা কোন কোন জায়গায় দু' তিন মিটার উঁচু হয়ে উঠেছে — এসবই সে দারুণ উপভোগ করছিল।

জন্ম তার সাইবেরিয়ায়। কুড়ি বছর তার কেটেছে সাইবেরিয়ার চমৎকার বনগুলির মধ্যে। দারুণ শীত, তুষারঝড় এসবকেই সে ছোটবেলা থেকেই ভালবাসতে শিখেছে। তাই ১৯৪১ সালের মস্কোর উপকণ্ঠের এই শীত, তুষারঝড় তার হৃদয়ের কতকগুলি তারকে নরমভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে, অনেক স্মৃতি মনে করিয়ে দিচ্ছে।

তার মনে পড়তে লাগল ছেলেবেলার চিন্তাহীন দুষ্টুমিভরা দিনগুলি। ঠাকুমার আদর আর প্রশ্রয়, সে মুরগীর ঘরে ঢুকে মুরগীদের জ্বালাত আর বিরক্ত করত লাল পাখনাওয়ালা লড়ুয়ে মোরগটাকে, এমনকি মারপিট করত তার সঙ্গে; চেনে বাঁধা রাগী পাটকিলে রঙের কুকুরটার পিঠে বসিয়ে দিত বড় রাগী কালা বিড়ালটাকে, তেজী ঘোড়াটাকে লাঠি দিয়ে খোঁচাত। বাবার বকুনি, মা'র বোঝান কোন কিছুই তার এই দুষ্টুমি বন্ধ করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল এই, যে মোরগটা সবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাকে দেখলেই চুপ হয়ে বসে থাকত যেন মুরগী, কুকুরটা বিড়ালটাকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে বেড়াত, আর ঘোড়াটা হয়ে উঠল তার প্রিয় বন্ধু...

নিকিশিনের মনে হতে লাগল সে তার নিজের গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, কিংবা কাছের বনে এসেছে ভালুক শিকারের জন্য... এই সমস্ত স্মৃতি তাকে বাস্তব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল; সে আর গুলি বোমার আওয়াজ কিছুই শুনছিল না।

বাইলোরুশীয়াতে সে যুদ্ধের সম্মুখীন হয়, যখন সে মিলিটারী সার্ভিসে ছিল। তাদের ইউনিট পিছু হঠতে হঠতে মস্কোর কাছে এসে পেঁাছল। ঐ সময়ে সে একবার সামান্য আহত হয়। দু'সপ্তাহ ছিল হাসপাতালে, তারপরে আবার ফ্রন্টে চলে যায়। কোন কারণে ফ্রন্টের স্মৃতি তার ততখানিই প্রিয় যতখানি প্রিয় তার নিজের বাড়ীর স্মৃতি। কিন্তু একটা ঘটনা তাকে আজও দুঃখ দেয় — কম্যান্ডারের মৃত্যু। যুদ্ধের সময় সে অনেক মৃত্যুই দেখেছে কিন্তু কোনটাই তার মনে এত গভীর দাগ কেটে যায় নি। আক্রমণের সময় কম্যান্ডার বুকে আঘাত পান। নিকিশিনের কোলেই তিনি

শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন, নিকিশিন কিছুতেই ভুলতে পারে না তার চোখদুটিতে জ্বলজ্বল করছিল বাঁচার কি ইচ্ছা... এ হল মাত্র পাঁচদিন আগের ঘটনা।

মৃত কম্যাণ্ডারের জায়গায় সার্জেণ্ট ইভাশ্চেঙ্কোকে নেওয়া হল। সে উক্রেনের লোক, বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স, মাঝারি লম্বা, শক্তপোক্ত চেহারা। এই নতুন কম্যাণ্ডারের মুখে সবথেকে বড় যে প্রশংসার কথা শোনা যেত তা হল 'সে মাটি ধন্য, যেখানে তোমার জন্ম!' কিন্তু এই প্রশংসা তার কাছ থেকে এমনি এমনি শোনা যেত না, তার জন্য যোদ্ধারা জীবনপণ করে বিপদের মধ্যে এগিয়ে যেত। কিন্তু নিকিশিনের নতুন কম্যাণ্ডারকে ভাল লাগত না, যেন তার চোখের দৃষ্টি বলছে: 'আমায় ঠকাতে পারবে না, আমি তোমার ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি।' নিকিশিনের ভাল লাগত না যে কম্যাণ্ডার সবার সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক ব্যবহার করে। হয়ত তাকে অনেকবার ঠকতে হয়েছে, তাই সে আর কাউকে বিশ্বাস করে না।

হঠাৎ ভীষণ জোরে বিস্ফোরণের শব্দে তার চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বিস্ফোরণটা সারা পৃথিবী যেন কাঁপিয়ে দিল। হঠাৎ একেবারে কানের কাছে সে শুনতে পেল:

'আমাদের 'কাত্যুশা'* দীর্ঘজীবি হোক!'

নিকিশিন তাড়াতাড়ি ঘুরে দেখল — তার কাছে ইভাশ্চেঙ্কো দাঁড়িয়ে আছে। কি চুপি চুপি এসেছে!.. নিকিশিন ভাবল তাকে এবার তিরস্কার করা হবে, কারণ স্কাউটের সব সময় সজাগ থাকা উচিত, এমনকি পাখীর থেকেও সজাগ, কিন্তু ইভাশ্চেঙ্কো তো যথেষ্ট সতর্ক না হওয়ার জন্য কিছু বলল না। বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনে সেদিকে ইঙ্গিত করে সে কেবল জিজ্ঞাসা করল:

'কেমন, নিকিশিন?'

নিকিশিনের চোখ চক্‌চক্ করে উঠল যেন 'কাত্যুশার' জ্বলন্ত শিখা তাদের জ্বালিয়ে তুলেছে।

'জার্মানগুলোর হয়ত এতক্ষণে ভয়ে হাতপা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে, কমরেড সার্জেণ্ট!'

'ঠিক! ঠিক! যারা আমাদের দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, তাদের

---

* 'কাত্যুশা' — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জেট মর্টারকে এই নামে ডাকা হত। — সম্পাঃ

একটু শিক্ষা হোক। যারা আমাদের দেশ লুঠতে চায় তারা নিপাত যাক!'

'নিপাত যাক!' এই কথাটি যেন নিকিশিনের কানে আদেশের মত শোনাল, সে তার অস্ত্রটা আরো শক্ত করে ধরল।

দেবদারু গাছগুলির আড়ালে শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চের দিক থেকে দারুণ জোরে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হল। সার্জেণ্ট নিকিশিনের কাছে এগিয়ে এসে বলল:

'ওহে সাইবেরিয়ার লোক, ভয় পেলে নাকি?'

নিকিশিন সতর্ক হয়ে গেল। যেন মনে হল এ কথা তাকে বলল অন্য কোন লোক। একটু আগেই কম্যাণ্ডার তার সঙ্গে কথা বলছিল সম্মান দেখিয়ে, তাকে বিশ্বাস করে, আর এখন হঠাৎ তার গলায় শোনা গেল অজানা কি এক সুর, যেন তার প্রতি সন্দেহ। নিকিশিন তার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে একটু রাগের সঙ্গে উত্তর দিল:

'ঐ কথাটার মানে আমি বুঝি না, কমরেড সার্জেণ্ট!'

'কোন কথা?'

'ঐ যে 'ভয়' কথাটা!'

দেবদারু বনের আড়ালে লড়াই খুব জোর চলতে লাগল। অন্ধকার নামার ফলে গোলাবর্ষণের আলোর ঝলক আরো বেশী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

নিকিশিন প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। অধৈর্যের সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করল:

'কমরেড সার্জেণ্ট, আমরা কখন আরম্ভ করব? আর যে পারা যায় না...'

'শীগগিরী। খুব শীগগিরী, নিকিশিন।' বলল ইভাশ্চেংকো।

সে অনেকক্ষণ চুপ করে গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে লাগল যেন নির্ধারণ করার চেষ্টা করতে লাগল কারা জয়ী হতে চলেছে। তারপর সে নিকিশিনের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল: 'নিকিশিন, বল দেখি, তুমি এত নির্ভীক হলে কি করে?'

এবার তার কণ্ঠস্বরে আর অবিশ্বাস, সন্দেহের সুর শোনা গেল না। এই কঠোর কণ্ঠস্বর, যাতে আছে আত্মপ্রত্যয়, নিকিশিনের ভাল লাগল।

নিকিশিন মাথা তুলে মস্কোর ওপরের আকাশের দিকে তাকাল, অস্ত্র থেকে হাত সরিয়ে দু'হাত ছড়িয়ে যেন সমস্ত বনটিকে, বনের অদূরে তাদের গর্বের রাজধানী মস্কোকে আলিঙ্গন করতে চাইল।

'এই সবকিছু যা আমাদের ঘিরে আছে: এই মাটি, মস্কো, সোভিয়েত জনগণ এসবই আমাকে নির্ভীক করে তুলেছে, কমরেড সার্জেণ্ট!'

ইভাশ্চেঙ্কো হঠাৎ দু'হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করল।

নিকিশিন আনন্দে যেন নিজেকে ভুলে গেল। তার বুকের ভারটা নেমে গেল। তার নিজেকে মনে হল খুব হাল্কা, যেন এখুনি সে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে।

তারপর ইভাশ্চেনকো নিকিশিনকে নিয়ে গেল সুড়ঙ্গঘরটিতে যেখান থেকে সমস্ত নির্দেশাদি দেওয়া হয়। রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার বসে ছিলেন সেখানে, নিকিশিন তাঁকে অভিবাদন জানাল। কম্যাণ্ডার তাকে বসতে বললেন। নিকিশিন চারপাশে তাকিয়ে দেখতে পেল যে সেখানে তার বন্ধু আসলান আছে। রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার তাদেরকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন — দু' ঘণ্টার মধ্যে 'জিভ' খুঁজে বার করতে হবে — বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন শত্রুদের অবস্থানের জায়গাগুলি এবং কেমন করে সেখানে গিয়ে পেঁছাতে হবে।

'সব পরিষ্কার ?'

নিকিশিন, আসলান দু'জনেই লাফিয়ে উঠে স্যালুট ঠুকে বলল:

'পরিষ্কার, কমরেড কম্যাণ্ডার। 'জিভ' খুঁজে আনব।'

কম্যাণ্ডার এগিয়ে এসে ওদের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

'যাত্রা শুভ হোক !'

দশ মিনিট পরে নিকিশিন আর আসলান নির্দেশিত পথে চলতে লাগল আর শীঘ্রই তারা রাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া পড়ে এলো, মেঘ কেটে যেতে লাগল, সেই মেঘের ফাঁক দিয়ে দেখা দিল পরিষ্কার নীল আকাশ আর তারার ঝিকিমিকি। চারদিক মিষ্টি জ্যোৎস্নায় ভরিয়ে দিয়ে চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে।

নিকিশিন আর আসলানের বন্ধুত্বের শুরু ফ্রণ্টে, তাদের স্বভাব ছিল একে অপরের পরিপূরক। নিকিশিন কম কথা বলত, কিন্তু সে লোকের সঙ্গ ছাড়া থাকতে পারত না... আর আসলান সব সময় খুঁজত কার সঙ্গে একটু গল্প করা যায় আর গল্প করার বিষয়েরও তার অভাব হত না। আসলান সত্য ঘটনা এমন আগ্রহজনকভাবে বলত ! নিকিশিনের ছিল বিরাট গুণ — ধৈর্য ধরে শোনা। চুপ করে চোখভর্তি আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে সে শুনত। আসলান বলত বারুদিন এলাকার গ্রীষ্মকালের কথা, চমৎকার শরৎকালের কথা, সাদা তুলো, মিষ্টি, রসালো খরমুজের কথা, তাদের বিয়ের

নিয়মকানুনের কথা। এই সমস্ত গল্পগুলি নিকিশিনের কাছে মনে হত যেন প্রাচ্যের কবিতা।

আসলানের চেহারাও নিকিশিনের ভাল লাগত। প্রথমবার দেখার সময় তার মনে হয়েছিল যে তার উচ্চতা বেশ কম। 'কী করে যে ও ফ্যাশিস্টদের সঙ্গে পেরে উঠবে?' ভেবেছিল নিকিশিন। কিন্তু পরের দিন যখন সে আসলানকে বেল্ট ধরে মাটি থেকে টেনে তুলতে চেষ্টা করেছিল, তখন বুঝতে পেরেছিল যে আসলান প্রচণ্ড শক্তিমান আর গ্রানাইট পাথরের মত ভারী। তখন নিকিশিন তার মাংসল ঘাড়টা ধরে নুইয়ে মাটিতে ঠেকিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু বুঝেছিল যে আসলান কেবল শক্তিশালীই নয় সে ক্ষিপ্র ও চতুরও বটে। বুনো বেড়ালের মত ফসকে যায়। এরপর থেকে নিকিশিন তাকে সম্মান করতে লাগল।

আসলানেরও ভাল লাগত নিকিশিনকে। তার লম্বা চেহারা, শক্তিমান হাতগুলি, সুনিশ্চিত পদক্ষেপ, চওড়া কপাল, তার নীল চোখ — সবই ভাল লাগত।

সাইবেরিয়ার দুঃসহ আবহাওয়া, তার বন আর নদীর গল্প, তার সাহসী লোকেদের কাহিনী এসবই আসলানের কাছে রূপকথা বলে মনে হত। বন্ধুকে একটার পর একটা প্রশ্ন করে আসলান তাকে বাধ্য করত এই সমস্ত গল্প করতে। একবার নিকিশিন পনেরো মিনিট একটানা কথা বলে, তারপর হঠাৎ থেমে হেসে উঠল:

'তুমি আমাকে বকাটে বানিয়ে ছেড়েছে!'

নিকিশিনের চরিত্রের আর একটা দিকও ভাল লাগত আসলানের: সে শক্ত মানুষ, তার ইচ্ছার শক্তি অনমনীয়। তার পথ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। আসলান দুর্বল চরিত্রের লোকেদের পছন্দ করত না আর যে সব লোক হাওয়া বুঝে মত বদলায় তাদের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করত।

অনেকক্ষণ আগেই রাত্রি নেমেছে। মেঘ কেটে গিয়ে আরো অনেকখানি আকাশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তার মাঝখানে চাঁদ, পুরো বনটিকে আলোকিত করছে। তবুও দেবদারু গাছগুলির গুঁড়ির আড়ালে সন্দেহজনক ছায়াকে ভালভাবে বুঝতে হলে ভাল দৃষ্টিশক্তি থাকা দরকার। ঠাণ্ডা ক্রমশ বাড়তে লাগল, তা সত্ত্বেও, দুই বন্ধু এগিয়ে চলল একই উদ্দেশ্য নিয়ে, তাদের উপর অর্পণ করা দায়িত্ব পালন করার জন্য।

স্কাউটের কাজ কঠিন আর বিপজ্জনক ঠিকই, কিন্তু তাতে আকর্ষণও

আছে। তাকে এমন এমন অন্তুত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় যার থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে দরকার অসম্ভব বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রতা। কিন্তু বিভিন্ন দুঃখকষ্টের সঙ্গে সঙ্গেই স্কাউটের জীবনে আনন্দও আছে। সে হল সৈন্যদলের চোখ, তার সজাগ কান, সে হল শত্রুর হৃদয়ে অবিরাম সঙ্গীনের খোঁচা। স্কাউটের জীবনের প্রথম কাজটাই তাকে জানিয়ে দেয় সেনাদলে তার প্রকৃত স্থান কোথায় আর সেই কাজ তার ধ্যান ধারণাকে পুরোপুরি অধিকার করে নেয়। এর বাইরে নিজের জীবনকে সে কল্পনাও করতে পারে না। শত্রুর গোপন তথ্য জেনে নেওয়া, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে না পারলে তার শান্তি নেই। অজানা পথের বিপদকে স্কাউট ভয় পায় না, সেই বিপদ তাকে কেবল সংগ্রামের জন্য উত্তেজিত করে তোলে।

নিকিশিন, আসলানও এইরকমই, ক্লান্তি কি জিনিস জানত না। প্রত্যেকটি নতুন কাজ যদি খুব কঠিন হত তবে তা তাদের শক্তিকে আরো দশগুণ বাড়িয়ে তুলত। তারা ইউনিট থেকে আরো এগিয়ে চলল, কান সজাগ রেখে প্রতিটি খসখস আওয়াজ শুনে, প্রতিটি ছায়া লক্ষ্য করে। তাদের সাহস আর ক্ষমতা সৈন্যদের আশা দিত আক্রমণের সাফল্য সম্পর্কে, তাদের মধ্যে আনত লড়াইয়ের উদ্দীপনা। তারা বলত:

'আসলান, নিকিশিনের সঙ্গে মরতে যেতেও আমরা রাজী।'

তারা হাঁটছিল হাল্কা কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে।

'সাশা, আমার বলতে ইচ্ছে করছে...' নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল আসলান।

সাশা মৃদু হেসে বলল: 'চালাও, আবার দিদিমার গল্প নাকি?'

'তা কেন? আমি ভাবছি যুদ্ধ মানুষের জীবনকে কেমন বিকৃত করে দেয়। যুদ্ধ ছাড়া মানুষের জীবন যেন চওড়া নদী — বয়ে চলেছে নিজের মনে। প্রতিদিন কোন কিছু নতুন, আনন্দের জিনিস জন্ম নিচ্ছে।'

'আমরা তো যুদ্ধ আরম্ভ করি নি...'

'আমরা আরম্ভ করি নি, কিন্তু শেষ তো আমাদের করতে হবে। আর যখন যুদ্ধ শেষ হবে, তুমি আবার নাতাশার সঙ্গে যৌথখামারে কাজ করবে। গ্রীষ্মকালে সময় করে তোমাদের ওখানে বেড়াতে আসব আর শরৎকালে তুমি নাতাশাকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসবে। এই বরফের মত সাদা আমাদের তুলোর খেত দেখবে। দেখবে, আমরা কেমন কাজ করি। আমরা যা সব কাজ আরম্ভ করেছি না!.. খাল-পুকুর কাটা, পাওয়ার স্টেশন... আঃ সমস্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রইল, চুলোয় যাক এই হিটলারবাহিনী!'

'এই ফ্যাশিস্টগুলোকে আমরা ভাগিয়ে দেব, তারপর বাড়ী ফিরে অসম্পূর্ণ সব কাজ শেষ করব, আরো নতুন কাজ আরম্ভ করব।'

'আমার ভয় হচ্ছে,দিদিমাকে আর দেখতে পাব না বাড়ী গিয়ে।'

'মরবে না,' গম্ভীরভাবে বলল নিকিশিন, 'মরার কোনো এক্তিয়ার নেই। তুমি ফিরবে — ওঁর সঙ্গে দেখা হবে।'

'আমি তাকে কত বুঝিয়েছি যে, আমাদের গ্রামেও বিদ্যুৎ আসবে, ইলেক্ট্রিক পাওয়ার স্টেশনের কাজ আরম্ভও হল, কিন্তু ঐ যুদ্ধ বাধল... সাশা, তোমাদের বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করবে ?'

ছেলেমানুষের মত জিজ্ঞাসা করা এই প্রশ্ন নিকিশিনকে স্পর্শ করল। নতুন করে সে যেন বুঝতে পারল যে আসলানের সঙ্গে সে এক বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ।

'নিশ্চয়ই বন্ধু, তোমাকে ছাড়া আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান হবেই না।'

'এই কাজ থেকে ফিরে আমি নিজেই নাতাশাকে চিঠি লিখব এ ব্যাপারে। তোমাকে বিশ্বাস কি... ঐ যে কথায় বলে না: চোখের আড়াল, মনের আড়াল।'

'না না, ফ্রণ্টের বন্ধুত্বে দূরত্ব কোন বাধা নয়।'

'সেকথা ঠিকই, তাহলেও আমি নাতাশাকে লিখব।'

'লেখ না, আমি তো বাধা দিচ্ছি না। কেবল তখন ফসকে যেতে পারবে না, সে কোন অজুহাতই বুঝবে না — খাল, পাওয়ার স্টেশন, তুলো কোন কিছুই না — আসতে হবেই !'

দু'জনেই চিন্তায় ডুবে গেল। দু'জনেই কল্পনায় সেই সব সুখের দিনের ছবি দেখতে লাগল। আসলান ভাবতে লাগল কেমন করে ও নিকিশিনের কাছে বেড়াতে আসবে আর নিকিশিন পুরনো সংগ্রামী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার চিত্র মনে মনে কল্পনা করতে লাগল।

সার্চলাইটের আলো মেঘ ফুঁড়ে যাচ্ছে, কাছে কোথাও কখনও একঘেঁয়ে, কখনও থেমে থেমে মেশিনগানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'সাশা, ফ্রণ্টলাইন কাছেই, এবার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেতে হবে।' বলল আসলান আর সতর্কভাবে আড়চোখে বন্ধুর বড়সড় চেহারার দিকে তাকাল।

'তোমার পক্ষে তো গুঁড়ি মেরে যাওয়া কিছু না, আর আমার যা চেহারা !' যেন আসলানের মনের ভাব বুঝতে পেরেই নিকিশিন ঠাট্টা করল।

একটা হাল্কা সরসর আওয়াজ শোনা গেল, কোনো একটা দেবদারু গাছের ওপর থেকে এক দলা বরফ ঝরে পড়ল।

তারা শুয়ে পড়ল, আসলান হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে এগিয়ে চলল, নিকিশিনও বরফের ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে এগিয়ে চলল। আসলানের সজাগ কান জার্মান ভাষা শুনতে পেল, তারা কি জার্মানদের ট্রেঞ্চের কাছে পেঁছে গেল নাকি? গাছের গুঁড়ির সঙ্গে সেঁটে থেকে তারা উত্তেজিতভাবে শুনতে লাগল। কথাবার্তা আরো পরিষ্কার শোনা যেতে লাগল। আরো কয়েক মিনিট পরে দেবদারু গাছের আড়াল থেকে জার্মানদের বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। তারা বেশ জোরে জোরে কথা বলতে বলতে স্কাউটদের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল।

আসলান ও নিকিশিন নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাদের কথা শুনতে লাগল, কিন্তু একবর্ণও বুঝতে পারল না; তারা জার্মান ভাষা সামান্য জানে আর এরা খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছিল। ওই যে ওরা ছায়ার মত এক এক করে গাছের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওরা পাঁচজন। সবার পিছনে দু'জন: একজন লম্বা, রোগা, অন্যজন অতটা লম্বা নয়, রোগা। সবার সামনে যাচ্ছে একজন মোটা হোঁৎকা জার্মান। মাঝে মাঝে সে থেমে বাকীদের কী যেন বলছে আর অন্যেরা তার পিছু পিছু আসছে। মনে হচ্ছে, হোঁৎকাটা এই দলের নেতা। নিকিশিন আসলানের একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল ফিসফিসিয়ে:

'প্রথম তিনজনকে আমি নেব!'

আসলান উত্তরে তার কনুইয়ে চাপ দিয়ে জানিয়ে দিল যে সে বুঝেছে। শত্রুর দল তাদের পর্যন্ত পুরোটা না এসে, বাঁদিকে ঘুরল। এইসময় হঠাৎ মুটকোটা বরফের স্তূপের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে একেবারে বরফের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবে গেল। অন্যরা তাকে সাহায্য করার জন্য ছুটে এল। হঠাৎ আসলানের মাথায় কি চিন্তা খেলে গেল, সে নিকিশিনকে ফিসফিস করে বলল, 'এসো, আরম্ভ করে দিই!' আর প্রায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিকিশিন তাকে থামিয়ে দিল:

'এখানে না, এখানে ট্রেঞ্চ খুব কাছেই। আর একটু দূরে সরে যাক।'

হিটলারবাহিনী আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে লাগল। তারা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতেই পারে নি যে সোভিয়েত স্কাউট একেবারে জার্মানদের ট্রেঞ্চ পর্যন্ত চলে আসতে পারে। খালি নিজেদের ট্রেঞ্চের কাছ থেকে একটু

বেশী দূরে চলে যাওয়ায় তারা কথা বলা বন্ধ করে সতর্কভাবে চলতে লাগল। এখন দলের আগে আগে চলেছে সেই দু'জন যারা আগে পিছনে পড়ে থাকছিল। আসলান ও নিকিশিন গুঁড়ি মেরে তাদের অনুসরণ করছিল। যখন তারা এইভাবে যেতে যেতে বেশ দূরে এগিয়ে গেল আমাদের সীমানার দিকে, নিকিশিন আসলানের হাত ধরে ফিসফিসিয়ে বলল:

'দুদিক থেকে আক্রমণ করব, তুই বাঁ দিক থেকে, আমি ডান দিক থেকে, আমি সিগন্যাল দেব।'

নিকিশিন বলা শেষ করার আগেই আসলান বিড়ালের ক্ষিপ্রতায় বাঁ দিকে গেল গুঁড়ি মেরে। তারা আরও একটু এগিয়ে গেল এই ভাবে কিন্তু তার পর নিস্তব্ধ হয়ে গেল... জার্মানরা থেমে গেছে আর ফিসফিস করে কি বলাবলি করছে। নিকিশিন জানত যে স্কাউটের কাজে প্রয়োজন বিরাট ধৈর্য। ও জানত যে আসলান ছটফটে স্বভাবের। তাই ও আসলানকে সতর্ক করে দিল যতক্ষণ না ও নিজে নড়ে ততক্ষণ যেন আসলানও স্থির হয়ে থাকে। সামান্য অসতর্কতা আর তাড়াহুড়ো সব নষ্ট করে দেবে। আর সেই সঙ্গে নিকিশিন চিন্তা করছিল যে তারা কেবল একটা 'জিভ' নয়, ধরে নিয়ে যেতে পারবে দুটো-তিনটে 'জিভ'। নিকিশিন একাগ্র হয়ে রইল। ফ্যাশিস্টদের ওপর থেকে চোখ একবারও না সরিয়ে, সে চারপাশটাও লক্ষ্য করতে লাগল আর আক্রমণের জন্য সুবিধেজনক মুহূর্তের অপেক্ষা করছিল। আসলানের দিকেও সে চোখ রেখেছিল। কিন্তু আসলানও স্থির ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে আছে যেমন শিকারী অপেক্ষা করে থাকে সেই মুহূর্তগুলিতে, যখন নেকড়ে ফাঁদের দিকে এগিয়ে আসে। জার্মানরা আবার চলা আরম্ভ করল, কিন্তু এবার একজন আর একজন থেকে বেশ দূরে দূরে। এইভাবে তারা বনের গভীর অংশে গিয়ে ঢুকল। আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থামল। তারা ভাবল, বোধ হয়, যে সেখানে তারা নিরাপদ। নিকিশিন আসলানকে ইসারা করেই চীৎকার করে বলল: 'হাত ওপরে তোল!' আর তারা শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুটকো জার্মান অফিসারটি সঙ্গে সঙ্গেই হাত ওপরে তুলল, তার কাছের দু'জন সৈন্যও হাত তুলল, তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ গুলি চালাল। কিন্তু সে আন্দাজে গুলি চালিয়েছিল। আসলান তার দিকে হাতবোমা ছুঁড়ল আর সে পড়ে গেল। আর একজনও গুলি করার চেষ্টা করতেই নিকিশিন তাকেও মেরে ফেলল। ইতিমধ্যে অফিসারটিও সম্বিৎ

ফিরে পেয়ে পিস্তল হাতে নিয়ে আসলানের দিকে লক্ষ্য করল কিন্তু গর্লি করতে পারল না। নিকিশিন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল আর তার হাত বেঁধে ফেলতে উদ্যোগী হল, কিন্তু মরটকো হঠাৎ নিকিশিনের বেল্ট ধরে ফেলল। দর্'জনেই বরফের মধ্যে পড়ে গেল। আরম্ভ হল দারর্ণ লড়াই। নিকিশিন এটাকে সহজেই মেরে ফেলতে পারত, কিন্তু সে তাকে জীবন্ত নিয়ে যেতে চায় কম্যাণ্ডারের কাছে। 'এ হল অফিসার। দামী দামী খবর দিতে পারে।' ভাবল সে। তাছাড়া নিকিশিন তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চাইছিল — দেরী করায় বিপদ হতে পারে — শত্রর্দের জন্য সাহায্য এসে পেঁছিতে পারে। নিকিশিন উঠে, সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে অফিসারকে উঁচুতে তুলে বরফের ওপর ছর্ঁড়ে ফেলল। সে পড়ল মাটিতে পিঠ দিয়ে। নিকিশিন তার ওপর বসে, তার মর্খটা মাটির দিকে ফিরিয়ে, তার হাত বাঁধতে লাগল। অফিসার গোঙাতে লাগল। এই সময় নিকিশিন আসলানের দিকে তাকিয়ে দেখে সে এক পা'বেঁকা জার্মানকে নিয়ে ‌পেরে উঠছে না।

'দাঁড়াও, এখর্নি আসছি। সাহায্য করব।' চেঁচিয়ে বলল নিকিশিন, অফিসারটির হাতদর্টি পিঠের পিছন দিকে ভাল করে বাঁধতে বাঁধতে।

কিন্তু আসলানের শক্তিতে কুলাল না, শত্রর্ তার হাত থেকে ফস্কে বেরিয়ে গেল। ভারসাম্য না রাখতে পেরে আসলান বরফের ওপর মর্খ থর্বড়ে পড়ে গেল। জার্মানটা তাকে বর্ট দিয়ে পিঠে আঘাত করল। নিকিশিন হাত-বাঁধা অফিসারকে ফেলে রেখে বন্ধর্কে সাহায্য করতে যাবে এমন সময় দেখে জ্ঞান ফিরে পাওয়া তৃতীয় ফ্যাশিস্ট ছর্রি হাতে নিয়ে গর্ঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে আসলানের দিকে। 'আঃ শয়তান!' বলে নিকিশিন স্টেনগান বার করল... কিন্তু তাকে গর্লি করতে হল না। সে এক অদ্ভর্ত দর্শ্য দেখতে পেল। জার্মান সৈন্য, রক্তাক্ত ছর্রি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ফ্যাশিস্টের মর্তদেহের ওপর... যখন আসলান আস্তে আস্তে উঠতে গিয়ে টলে গেল জার্মান সৈন্যটি তার হাত ধরে তাকে সাহায্য করল... নিকিশিনকে কাছে ছর্টে আসতে দেখে সে কাঁপা কাঁপা গলায় ভাঙা রর্শীতে বলল:

'কমরেড, আমিও শ্রমিক।'

আনন্দে উজ্জর্বল আসলান দাঁড়িয়ে ছিল কাছে। নিকিশিনের হর্দয় আবেগে মথিত হতে লাগল। তেমন সময় হলে ও এই জার্মানটিকে আলিঙ্গন করত, চুম্বন করত। কিন্তু দেরী করা উচিত নয়। অফিসারটির মর্খে রর্মাল

গংজে দিয়ে, তারা ফিরে চলল, অফিসারটিকে আর ঐ জার্মান শ্রমিকটিকে সঙ্গে নিয়ে।

ইভ্যশেচংকো আসলান আর নিকিশিনের সঙ্গে করমর্দন করল। তার রুক্ষ চোখগুলিতে খুশী ভাব দেখা গেল।

'যে সোভিয়েত মাটিতে তোমাদের দু'জনের জন্ম, তা' ধন্য। এখন যাও, বিশ্রাম নাও গিয়ে!'

বেরিয়ে যাবার সময় নিকিশিনের চোখাচোখি হল সেই জার্মান সৈন্যটির সঙ্গে। সে আবার জিজ্ঞাসা করল: 'শ্রমিক? কমরেড?'

'আমি শ্রমিক! আমি কমরেড!' খুশী হয়ে উত্তর দিল জার্মানটি।

নিকিশিন তাকে বন্ধুভাবে হাত নাড়ল।

কম্যাণ্ডারের এই সুড়ঙ্গঘরটি থেকে বেরিয়ে নিকিশিন আর আসলান সেই রাতের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে গেল। তাদের মাথার ওপর বিরাট ক্রিস্টালের মত স্বচ্ছ, নীল আকাশ, তার মাঝে মাঝে চকচক করছে তারাগুলি যেন তাদের পরিষ্কার করা হয়েছে, পালিশ করা হয়েছে। এইরকম আকাশ হয় কেবল শীতকালে যখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে আর খুব বেশী বরফ পড়ার পরে।

নিকিশিন ঐ আকাশের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিঃশ্বাস ফেলে বলল:

'আসলান, মনে আছে, তলস্তয় তাঁর 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসে নেপোলিয়নবাহিনীর মস্কো থেকে পলায়নের বর্ণনা দিয়েছেন। পরাজিত, ক্ষুধার্ত, পোশাকহীন... যখন আমরা ঐ ফ্যাশিস্ট অফিসারটিকে নিয়ে আসছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল এদেরও ঠিক সেই অবস্থা হবে। মনে আছে ঐ জায়গাটা?'

'মনে আছে। আরো মনে আছে লেভ নিকোলাইয়েভিচের কথাগুলি। তিনি লিখছেন: 'মস্কো — প্রতিটি রুশীর মাতৃসমান।' আমি ওখানে আর একটু যোগ করতাম হয়ত —মস্কো খালি রুশীদেরই নয়, সমস্ত জনগণের যারা স্বাধীনতাকে মূল্য দেয় তাদের প্রত্যেকেরই মাতৃসমান।'

কিছুক্ষণ তারা চুপ করে চলতে লাগল, যেন প্রত্যেকে নিজের মনে মনে কথা বলতে লাগল। প্রত্যেকবারের মত এবারও আসলান নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল:

'আঃ সাশা! সেই একই কথা ভাবছি খালি। ভাবছি এই আকাশের নীচে কী সুন্দর জীবনই না গড়ে তোলা যায়।'

নির্কিশিন হেসে ফেলল:

'আরে বন্ধু, তুমি এত চাঁদ তারা দেখতে আরম্ভ করে দিলে, প্রেমেট্রেমে পড়লে নাকি ? এখানে তো দেখছি একটা মেয়ে তোমার থেকে আর চোখ সরাচ্ছে না।'

'তোমায় যাই বল না কেন, তুমি হয় কোন মেয়ে নয় আমার দিদিমার কথা টেনে আনবে। আমি একেবারে অন্য কথা ভাবছি। ঐ যে জার্মান শ্রমিক। ওর কি ভালভাবে বাঁচার প্রয়োজন নেই ? পৃথিবীর সব লোক ভালভাবে বাঁচতে চায়। আমি, সাশা, একথাই বলতে চাচ্ছি।'

'আসলান, তোমার কি মনে হয়, যে জার্মান শ্রমিকটি প্রথম সুযোগেই ফ্যাশিস্টকে খুন করল সে পুরনো জীবন ধারায় ফিরে যেতে চাইবে ? নিশ্চয়ই না ! সে নতুন জীবন গড়তে চেষ্টা করবে। আমরা তাকে এতে সাহায্য করব, তাই না ?'

'নিশ্চয়ই করব,' দৃঢ়ভাবে বলল আসলান তারপর একটুখানি চিন্তা করে বলল: 'সাশা যদি তুমি আর আমি বার্লিন পর্যন্ত গিয়ে দেখতে পারতাম কেমন করে শ্রমিক আর কৃষকরা নতুন জীবন গড়ে তোলে !'

গলায় একটুও সন্দেহের ভাব না রেখে নির্কিশিন বলল:

'নিশ্চয়ই যাব, আসলান ! একসঙ্গে মস্কো ফিরব। তারপরে তুমি চলে যাবে আজেরবাইজান আর আমি সাইবেরিয়া।'

'নাতাশার কাছে...'

'হ্যাঁ, নাতাশার কাছে।' নির্কিশিন থামল, আসলানের হাত ধরে আকাশে মিটমিট করা একটা উজ্জ্বল তারার দিকে দেখাল: 'নাতাশার চোখগুলি ঠিক ঐ রকম — হাল্কা ও স্বচ্ছ।'

'তাড়াতাড়ি চল, আমি যে ওকে চিঠি লিখব।' আসলান ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল। 'আর তুমি ততক্ষণ ঘুমিয়ে নাও।'

কিন্তু সেই রাতে তারা অনেক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে পড়তে পারল না। চিঠি লিখল, গল্প করল অতীত আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, যুদ্ধ আর জীবন সম্বন্ধে, আর সব শেষে পরস্পরের মাথা ঠেকিয়ে গান আরম্ভ করল। এই গান তাদের চারপাশের কেউ প্রায় শুনতেই পাচ্ছিল না, কিন্তু তাদের দু'জনের হৃদয়ে যেন গমগম করে বাজছিল আর আবেগ সৃষ্টি করছিল। বেশীক্ষণ তারা গান করল না: ঐভাবেই তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

ঐরকম একটা দুঃসাহসিক কাজ করার পরে ঘুমের ভীষণ দরকার ছিল।

একটু আগেই এই জায়গাগুলিতে কনকনে শীতের রাত্রির নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল আর এখন তা অবিরাম গোলাবর্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠছে। দুপক্ষেই এসে পড়ছে প্রচুর গোলা, গুলি, বোমা, মাইন। আমাদের সৈন্যরা শত্রু পক্ষকে বেশ কোণঠাসা করেছে প্রায় সমস্ত ফ্রন্ট জুড়েই। কিন্তু হঠাৎ অল্প একটুখানি জায়গায় বেশ একটা সমস্যা দেখা দিল। ফ্যাশিস্টরা আমাদের সৈন্যদের সারির মধ্যে দিয়ে ঢুকে এসে আমাদের বারুদের ভান্ডারের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তাদের থামান দরকার। ইভাশেচঙ্কো সৈন্যদের দলকে দু'ভাগে ভাগ করে দিল, নিজে একটা দল নিয়ে শত্রুদের অগ্রগতিতে বাধা দিতে গেল। আর নিকিশিনকে চারজন সৈন্য দিয়ে বলা হল ঘাট পাহারা দিতে।

'একজনও যেন গলে যেতে না পারে!'

'ঠিক আছে।'

ইভাশেচঙ্কো আর তার সৈন্যরা জার্মানদের পথ আটকে তাদের কোণঠাসা করে ফেলেছে। জার্মানদের একটা ছোটদল ঘাটের দিকে ছুটে এসেছে। নিকিশিন সতর্ক ছিল, সে আদেশ দিল: 'ফায়ার!' এবং নিজেই প্রথম স্টেনগানের ঘোড়া টিপল। ফ্যাশিস্টরা তিনজন সৈন্যকে হারিয়ে পিছু হঠে গেল। তারা একটা ভাঙা ট্যাঙ্কের আড়ালে লুকিয়ে সেখান থেকে মর্টার রাইফেল চালাতে লাগল। প্রথম বোমাটা ফাটল ঘাটের একেবারে কাছে।

'সবাই ঠিক আছ?' জিজ্ঞাসা করল নিকিশিন। তিনজনের গলা পাওয়া গেল: 'হ্যাঁ।'

কিন্তু চতুর্থজন চুপ। চারদিক তাকিয়ে নিকিশিন দেখতে পেল চতুর্থজন মাটিতে বসে যেন ব্যথা চাপার জন্য দু'হাত দিয়ে হাঁটু টিপে ধরে আছে। সৈন্যটির কাঁধে হাত রাখতেই নিকিশিনের মনে হল কি যেন গরম পড়ল তার হাতে — সৈন্যটির গলা দিয়ে রক্ত ঝরছে। নিকিশিন তার মাথাটা নিজের হাতে নিল, তার চোখের দিকে তাকাল।

'কি হয়েছে তোমার?'

কিন্তু আহত সৈনিকটা সে প্রশ্ন শুনতে পেল না, তার চেতনা ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। হঠাৎ সে পরিষ্কার বলল:

'শত্রুদের ঘাটের কাছে এগিয়ে আসতে দিও না।'

নিকিশিন অভিভূত হল। কি প্রচন্ড প্রাণশক্তি এই মরণাপন্ন সৈনিকটির।

'ধন্য তুমি!' আপনা হতে বেরিয়ে এল নিকিশিনের মুখ থেকে আর এই শেষ কথাটা সৈনিকটির চেতনায় গিয়ে পেঁছিল। চোখ বড় করে খুলে সে নিকিশিনের দিকে তাকাল। আরও কয়েক মুহূর্ত, তারপর সেই দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল।

নিকিশিন সাবধানে সৈনিকটির মাথা মাটিতে নামিয়ে রেখে চারপাশে তাকাল। ভাঙা ট্যাঙ্কের আড়ালে জার্মান সৈন্যরা হঠাৎ চুপ হয়ে গেছে। আমাদের আক্রমণকারী দলটা অনেকটা এগিয়ে গেছে সামনে আর ফ্যাশিস্টদের দলটা তাদের প্রধান বাহিনীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তারা আর আগের মত আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করছে না। তবুও তাদের এক মিনিটের জন্য ছেড়ে দেওয়া যায় না। নিকিশিন ভালই জানে, একটু ঢিলে দিলেই, ওরা আবার এগিয়ে আসবে আর বারুদের ভাণ্ডারের দিকে এগিয়ে যাবে। না, তা হতে দেওয়া যায় না। নিকিশিনের কানে এখনো বাজছে ইভাশেচঙ্কোর আদেশ: 'এখানে একজন শত্রুর পাও যেন না পড়ে!'

ট্যাঙ্কের আড়াল থেকে জার্মানরা গুলি ছুঁড়ছিল। নিকিশিন কয়েকবার চেষ্টা করল তাদেরকে একেবারে পেড়ে ফেলার জন্য, কিন্তু সম্ভব হল না। সে আরো দু'জন সৈন্যকে হারিয়েছে। হঠাৎ ট্যাঙ্কের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে গ্রেনেড ছুঁড়ল দু'জন ফ্যাশিস্ট। নিকিশিন স্টেনগান চালাতেই দুটোই মরে পড়ে গেল। কিন্তু তাদের ছোঁড়া গ্রেনেডগুলোর একটা ফাটল ট্রেঞ্চের মধ্যে আর তাতে শেষ সৈন্যটিও সাংঘাতিক আহত হল। নিকিশিন একেবারে একা পড়ে গেল। জার্মানদের ওপর নজর রাখতে রাখতে, মাঝে মধ্যে গুলি চালিয়ে সে ঘাট আগলাতে লাগল। তার কানে কম্যাণ্ডারের আদেশ বাজতে লাগল: 'নিকিশিন, শত্রু যেন একজনও পেরিয়ে না যায়!' এখন ফ্যাশিস্টরা আর জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। নিকিশিনের স্টেনগানের ভয়ে তারা আর ট্যাঙ্কের আড়াল থেকে মাথা বার করছে না।

লড়াইয়ের আওয়াজ ইতিমধ্যে মিলিয়ে আসছে। বোঝা যায় যে, শত্রুদের ক্ষমতা কমে আসছে। তারা এখন পালিয়ে বাঁচতে চাইছে, কিন্তু পালানোর পথ নেই। তারা যেদিকেই পালাতে চাক না কেন তাদের সামনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে আগুন আর গোলাবোমার দেওয়াল।

নিকিশিন বুঝল যে সময়ের অপেক্ষায় সে এতদিন ছিল তা এসেছে। ফ্যাশিস্টদের শেষ সময় উপস্থিত, আর সে কেবল একটা কথাই অনুভব করছিল কম্যাণ্ডারের আদেশ পালন করা, কাউকে এদিকে আসতে

না দেওয়া। 'মরব, তবু কাউকে এদিকে আসতে দেব না।' ভাবল সে।

নিকিশিন যে টিলাটা আগলাচ্ছিল সেখানে দুটো গোলা ফাটল। তার মনে হল যেন তার কাঁধের ওপর কেউ গরম জল ঢেলে দিল। সে চোখ বন্ধ করেই সঙ্গে সঙ্গে আবার খুলল, দু'জন জার্মান তার দিকে ছুটে আসছিল। আবার স্টেনগান গর্জন করে উঠল, একজন জার্মান পড়ে গেল, অন্যজন দৌড়ে গিয়ে ট্যাঙ্কের আড়ালে লুকাল। 'যেতে পারে নি!' খুশী মনে ভাবল নিকিশিন, তার কাঁধের ব্যথাটা আর জ্বালাচ্ছে না। তার নিজেকে বেশ সুস্থ মনে হল। আসলে মাইনের টুকরোয় সে বেশ বড় আঘাত পেয়েছে কিন্তু প্রচণ্ড উত্তেজিত থাকায় তা সে বুঝতে পারল না। রক্ত কাঁধ থেকে ঝরে একেবারে হাত বেয়ে গড়িয়ে স্টেনগানের ওপর এসে পড়েছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল আসলানকে, তার সেই সুন্দর জীবনের স্বপ্ন, তার দিদিমা কত খুশী হবে বৈদ্যুতিক আলো পেয়ে... হঠাৎ তার খুব একা মনে হল। আসলানও যদি থাকত কাছে! এটা কেমন করে হল যে, তারা একসঙ্গে নয়? তার কিছুই মনে পড়ল না। কি করেই বা মনে পড়বে? লড়াই সেই কবে আরম্ভ হয়েছে আর শেষ হবার নাম নেই, এক মিনিটের জন্যও থামছে না। এইরকম উল্টোপাল্টা চিন্তাধারার মধ্যে একটা কথা তার মাথায় পরিষ্কার আসছিল: 'যেখানেই আসলান থাক না কেন, ঠিক চালিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত!' এই চিন্তাটা তাকে একটু শান্ত করল। 'কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে...' ভাবল সে। 'কেমন যেন কুয়াশা করে আসছে? কিন্তু কুয়াশার মধ্য দিয়েও শত্রু পেরিয়ে যেতে পারবে না।' নিকিশিন ফার গাছের ঘন শাখা প্রশাখাগুলির উপর ঠেস দিল, তারা একটু বেঁকে গিয়ে যেন তাকে আলিঙ্গন করল। 'একি হাতটা দুর্বল লাগছে কেন? জমে গেছে নাকি? স্টেনগানের বাঁটটাকে ঠিক করে ধরতে হবে যাতে না কাঁপে।'

আকাশে তারা আর বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। চাঁদও দিগন্তে হেলে পড়েছে, ভোর হচ্ছে। শীত বেড়েছে। কিন্তু নিকিশিনের শীত বোধ করছে না। দূরে কোথা থেকে যেন লড়াইয়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। 'আমাদের সৈন্যরা শত্রুদের আরো দূরে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে ছাড়বে। আর একটুখানি, কেবল একটুখানি ধৈর্য ধরতে হবে।' ভাবল নিকিশিন, শেষ শক্তি সঞ্চয় করে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল যেখানে জার্মানরা লুকিয়ে আছে আর স্টেনগানটা চেপে ধরে রইল। কতক্ষণ যে সে সেইভাবে ছিল তা জানে না। সময়ের জ্ঞান তার ছিল না। তার মনের

দৃষ্টিতে ভেসে উঠল সুন্দর দেবদারু গাছ, কুয়াশা কেটে গিয়ে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছে, আর সেখানে তারা চিকচিক করছে... 'না না, এগুলো তারা নয়। এ হল আমাদের গ্রামগুলির অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলো... এ হল নাতাশার চোখ...' ভাবল নিকিশিন। 'না, শত্রু গলে যেতে পারবে না।'

সবুজ ফার গাছের শক্ত ডালগুলির উপর বুকে ভর দিয়ে, ডালপালার মাঝে স্টেনগানটাকে শক্ত করে বসিয়ে, নিকিশিন তাকিয়ে রইল শত্রুর আশ্রয়স্থলের দিকে। চুপি চুপি নিঃসারে ঘুম এগিয়ে আসছে, আরামের ঘুম...

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈন্যরা সেই জায়গাটাকে পুরোপুরি শত্রুমুক্ত করে ফেলল। সারা রাত লড়াইয়ের পর ঘরে ফিরে আসলান দেখল, নাতাশাকে লেখা তার চিঠিটা পাঠান হয় নি। সে নিকিশিনকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও সে নেই। আসলানের উদ্বেগ হতে লাগল। আহতদের মধ্যেও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন সে মেডিকেল দল নিয়ে সেই দিকে গেল যেখানে আগের রাত নিকিশিন লড়াই করছিল। দূর থেকেই সে বন্ধুকে দেখতে পেয়ে আনন্দে চীৎকার করে উঠল। একটা হাঁটু মাটিতে রেখে বাঁ পা মুড়ে, বুক সামনে আগিয়ে দিয়ে নিকিশিন স্টেনগানের বাঁটটা ধরে আছে। সোজা সামনের দিকে তার দৃষ্টি। যেন সে কোন কিছুকে লক্ষ্য করছে, এখুনি গুলি করবে। ইভাশেচঙ্কোও ছিল সেখানে। এ কি? ইভাশেচঙ্কো নিকিশিনের থেকে চোখ সরাচ্ছিল না, সে চোখ বিস্ময় আর বিষাদে পূর্ণ। আসলান 'নিকিশিন!' বলে চীৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গেল। নিকিশিনের সারা দেহ তুষারকণায় ঢেকে গেছে, স্টেনগান হাতে জমে গেছে। আসলান ভেঙে পড়ে ইভাশেচঙ্কোর দিকে ঘুরে তাকাল।

'কমরেড কম্যান্ডার, ও আর নেই...' চোখ ফেটে বেরিয়ে আসা জল মুছে বলল।

'না আসলান, ও বেঁচে আছে, থাকবে। চিরকাল। ও বীর, নিজের স্মৃতিস্তম্ভ এমন করে তৈরী করে গেল।'

সৈন্যরা ট্যাঙ্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কয়েকজন জার্মান সৈন্যকে ধরে আনল যারা জমে যাওয়া নিকিশিনকে জীবন্ত ভেবে ভয়ে বেরোয় নি। তাদেরকে অন্য বন্দীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল।

কয়েকদিন বাদে কাগজে ছাপা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম

সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামের নির্দেশ। নিকিশিনকে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

শোনা যায়, প্রতিভাবান ভাস্কর আলেক্‌সান্দর নিকিশিনের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করেছে। বুকের কাছে স্টেনগানটা চেপে ধরে, নিকিশিন সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন আমাদের দেশের শত্রুদের সতর্ক করে দিচ্ছে যে কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করবে সেই ধ্বংস হবে।

আসলান অনেকক্ষণ ধরে দ্বিধা করছিল, নাতাশাকে নতুন চিঠি লিখবে না ঐ প্রথমটাই পাঠাবে, যা অমন সুন্দর সন্ধ্যায় সে লিখেছিল। শেষ পর্যন্ত সে ঐ চিঠিটাই পাঠাল। নিকিশিনের মৃত্যুর কথা নাতাশা আরো পরে জানতে পারে।

আসলান নিজে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল, কয়েকবার আঘাত পেয়েছে, সেরে উঠে আবার ফ্রণ্টে ফিরে গিয়েছে। এখন সে নিজের যৌথখামারে কাজ করছে। যুদ্ধের আগে আরম্ভ হওয়া ইলেক্ট্রিক পাওয়ার স্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে। আর সন্ধ্যাবেলায় ইলিচের বাল্বের* আলোয় আসলান তার দিদিমাকে বই, খবরের কাগজ পড়ে শোনায়। আর বুড়ীর তন্দ্রা নামে।

ইভাশ্চেঙ্কো এখনও সৈন্যের পোশাক পরে ঘোরে। সে এখন কর্নেল। চুল তার সাদা হতে আরম্ভ করেছে। এখনও যদি কাউকে তার পছন্দ হয় তো সেই একই কথা বলে: 'যে মাটি তোমার জন্ম দিয়েছে, সে ধন্য!'

খবরের কাগজে তুলাসংগ্রহে আসলানের বিরাট সাফল্যের কথা পড়ে সে তাকে চিঠি লিখল, যাতে খালি একটি বাক্য স্থান পেল: 'সোভিয়েত ভূমি ধন্য, তোমার মত সন্তান পেয়ে!'

আর নিকিশিনের মৃত্যু হয় নি। সে আজও বেঁচে আছে আসলানের হৃদয়ে, কম্যাণ্ডার ইভাশ্চেঙ্কো আর নাতাশার হৃদয়ে। সে আজও বেঁচে আছে নিজের মাতৃভূমির হৃদয়ে।

---

* ভ. ই. লেনিনের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্রামে-গঞ্জে প্রথম প্রচলন হয় বৈদ্যুতিক আলো। গ্রামবাসীরা সেই কারণে বাল্বকে বলত ইলিচের বাল্ব — সম্পাঃ

ইচ্ছাশক্তি

১

কালের প্রকোপে কালো হয়ে যাওয়া বাড়ীটা দাঁড়িয়ে ছিল এসফাল্ট বাঁধান চওড়া রাস্তার ধারে। এই রাস্তাটা শহরকে তৈলাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

এই বিশ্রী বাড়ীটার চারপাশে বহুদিন হল গজিয়ে উঠেছে বহুতল বিশিষ্ট বাড়ীগুলি, এসফাল্ট বাঁধান উঠানগুলি চকচক করে, চত্বর সবুজগাছে ভর্তি। আর ঐ পুরনো বাড়ীটা এত সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলির পাশে অদ্ভুত দেখায়। বহুদিন ধরে অবশ্য শোনা যাচ্ছে যে বাড়ীটা নাকি ভেঙে ফেলা হবে: কেউ কেউ বলছে ওর জায়গায় তৈরী হোক লাইব্রেরী আবার কেউ প্রস্তাব দেয় সিনেমাহল তৈরীর। অবশেষে সেই জায়গায় শ্রমিকদের জন্য ছ'তলা বাড়ী তৈরীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। আর যেই সে কথা সবাই জানতে পারল, অমনি যেন ঐ পুরনো বাড়ীটার ঝুলে পড়া বারান্দা, দেয়ালের ফাটলগুলি যা বিদ্যুৎ চমকের কথা মনে করিয়ে দেয়, সব যেন আরো বেশী করে নজরে পড়তে লাগল। এমনকি স্কুলের ছেলেরাও তার পাশ দিয়ে যাবার সময় বলত: 'বাড়ীটাকে ভেঙে ফেলা দরকার! কী যে অবস্থা!'

বোরিং মেশিনের ফোরম্যান করিমেরও এখন সেকথা মনে হতে লাগল যদিও এই পুরনো বাড়ীটাতে ও এতদিন বেশ সুখেই ছিল।

ওর ছিল একটা বিরাট রোদভরা ঘর। দক্ষিণপূর্ব দিকে যে সরু বারান্দা ছিল, তার কাঁচে কাস্পিয়ান সাগরের নীল আভা চিক্‌চিক্ করত।

বছর আষ্টেক আগে করিম হস্টেল থেকে এসে এই ঘরে ওঠে, তার বছর দুই আগে সবে সে শহরে এসেছে। বাকুতে এসে কাজ আরম্ভ করে বোরিং মেশিনে। প্রথমে সে ছিল সাধারণ শ্রমিক, তারপর হল এসিস্টেন্ট

ড্রিলার, তারপর ড্রিলার আর অবশেষে ফোরম্যান। যখন সে ড্রিলার ছিল, একবার ছুটিতে নিজের গ্রামে গেল, নিজের পছন্দ করা মেয়ে জয়নাবের কাছে। এবং একমাস পরে বিয়েকরা বউ নিয়ে ফিরে এল...

জয়নাবকে সে বালিকা অবস্থায়ই জানত, তার হৃদয়ের উষ্ণ ভালবাসা ছোটখাট অসুবিধাকে ভুলিয়ে দিত। এইভাবে মাস, বছর কেটে গেল, সুখের মধ্যে দিয়ে, কাজ আর দায়িত্বের মধ্যে দিয়ে।

একবছর বাদে তাদের মেয়ের জন্ম হল, জয়নাবের সঙ্গে ভীষণ মিল, সেইরকমই খয়েরী চোখ। সব কিছুই তার মায়ের, খালি তার বাদামী চুল বাবার কথা মনে করিয়ে দিত। তার নাম দেওয়া হল গুল্যের। আরো একবছর বাদে তাদের এক ছেলে হল, নাম দেওয়া হল ইয়াশার। তারপর তারা দ্বিতীয় কন্যাসন্তানের জন্মোৎসব পালন করল — যার নাম জিভের। আরো একবছর বাদে, মা হাসপাতাল থেকে সুখে ঝলমল করতে করতে আরো এক পুত্রসন্তান নিয়ে বাড়ীতে এল, তার নাম দেওয়া হল আলিয়ার।

স্বামী-স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রতিবেশীরা হেসে বলত:

'তোমাদের যেন সব মাপা-ছকা!'

বাবা সুখের হাসি হেসে নিজের সন্তানদের মাথায় হাত বোলাত আর ভাবত রূপে তারা একে অপরকে হার মানায়।

'প্রথমে ছেলে, তারপর মেয়ে — একের পর এক এইভাবেই পালা করে তারা আসবে।' বলত সে।

শিশুর জন্ম তাদের পরিবারে উৎসব হয়ে দেখা দিত, তাতে এসে যোগ দিত করিমের সহকর্মী-বন্ধুরা। বাবা-মা, কেউই কখনও ভাবত না যে তাদের কোন কষ্ট হচ্ছে। একবার জয়নাব বললে বাচ্চাদের পোশাকে-আশাকে এত খরচ বেড়ে গেছে, বিশেষ করে জুতোয়, করিম হেসে বলেছিল:

'ঠিক চলে যাবে। আমার পরলোকগত বাবা বলতেন: 'প্রত্যেকের জন্য আহার ঠিকই জুটে যাবে।' তাছাড়া আমাদের সরকার শিশুদের কোন কষ্ট হতে দেবে না।'

কিন্তু তাহলেও তারা দু'জনেই বুঝতে পারল যে পরিবার বড় হয়ে যাওয়ায় বেশ কিছু অসুবিধাও হচ্ছে। একটা ঘরে জায়গা আর কুলায় না। প্রথম প্রথম একথা তারা মনে না করারে চেষ্টা করত। কিন্তু একবার জয়নাব আর পারল না:

'দেখছ, ঘরে জায়গা আর কুলায় না, বাচ্চাদের ঘুমোবার অসুবিধে হয়। আর বছর দুই বাদে গুলের স্কুলে যাবে, তখন তো আরো অসুবিধে হবে...'

প্রথম প্রথম করিম চুপ থাকত, কিন্তু জয়নাব ঘন ঘন তাকে একই কথা বলতে লাগল, তখন করিম ঠাট্টা করে বলল:

'জয়নাব-জান শোনো নি 'যদি হয় সুজন, তেঁতুলপাতায় দশজন!' '

'ওসব বুলি পুরনো হয়ে গেছে করিম। মানুষ যত ভাল থাকে, তার চাহিদাও তত বাড়ে। একথা অমনি বলা হয় না যে, সুন্দর দিনে মানুষকেও সুন্দর দেখায়।'

'আ, তুমি বোধ হয় এই জন্যই দিনে দিনে সুন্দর হচ্ছ।'

'তোমার সবতাতে ঠাট্টা! চার ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা ঘরে থাকা কি সোজা ব্যাপার? এত সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরী হচ্ছে, সবাই ফ্ল্যাট পাচ্ছে ভাল ভাল। তুমি একটু কথা বলে, চেষ্টা করে দেখ না...'

করিম ভুরু কোঁচকাল।

'আমাকে কোন কিছু চাইতে বোলো না... আমার বাবা বলতেন: 'ভিক্ষা চাওয়া হল জগতে সব থেকে খারাপ কাজ।' আমার দ্বারা ওসব হবে না। ছেলেরা বড় হোক, খুঁজে নেব ফ্ল্যাট, সব ঠিক হয়ে যাবে...'

জয়নাব পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে চুপ হয়ে গেল। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করার মত মেয়ে সে নয়। সংসারে আগের মতই ভালবাসা ও শান্তি বজায় রইল।

একথা বিশেষভাবে বোঝা গেল যখন করিম সমুদ্রে নতুন পেট্রোলকূপ খোঁড়ার কাজ আরম্ভ করল। এমনও হত যে, সারা দিন সে ঘরে ফিরত না। প্রতীক্ষায় কাটত সারাদিন। জয়নাব ছেলেমেয়েদের কাছে বসিয়ে বারান্দার কাঁচের মধ্য দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলত কেমন করে বাবা সমুদ্রের ঢেউকে ভয় না করে পেট্রোল তুলে আনার পথ খুঁজছে, কেমন করে সে সমুদ্রে পেট্রোলকূপ খুঁড়ছে। তার এই গল্পে এত কিছু বিস্ময়কর থাকত যে শিশুরা মুগ্ধ হয়ে শুনত। কখনও কখনও তারা নিজেদের কল্পনায় কোন কিছু যোগ দিত... আর জয়নাব স্বামীর কথা ভেবে গর্বিত হত — তার কাজে কত যে সাহস দরকার!

আর অন্তরের একেবারে অন্তরতম কোণে জমা হত উদ্বেগ...

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করে সে এই উদ্বেগ চাপা দেওয়ার চেষ্টা

করত, আর কখনও হয়ত উদ্বেগে কেঁপে ওঠায় এক মুহূর্তের জন্য গল্পে ছেদ পড়ে।

প্রত্যেক বার যখন রোদেপোড়া করিম, সমুদ্রের গন্ধ নিয়ে এসে দরজা খোলে, জয়নাবের ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের সামনে সে নিজেকে ধরে রাখে, একপাশে দাঁড়িয়ে খুশীভরা চোখে দেখে কেমন করে করিম তাদের আলিঙ্গন করে, চুম্বন করে, চুল এলোমেলো করে দেয়। খালি রাত্রিবেলায় বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়লে করিম আর জয়নাব মনের কথা বলতে পারত। করিম বারান্দায় তক্তার ওপরে বসে থাকত লাল ভেলভেটের তাকিয়ার ওপর কনুই ভর দিয়ে। স্বামী-স্ত্রী আস্তে আস্তে গল্প করত। জয়নাব ছেলেমেয়েদের দুষ্টুমির কথা, স্বভাবের কথা, তাদের ভবিষ্যতের কথা বলত। জানালার বাইরে গর্জন করত উত্তুরে হাওয়া, কাঁচগুলো ঝনঝন করত। কালো অন্ধকারের আড়ালে সমুদ্র দেখা যেত না। খালি দূরে দূরে ছোট ছোট আলো চিক্‌চিক্ করত।

কিন্তু জয়নাব আর দেখত না জানলার বাইরে কি ঘটছে। স্বামীর কাঁধে ভর দিয়ে যেন বিশ্রাম করত।

'নিজের তৈরী ঘোলের শরবৎকে কেউ টক বলে না, একথা ঠিক করিম। সব মাই ভাবে যে তার ছেলেমেয়েরাই সবার থেকে ভাল। কিন্তু গুলের-এর প্রশংসা করে সব প্রতিবেশীরাই — ওর এমন ক্ষমতা যে রেডিওতে কোন গান মাত্র একবার শুনেই ও সুর হুবহু শিখে ফেলে...'

'ওকে তাহলে গানবাজনার ইস্কুলে ভর্তি করতে হয়।'

'আমি তোমায় বলতে চাই নি, ভেবেছিলাম, একদিন ও নিজেই তোমায় বাজিয়ে শোনাবে, তুমি সব জানতে পারবে। যাক্, বলতে আরম্ভ যখন করেছি, সবই বলব। তিন দিন আগে ওকে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম ক্লাবে। সেখানে শিক্ষিকা বললেন যে, ওর গানের 'কান' খুব তৈরী, ওকে বেহালা বাজানতে দেওয়া উচিত।'

'তার মানে, বেহালা কিনতে হবে।'

'তাও পেয়েছি, স্কুলের দিদিমণির সঙ্গে শহরে গিয়ে কিনেছি।'

করিম চুপ করে রইল। তার স্ত্রীর প্রতি, তার সন্তানদের মায়ের প্রতি সে কৃতজ্ঞতাবোধ করল। এই মুহূর্তে খুব বেশী করে বুঝতে পারল যে অনুরাগ আর শ্রদ্ধা দুয়ের মিল মনের ভাবকে করে গভীর ও দৃঢ়। কয়েকদিন ধরে তাকে একটা ভাবনা বড় জ্বালাচ্ছে। তার নিজেকে দোষী

মনে হয় স্ত্রীর কাছে। জয়নাব কোন এক সময় শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয় থেকে পাশ করেছে, তার বিয়ের আগে পর্যন্ত গ্রামের ইস্কুলে কাজ করেছে। আর এখন সংসারের জন্য সে কোথাও কাজ করে না। কখনও কখনও করিমের মনে হয় যে, জয়নাব কোন একদিন ভাববে যে সে তার সব বন্ধুদের থেকে পিছনে পড়ে আছে আর এর জন্য দায়ী তার স্বামী। স্ত্রী এখন ছেলেমেয়েদের জন্য সমস্ত সময় ব্যয় করে কত সুখী তা দেখেও করিম একথা ভাবত, ভাবত তারও তো কখনও আরো বড় জগতের জন্য আকাঙ্খা জাগতে পারে।

'জয়নাব,' বলল সে, 'তুমি ছেলেমেয়েদের জন্য এত কর এ খুব ভাল কথা, কিন্তু নিজের কথাও তো ভাবতে হয়।'

জয়নাব বিস্মিত হয়ে মাথা তুলে স্বামীর দিকে দেখল।

'কি বলতে চাচ্ছ, বুঝলাম না।'

'তুমি সমস্ত সময় ছেলেমেয়েদের পিছনে নষ্ট করে ভুল করছ না তো? পরে এ সম্বন্ধে আক্ষেপ করবে না তো?'

জয়নাব মৃদু হেসে বলল:

'কখনো না। ওরা বড় হয়ে উঠবে, মানুষ হবে, সেটাই কি আমার মস্ত বড় পুরস্কার পাওয়া নয়?'

'তা ঠিকই, কিন্তু নিজের পরিবারের সংকীর্ণ গন্ডীর বাইরেও প্রতিটি মানুষের কোন দায়িত্ব থাকা উচিত। ভেবে দেখ, আমি ঠিক বলছি কিনা।'

জয়নাব নীরব। তার মুখে ছায়া নেমে এল।

'করিম আমি ঠিক বুঝছি না। তুমি নিজেই অনেকবার বলেছ যে, সেই সব লোকেদের বা মহিলাদের পছন্দ কর না যারা বিবাহ করে না অথবা সন্তান চায় না। তারা নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসে না, সন্তান তাদের কাছে বোঝা। আর আমার কাছে নিজের সন্তানদের মানুষ করে তোলা আনন্দের কাজ। আমি আর অন্য কোন কাজের কথা ভাবিই না। কিন্তু বল তো দেখি, তোমার কি বিরক্ত লাগে যে আমি খালি ঘরসংসার নিয়েই পড়ে আছি?'

জয়নাবের গলা কাঁপছিল, কণ্ঠস্বরে বোঝা যাচ্ছিল তার অভিমান।

করিম বউয়ের হাত ধরে বলল:

'এই তোমার রাগ হয়ে গেল... তুমি তো জান আমি তোমাকে ছাড়া, ছেলেমেয়েদের ছাড়া থাকতে পারি না। আমি খালি ভাবছি যে কয়েক বছর

বাদে তুমি আমাকে না দোষ দাও, যে আমি তোমার কথা ভাবি নি, বোলো না যে, তোমার সব বন্ধুরা ভাল ভাল কাজ করছে আর তুমি চার দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়ে রইলে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে... আমি একথাই বলতে চাচ্ছি।'

করিমের কথাগুলি জয়নাবকে সত্যি সত্যিই ভাবিয়ে তুললে। আর যদিও সে করিমের সঙ্গে একমত নয়, তবুও তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই কথাগুলি তার মনের মধ্যে উল্টো চিন্তাধারা জাগিয়ে দিয়েছে। সব কিছু ভাল করে ভেবে দেখা দরকার। এই কথাটা ওঠার সম্ভাবনাটাই তার মনকে অপ্রীতিকার চিন্তায় ভরিয়ে দিল। কিন্তু এখন এই মনের অবস্থায় সে আজেবাজে কিছু বলে ফেলতে পারে এই ভয়ে জয়নাব উঠে পড়ল:

'রাত হয়ে গেছে, তুমি ক্লান্ত, ঘুমোও। কাল কথা বলবে। সকালে মাথা পরিষ্কার থাকে।'

সে ঝুঁকে পড়ে করিমকে চুম্বন করল, কিন্তু করিম তাতে অন্যদিনের মত প্রাণের সাড়া পেল না। তার মনে হতে লাগল যে সে স্ত্রীকে কেবল নিজের মনের কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারে নি তাই নয়, তার স্ত্রীর মনের মধ্যে ঝড় তুলে দিয়েছে সে। এইসব চিন্তা করতে করতে সে পোশাক বদল করে শুয়ে পড়ল। কিন্তু অনেকক্ষণ জেগে শুয়ে রইল...

২

রাত্রে বৃষ্টি পড়ছিল। হাওয়ার চোটে বাড়ীটা কাঁপছিল। সমুদ্রের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু সকালে হাওয়া হঠাৎ পড়ে গেল, মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি দিল।

সকালে সবাই বসে সকালের খাবার খাচ্ছিল। গেলাসের কানাগুলিতে সকালের সূর্যের রোদ ঝিকমিক করছিল। গুল্যের মাখন-রুটি গপগপ করে খেয়ে নিয়ে টেবিলে প্রতিফলিত রোদকে ধরবার চেষ্টা করছিল। করিম চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে চুপি চুপি দেখে নিল জয়নাবের মুখটা, সে তখন সবাইকে খাবার এগিয়ে দিচ্ছিল। করিম বুঝতে পারল জয়নাব অন্য দিনের মত আজও নিজেকে প্রকাশ করে দেবে, না, কিন্তু সেই মৃদু হাসি যা সে আজ একটু বিশেষ চেষ্টায় ধরে রেখেছে, তাও বলে দিচ্ছে — তার মনের ভেতর অশান্তি। করিম তাকে বিরক্ত করতে চাইল না। যদি জয়নাব

কালকের কথাবার্তা আর চালাতে না চায় তো সেও আর কথা তুলবে না। কিন্তু জয়নাব কথা বলার কোন চেষ্টাই করল না। পরিস্থিতি একটু অস্বস্তিকর যদিও ওপরসা সবই আগের মত আছে।

চা খাওয়া তখন শেষ হয় নি, এমন সময় জয়নাব যা নিয়ে সবসময় চিন্তা করত সেই বিষয়ে কথা আরম্ভ করল।

'সমুদ্রে অনেকক্ষণ থাকবে নাকি? যখন ঝড় ফুঁসতে থাকে, তখন একা ড্রিলিংমেশিনের কাছে কেমন ভয় করে তা বুঝতে পারি।'

'ভয় হয়ত করে, কিন্তু আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'তাহলেও খুব সাহস দরকার বৈকি। তোমার মনে আছে, মাসখানেক আগে তোমরা যখন দু নম্বর কূপটা খুঁড়ছিলে তখন কিরকম ঝড় হল? হাওয়ার মাতলামি পাঁচদিন ধরে চলেছিল। তুমিই তো বলছিলে, সেবারে তোমাদের খুব কষ্ট গেছে, এঁটেলমাটির মর্টার কম পড়েছিল, জল আর রুটির ভান্ডার শেষ হয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রে পেট্রোলিয়ম খোঁজা মোটেই সোজা কাজ নয় বাপু...'

'সোজা একথা তো কেউ বলে নি। কিন্তু কাজ যত কঠিন, তার ফলও ততই বেশী দামী। মাটিতে পেট্রোলিয়ম খোঁজা খুবই সহজ।'

'আমার মনে হয়, সমুদ্রে কূপ খোঁড়া খুবই সাহসী লোকের কাজ।'

'বিশ্বাস কর, কোনো বিশেষ সাহসের দরকার হয় না।'

পুঁচকে জিভের ছোট্ট নাক, ছোট্ট দুটি কালো চকচকে আঙুরদানার মত চোখ, বাবার কোলে উঠে বসল। করিম একটা টফি নিয়ে মেয়ের হাতে দিল। জয়নাব এক মিনিট চুপ করে দেখল, কেমন করে সে তার শক্তিমান হাতগুলি দিয়ে মেয়েকে আগলে রেখেছে, হঠাৎ সে আবার প্রশ্ন করল:

'সত্যি করে বল: তার মানে, কোন বিপদ নেই?'

কতবার সে যে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে।

'যদি মানুষ তার নিজের কাজ জানে আর তার ইচ্ছাশক্তি থাকে, তো কোন বিপদই তার কাছে ভয়ংকর নয়। শুধু শুধুই তুমি চিন্তা করছ জয়নাব... তুমি কাল গুল্যলের-এর কথা বলছিলে... কই,' বড় মেয়ের দিকে সে তাকাল, 'বাজিয়ে শোনা দেখি একটু, কেমন তুই ওস্তাদ।'

জয়নাব হেসে বলল:

'গুল্যলের বেহালা আন, শোনা বাবাকে।'

কিন্তু গুল্যলের বেহালা আনতে না আনতেই দরজায় কে ঘণ্টা বাজাল।

করিমের অফিসের ড্রাইভার এসেছে, তাকে এখুনি দরকার, গাড়ী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

জামাকাপড় পরতে পরতে করিম উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করল:

'বোরিং মেশিনে কিছু হয়েছে ? একসিডেণ্ট ?'

'বলতে পারব না। কিছু জানি না।'

মুহূর্তে জয়নাবের মধ্যেও সঞ্চারিত হল করিমের উদ্বেগ।

ড্রাইভারের পিছনে পিছনে বেরোতে উদ্যত স্বামীর হাত চেপে ধরে উদ্বিগ্নভাবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে সে ফিসফিসিয়ে বলল:

'যদি কোন কিছু খারাপ খবর হয়, নিশ্চয়ই আমাকে জানাবে, কেমন ?'

'নিশ্চয়ই, চিন্তা কোরো না।' স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে বলল করিম।

...গাড়ী বড় রাস্তা ছেড়ে তৈলাঞ্চলের রাস্তায় বাঁক নিল, করিমের নাকে তেলকালির তীব্র গন্ধ ঢুকল। রাস্তা এঁকেবেঁকে গেছে বোরিং টাওয়ারের ফাঁকগুলি দিয়ে, কম্প্রেসর আর রিজার্ভয়ারের পাশ ঘুরে। উল্টো দিক থেকে দারুণ জোরে আসছিল বিভিন্ন ট্রাক যারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সিমেণ্ট, এঁটেলমাটি, বোরিং মেশিনের জন্য যন্ত্রপাতি। যে সব ট্র্যাক্টরগুলি তৈলখনি সারাইয়ের কাজ করে তারা প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে যাচ্ছিল।

টাওয়ারগুলির কাছে পড়ে ছিল পেট্রোলমাখা নল, লোহার বীম, কাঠের টুকরো।

বোরিং মেশিনগুলির অফিস ছিল একটা একতলা বাড়ীতে। উঠানে দুটো কচি গাছ হয়েছে আর ফুল ফুটেছে কার সযত্ন পরিচর্যায়। তেলকালির ডোবার মধ্যে এই সবুজের ভীরু আত্মপ্রকাশ অত্যন্ত মন ছোঁয়া। তবুও গাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে।

করিম অফিসঘরের দরজা খুলে বিস্ময়ে চমকে উঠল: ঘরে ভর্তি লোক, মিটিং চলছে। সে ঢুকতেই সবাই তার দিকে তাকাল, এমনকি যে ড্রিলার বক্তৃতা দিচ্ছিল সেও এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে রইল হাতটা শূন্যে তুলে রেখে। করিম ব্যাপার না বুঝে বেরিয়ে যাবার জন্য উদ্যত হল কিন্তু অফিসের ডিরেকটর সারদারভের শান্ত স্বর শুনতে পেল:

'কমরেড করিম, যাচ্ছ কোথায় ? বোস।'

করিম সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে খোলা জানলার কাছে বসল। ওর মন শান্ত হল এই ভেবে যে, খারাপ কিছু ঘটে নি। 'সবাইকে এখানে জড়ো করেছে কেন ?' ডিরেকটরের দিকে তাকিয়ে ভাবল করিম। করিমের

সঙ্গে চোখাচোখি হতে একেবারে সাদামাথা ডিরেকটর ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল।

'কমরেড করিম,' বলল সে। '২৮শে এপ্রিল* আর পয়লা মে দিবসের উপলক্ষে আমাদের সংস্থা নতুন দায়িত্ব নিচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হচ্ছে। আমার ধারণা, আমাদের বোরিংমেশিন অফিসও সরে থাকবে না। কি বল?'

আর যেন করিমের মত জানতে চেয়ে একটু থামল।

'আমরা খালি সরে থাকব না তাই নয়, কাউকে কাউকে ছাড়িয়ে যেতেও হবে। সবাই জানে যে ড্রিলিং ছাড়া পেট্রোল পাওয়া যায় না।'

'ঠিক! যখন ড্রিলিং খারাপভাবে চলে তখন গোটা সংস্থা খুঁড়িয়ে চলে। আমরা এখন প্রত্যেক দলের দায়িত্ব ঠিকঠাক করে নিচ্ছিলাম, কে কার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে; ইভানোভের দল তোমার দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে চায়। তোমরা দু'জনেই সমুদ্রে কাজ কর। তোমরা দু'জনেই কূপ অনুসন্ধান কর। পরিকল্পিত গভীরতাও এক, তিন হাজার মিটার...'

'শর্ত কি?' করিম জিজ্ঞাসা করল।

ইভানোভ উঠল, মাঝারি লম্বা, রোগা, যেন চওড়া ক্যাম্বিসের কোটের মধ্যে হারিয়ে গেছে। লম্বা ফিতে ঝোলান কালো ফোলান টুপিটা খুলল।

'শর্ত হল এই: সময়ের পনের দিন আগে ড্রিলিং শেষ করতে হবে এইভাবে বিশ হাজার রুবল বাঁচাতে হবে!' প্রতীক্ষার ভাব নিয়ে সে তাকাল করিমের দিকে।

করিম একটুখানি ইতঃস্তত করে উঠে দাঁড়াল। নেমে আসা নিস্তব্ধতার মধ্যে তার কণ্ঠস্বর খুব গুরুত্বপূর্ণ শোনাল:

'তোমার চ্যালেঞ্জ করছি। আমাদের দায়িত্ব: সময়ের পঁচিশ দিন আগে ড্রিলিং শেষ করতে হবে, ত্রিশ হাজার রুবল বাঁচাতে হবে।'

ড্রিলাররা একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল:

'বাহবা, করিম! দারুণ দিয়েছ!'

'খুব বেশী একটু বাড়িয়ে ফেলল নাকি?'

'আরে ও যে কারাবাখের লোক, ওরা দারুণ জেদী, কিছুতেই ছেড়ে দেবে না।'

---

* ২৮শে এপ্রিল — আজেরবাইজানে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠা দিবস। — সম্পাঃ

কে একজন হেসে উঠল। ডিরেকটর হাত তুলল।

'না, কমরেড করিম, এভাবে হয় না। তোমার দল তো এখানে নেই। তুমি নিজের লোকেদের সঙ্গে কথা বল, প্রতিযোগিতার শর্তাবলী আলোচনা কর। এসব ব্যাপারে একা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। পরে তুমি আমাদের জানাবে।'

'ঠিক আছে, কমরেড সারদারভ, তাই হবে...'

মিটিংয়ের পরে সারদারভ আরো খানিকক্ষণ আটকে রাখল করিমকে:

'বোরিং-এর কাজ কেমন এগোচ্ছে? কত মিটার কূপ খুঁড়েছ?'

'মনে হয় সব ঠিক আছে। কাল যখন আমি তীরে ফিরে আসছিলাম তখন অবধি আমরা এক হাজার আটশ' মিটার পর্যন্ত পেঁাছেছিলাম।'

'সাবধান। তোমরা সব থেকে বিপজ্জনক স্তর পর্যন্ত পেঁাছেছ। দু'হাজার পাঁচশ' মিটারের পরে মাটির মর্টার তোমাদের ঠকাতে পারে'

'আমরা জিওলজিক্যাল টেকনিক্যাল নির্দেশগুলো কঠোরভাবে মেনে চলি।'

'জানি, কিন্তু আমি বলতে চাই, বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার। খুব ভাল হত যদি আমাদের জিওলজিস্ট হুসেনাগা রুস্তামভ কাল তোমাদের সঙ্গে সমুদ্রে যেতে পারত। তোমার কি মনে হয়?

করিমের মনে পড়ল ছোটবেলার স্কুলের বন্ধু হুসেনাগাকে। কুড়ি বছরের অসাক্ষাতের পর তার সঙ্গে সম্প্রতি কয়েক মাস আগে হঠাৎ দেখা হয়।

'ভাল কথা। কথায় বলে, বেশী দুধে পায়েস নষ্ট হয় না।'

'দাঁড়াও আমি রুস্তামভকে খুঁজি, কথা বলে নাও, এক সঙ্গে যাবে।'

সারদারভ ঘণ্টার দিকে বাড়াল আঙুল পর্যন্ত বড় বড়, লোমে ভরা হাতটি। বাদামীচুলের সেক্রেটারী মেয়েটি ঘরে ঢুকে দরজার কাছে দাঁড়াল।

'রুস্তামভ ফিরেছে?'

'এক্ষুণি ফিরল।'

'এখানে ডাকুন।'

মেয়েটি বেরিয়ে গেল। এই সুযোগে করিম পকেট থেকে চামড়া বাঁধান প্যাড বার করল, তাতে কালো পেন্সিলের লেখায় ভর্তি।

'আবহাওয়া অফিসের খবর অনুসারে কাল কেবল বিকেলের দিকে হাওয়া বইবে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাই, হেমাটাইট, চূণ আর কস্টিক সোডা চাই। তা নাহলে উত্তরে বাতাস যখন আরম্ভ হবে...'

'ঠিক আছে, পাবে। আর কি চাই ?

'ডিজেল-এঞ্জিনের জন্য জ্বালানি পেলে মন্দ হত না...'

'হিসেবী বটে!' হেসে বলল সারদারভ আর তখুনি করিমকে এই সব প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি দিয়ে দেবার নির্দেশ দিল।

সে ড্রিলিং-এর গতি বাড়াবার জন্য দলগুলির প্রতিযোগিতার কথা, সংস্থার ড্রিলারদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির তাৎপর্যের কথা বলছিল।

'এমন দিন আসবে, যখন লোকেরা এই নিয়ে হাসাহাসি করবে যে, আমরা তিন হাজার মিটার গভীরতা পর্যন্ত খুঁড়েছি দেড়-দু'মাস ধরে। যেমন আমাদের অন্তত লাগে যে, তিরিশের দশকে এইরকম কূপ খোঁড়া হত প্রায়ই একবছর বা আরও বেশী সময় ধরে। সত্যি কথা বলতে কি, এখনও পর্যন্ত এই গতি যা হওয়া উচিত তার থেকে অনেক কম।'

'ঠিক। যন্ত্রের নামান এবং ওঠান যদি হিসেব করা যায়। বিশেষ করে গভীর কূপগুলিতে। কত সময় যে এভাবে বেরিয়ে যায়!'

'এখানে কাজ করার ধরণের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে...'

'হ্যাঁ, কাজ করার ধরণের ওপর নির্ভর করে।' শোনা গেল কার কণ্ঠস্বর।

করিম ফিরে তাকাল। প্রথমে ও টেবিলের দিকে এগিয়ে আসা রুস্তামভকে চিনতে পারল না। জিওলজিস্ট নিখুঁত, একটু বেশীরকমই নিখুঁত পোশাক পরিহিত, সোজা হয়ে হাঁটে। করিমের মনে হল যেন মুখজোড়া কৃত্রিম হাসি তার ভাবলেশহীনমুখে একেবারেই মানায় না।

জিওলজিস্ট সারদারভের সঙ্গে করমর্দন করল আর একবার করিমকে দেখে নিল ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে।

'তোমাদের নিশ্চয়ই আলাপ আছে।' করিমের দিকে ইঙ্গিত করে সারদারভ বলল। 'ও হল আটশ' পাঁচ নম্বরের ফোরম্যান সুলেইমানভ।'

'আমরা বহুদিন পরস্পরকে জানি।' যোগ করল করিম।

'তাহলে তো আরো ভাল... কমরেড রুস্তামভ, আটশ' পাঁচটা সমুদ্রের এক বিরাট অজ্ঞাত অংশের ভাগ্য নির্ণয় করবে। বোরিং-এর ভাগ্য সম্পর্কে আপনার আগ্রহ থাকা উচিত কেবল এসিস্টেণ্ট ডিরেকটর হিসেবেই নয়, জিওলজিস্ট হিসেবেও। কাল করিম যাচ্ছে সমুদ্রে। আপনাকেও যেতে বলি। বোরিং-এর গবেষণা করুন, স্তরগুলির স্যাম্পল টেস্ট করুন। এই যাত্রা আপনার অনেক কাজে আসবে।'

রুস্তামভের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল, সে মুখভঙ্গী করল।

'সন্দেহ আছে। ঐ অংশের স্তরগুলোর ধরণ আমি অনেক গবেষণা করেছি।'

সারদারভ উঠল।

'তাহলেও যাওয়া দরকার।'

'যদি এতই প্রয়োজন, তো যাব।'

সারদারভের কাছে এগিয়ে এসে নীচুস্বরে সে অনুরোধের ভাবে বলল:

'কালকে সন্ধেবেলায় অথবা অন্ততঃপক্ষে পরশু সকালে ফিরতে পারব কি?'

'তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। ওয়্যারলেসে কথা বলব।'

'আপনাকেই শুধু বলছি: বেশীক্ষণ সেখানে থাকতে পারব না — পরশুদিন নতুন বাড়ীতে ফ্ল্যাট বিলি করা আরম্ভ হবে। নতুন ফ্ল্যাটে চলে আসব, তারপরে আবার যাব সমুদ্রে...

সারদারভ কড়া করে উত্তর দিল:

'ফ্ল্যাট বদলাবার সময় পাবেন, কমরেড রুস্তামভ! ফিরবার জন্য তাড়াতাড়ি করবেন না।'

করিম আর জিওলজিস্ট এক সঙ্গে অফিস থেকে বেরোল। ঘন ধুসর মেঘগুলি বিরাট পাকান দড়ির মত হয়ে উত্তর-পশ্চিমে জড় হয়ে ছিল। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব দিকটা ছিল পরিস্কার, এমন দিন করিমের ভাল লাগত। সে গভীর নিঃশ্বাস নিল:

'বসন্ত... কি ভাল লাগে!'

রুস্তামভ কথা বলল না। সে তার নিজের চিন্তায় ডুবে ছিল।

করিম আর হুসেনাগার বয়স একই। ১৯২৭ সালে দু'জনেই গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের প্রথম শ্রেনীতে ভর্তি হয়। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত একসঙ্গেই পড়াশোনা করে। তারপর হুসেনাগার পরিবার বাকু চলে যায়। করিম কখনও কখনও স্কুলের পুরনো সহপাঠীর সম্পর্কে দুটো একটা খবর পেত, তারপর তাও বন্ধ হয়ে গেল। করিম আগদামে মাধ্যমিক বিদ্যালয় শেষ করে যৌথখামারে কাজ করতে লাগল। হুসেনাগাও তার পরিবারের সঙ্গে তার সব যোগাযোগই ছিন্ন হয়ে গেল আর তাদের সে ভুলেও গেল। আর তারপর কুড়ি বছর বাদে রুস্তামভের সঙ্গে এই হঠাৎ দেখা। সে ইনস্টিটিউট শেষ করে জিওলজিস্ট হয়েছে, অফিসের ডিরেক্টরের এসিসটেন্ট, তার মানে ও

সত্যি সত্যি অনেক পরিশ্রম করেছে আর সত্যিই ও এই সম্মান পাবার যোগ্য।

হুসেনাগাও, বোধ হয়, অতীতের কথা, ছেলেবেলার কথা ভাবছিল।

'তাহলে, করিম, আবার দেখা হল।' বলল সে। 'তার মানে তুমি, বোরিং মেশিনে ফোরম্যান?'

'হ্যাঁ, ফোরম্যান।'

'কাজ তো ভালই।'

হুসেনাগার এই পিঠ চাপড়ানোর ভাবে অবহেলার সুর করিমের ভাল লাগল না। তার মনে পড়ে গেল ডিরেক্টরের কামরার কথাবার্তা...

'তুমি তাহলে জিওলজিস্ট ইঞ্জিনীয়ার? অনেক খাটতে হয়েছে?'

'আর বোলো না, কত রাত না ঘুমিয়ে কেটেছে, কত যে বই পড়তে হয়েছে, আমার মাথায় যা চুল তার থেকেও বেশী বই। সিনেমা, থিয়েটার দেখি নি। এমনকি মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গেও ঘুরিনি। অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে রে ভাই।'

'তোমার সেই পরিশ্রমের ফল তো আজ তুমি পাচ্ছ!'

হুসেনাগা ঠাট্টার হাসি হেসে বলল:

'তুমি লেখা পড়া করলে না কেন? গাফিলতি?'

'গাফিলতি না।' শান্তভাবে বলল করিম। 'আমি যখন ক্লাশ সেভেনে পড়ি, কুলাকদের* হাতে বাবার মৃত্যু হয়। তারপর মা'র কঠিন অসুখ হল। গ্রামে ফিরে যৌথখামারে কাজ করতে লাগলাম। তারপর যুদ্ধ শুরু হল, চার বছর যুদ্ধে ছিলাম। তারপর তো এখানে এসে কাজে লাগলাম...'

হুসেনাগা তাকে থামিয়ে দিল:

'কাল সকালে আমরা রওনা হচ্ছি?'

'হ্যাঁ, কাল সকালে।'

'কোথায় দেখা হবে?'

'জেটিতে।'

হুসেনাগা থেমে মাথা চুলকোল।

'আমার গাড়ী আছে। আমি এসে তোমায় তুলে নেব।'

করিম না না করতে লাগল, কিন্তু হুসেনাগা জোর করতে লাগল।

---

* গ্রামের ধনী জমিদার। — সম্পাঃ

'আরে বাবা, তোমার ঘরে এককাপ চাও তো খেতে পারি। যতই হোক, আমরা পুরনো পরিচিত তো...'

'নিশ্চয়ই, যে কোন সময় এস।'

তারা সকালে রওনা হবে ঠিক করে, যে যার পথে চলে গেল।

৩

জয়নাব টেবিলে পেতেছে লাল বর্ডার দেওয়া হলুদ রঙের টেবিলকভার। প্লেট সাজিয়েছে। বারান্দার কোণায় গ্যাসের উনুনে ফুটছে মাটন সুপ। গুড়লের আর ইয়াশার একটা বড় গামলায় ধনেপাতা, পুদিনাপাতা ধুচ্ছে। করিম সোফায় বসে পড়ছিল। জিভের আর আলিয়ার সোফার কাছে ছোট কার্পেটে বসে খেলনা নিয়ে খেলছে। কখনও কখনও করিম বই থেকে মুখ তুলে বউছেলেমেয়েদের দিকে দেখছে। আবার সে ভাবল জয়নাবকে এইসব থালাবাসন, রান্নাবান্না থেকে মুক্ত করে দেওয়া গেলে কি ভালই না হত। যে মেয়ে সারাদিন রান্নাঘরে বাঁধা সে প্রকৃত স্বাধীন হতে পারে না। রান্নাঘর জয়নাবের সবটা সময় নিয়ে নেয়, এইভাবে এত বৈচিত্র্যময় ঘটনায় ভরা জীবন তার কাছে সংকীর্ণ হয়ে যাবে। যদিও জয়নাব এখনো চিন্তামুক্ত এ ব্যাপারে, কিন্তু করিম তার সম্বন্ধে চিন্তা না করে পারে না। কোন রকমে তাকে সাহায্য করতেই হবে।

স্ত্রীর ডাক তার চিন্তাধারা ব্যহত করল:

'হয়েছে পড়া, খেতে বস।'

বাচ্চারা ইতিমধ্যে খেতে বসে গেছে। সুপ থেকে ধোঁয়া উঠছে, সবাই খুব আয়েশ করে খাচ্ছে। ইয়াশার খালি ছোট মুলোর জন্য ঝুঁকছিল, তার বেশ ভাল লেগেছে যে মুলো মুখের মধ্যে খচ্‌মচ্‌ আওয়াজ করে।

স্বামী-স্ত্রী খেতে বসে সাধারণ ছোটখাট বিষয়ে কথা বলতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করিম আর থাকতে পারল না।

'এই সব রান্নাবান্না তোমার অনেক সময় নিয়ে নেয়, তাই না ?'

জয়নাব বুঝতে পারল যে এই প্রশ্ন অমনি অমনি করা হয় নি।

'হ্যাঁ করিম, সারা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতেই পারি না।'

'তোমার কি মনে হয়, মাঝে মধ্যে আমরা ক্যাণ্টিন থেকে রান্না করা খাবার কিনে আনতে পারি ?'

'আমার রান্না তোমার ভাল লাগে না ?'

'জয়নাব রাগ কোরো না, ব্যাপারটা তা' নয়। আমার খারাপ লাগে যে, তুমি সারাদিন বাড়ীর কাজেতেই আটকা পড়ে আছ, একটা বই পড়া অথবা অন্য কিছু করার সময় নেই...'

জয়নাব চুপ করে রইল। কালকে সন্ধেবেলার আলাপের বিষয়ে সে সারাদিন চিন্তা করেছে কিন্তু কোন পথ খুঁজে পায় নি। প্রথমে যে সব সন্দেহ তার মাথায় এসেছিল সেগুলো এখন হাস্যকর বলে মনে হতে লাগল। সে মনে মনে ঠিকই জানত যে, স্বামী তার ভালর কথা ভেবেই একথা বলছে।

'জান করিম, আমি অনেক ভেবেছি। আসলে আমার স্কুলে কাজ করতে ভাল লাগে। যাই হোক না কেন আমি স্কুল-টীচার। স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সেই সব দিনগুলি যখন মনে পড়ে, মন খারাপ হয়ে যায়... কিন্তু ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালেই সব ইচ্ছে উবে যায়, ওদের নিয়ে কি করব ?'

'ওদের কিন্ডারগার্টেন, ক্রেশে দিয়ে দেব। সরকার এতরকম ব্যবস্থা করেছে কি জন্য ?'

'সে কথা আমিও ভেবেছি। মন ঠিক করতে পারি না। হঠাৎ যদি অসুখে পড়ে, খারাপ কথাবার্তা শেখে... তখন তুমি আমায় দোষ দেবে। আর ছেলেমেয়ে যত বড় হয়, দায়িত্বও তত বাড়ে।'

'তুমি সবকিছু একটু বাড়িয়ে দেখ। জয়নাব তুমি বৃথাই চিন্তা করছ। কত বাচ্চা কিন্ডারগার্টেনে যায়, কিছু হয় না। আমাদের ছেলেমেয়েই বা কেন কেবল অসুখে পড়তে যাবে ? আর বাজে কথাবার্তা যাতে শিখতে না পারে নজর রাখতে হবে।'

'করিম, বলা সবই সহজ...'

এই সময় হঠাৎ গুলের তাদের কথায় যোগ দিল:

'মা, কিছু হবে না, আমাদের কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দাও। জান কি ভাল সেখানে। কত খেলনা, গান শেখায়। আমাদের ভর্তি করে দাও না, মা !'

আর চার ভাইবোন এমনকি ছোট্ট জিভেরও, একসঙ্গে চেঁচাতে লাগল:

'ভর্তি করে দাও, মা !'

'দেখছ !' হাহা করে হেসে করিম বলল। 'জনগণ আমার পক্ষে !'

'খেতে বসে চেঁচাতে নেই, চুপ কর...'

'ঠিক আছে, আর ক্যাণ্টীন থেকে খাবার আনার কথাটা ?'

'জানি না, কি বলব... ওখানের রান্না তোমার ভাল লাগবে ?'

'শোন, জয়নাব, আমাদের বাড়ীতে ত্রিশটির বেশী পরিবার থাকে। আর ক'টি মেয়ে কাজ করে ? বড় জোর জনাদশেক। আর বাকি সবাই তোমার মতই রান্নাঘরে বন্দী। সংস্থায় কথা তোল যে ক্যাণ্টীনের উন্নতি করুক, ভাল কিণ্ডারগার্টেন করুক, তাহলে আমাদের এই বাড়ী থেকে কত মেয়ে কাজে যোগ দিতে পারবে। কেউ কম্প্রেসর মেশিনে কাজ করবে, কেউ ল্যবরেটরিতে, কেউ পড়াবে, কেউ বা অফিসে বসবে। এটা কি সামান্য কথা নাকি ?'

কিন্তু তাদের কথায় বাধা পড়ল হুসেনাগা রুস্তামভ আসায়।

'অবাক হলে, নাকি ?' চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল অতিথি। 'ভেবেছ, আসব না ?'

'খুব ভাল যে এসেছ। এখুনি চা তৈরী হবে।'

হুসেনাগা বারান্দায় এল। তার হলুদরঙা হাল্কা কোটের পাড়টা কাঁপছিল। তার গায়ে সুন্দর নতুন পোশাক। ঘন সবুজ রঙের টুপিটা খুলে সে জয়নাবের দিকে এগিয়ে গেল অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে তাকিয়ে আত্মপরিচয় দিল:

'রুস্তামভ...'

টেবিলের কাছে বসার আগেই সে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল:

'তোমাদের চার ছেলেমেয়ে, একেবারে কিণ্ডারগার্টেন !'

'আপনার ছেলেমেয়ে আছে ?' জয়নাব জিজ্ঞাসা করল।

'নেই... লোকে বলে ছেলেমেয়ে জীবন নষ্ট করে দেয়.. ভয় হয়।' জয়নাব অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। যে লোক শিশুদের ভালবাসে না, তার কাছে তেমন লোকের কোন মূল্য নেই। হুসেনাগা তা না বুঝে, জয়নাবের সঙ্গে আরো কথা বলার চেষ্টা করতে লাগল।

আটশ' পাঁচের কথাও আরম্ভ হল। হুসেনাগা জোর দিয়ে বলতে লাগল যে সে বরাবরই ঐ অঞ্চলে তৈল পাবার সম্ভাবনার কথা বলেছে।

'আমার সঙ্গে একমত হচ্ছিল না, কয়েকবার আমার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে, আমার রিপোর্টগুলোকে চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে। অবশেষে আমি অন্য জিওলজিস্টদের সঙ্গে কথা বলি। তাতে কাজ হল। আমরা

প্রথম কূপ খোঁড়ার অনুমতি পেলাম। আটশ' পাঁচ যদি পেট্রল দেয়, তাহলে আমাদের দারুণ ভাগ্য বলতে হবে!'

'সংস্থার কথা থাক, তোমার আমার উন্নতি হবে, পুরস্কার পাব। তুমি কূপ খুঁড়বে, পেট্রোলের বন্যা বয়ে যাবে!'

হুসেনাগা একটু হেসে চোখ কুঁচকে বলল:

'সংস্থার কথা থাক, তোমার আমার উন্নতি হবে, পুরস্কার পাব। তুমি চিন্তা কোরো না, আমি তোমার নাম লিস্টে ঢুকিয়ে দেব। আমরা তিনজন আর তুমি চারজন, আমরা এক গাঁয়ের লোক।'

এসমস্ত করিমের কাছে দুর্বোধ্য আর অদ্ভুত। তার রাগ হতে লাগল।

'জান হুসেনাগা, আমার বাবা বলতেন, কে তোর ভাগ্নে বা গ্রামের লোক সেকথা মনে রাখিস না। নিজের কাজ সৎভাবে করে যা।'

'তোমার বাবা ছিলেন তোমার মতই আদর্শবাদী। কোন রকম সাহায্য ছাড়া মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা খুবই শক্ত। যাই বল না কেন, নিজের কথাও ভাবতে হয়।'

'নিজের কথা ভাবা মানে — আত্মীয় ও বন্ধুদের ওপর নির্ভর করা নয়,' জয়নাব যোগ করল, 'নিজের কথা ভাবা মানে জনগণের জন্য কাজ করা।'

'আরে জয়নাব-বাজী, করিম আপনাকেও আদর্শবাদী করে তুলেছে।' করিমের পিঠ চাপড়ে হুসেনাগা হেসে উঠল। করিম তার হাত সরিয়ে দিল কিন্তু হুসেনাগা একটুও ক্ষুণ্ণ না হয়ে বলে যেতে লাগল: 'জয়নাব-বাজী, আপনি ওর দিকে দেখবেন না, ও আপনাকে শুকিয়ে মেরে ফেলবে, ও যে কমিউনিস্ট, এসব কথা বলতে বাধ্য।'

জয়নাবের সহ্যের বাঁধ ভাঙল। প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করে সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল:

'আমি কমিউনিস্ট নই বটে, কিন্তু বরাবরই আমিও পার্টির অন্তর্ভুক্ত। পার্টির সঙ্গেই আমার ভবিষ্যৎ, আমার শিশুদের ভাগ্য জড়িত। আর আমার স্বামীও পার্টি সভ্য হয়েছে ব্যাক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

করিম উঠল, ঘরে একটু পায়চারি করল, আঙুল মটকাল, তারপর আবার বসে এক কাপ চা টেনে নিল নিজের দিকে। জয়নাবের মনোযোগ আকৃষ্ট হল তার অস্বাভাবিক উত্তেজিত ব্যবহারের দিকে। করিম নিজেকে সংযত করে, বিশেষ শান্তস্বরে বলল হুসেনাগাকে:

'আরো একবার বাবার কথার উল্লেখ করি। তিনি শেখাতেন: তুই যা আছিস তাই থাকবি বাবা, বাড়ীতে এক আর বাইরে অন্য, এ ভাল না। আমি মনে করি, বুড়ো ঠিক কথাই বলত।'

'ওঃ জয়নাব-বাজী!' হুসেনাগা বলে উঠল আধা ঠাট্টার সুরে। আর আধা গুরুত্বের ভাবে বলল:

'জিজ্ঞাসা করুন ওর বাবা কে ছিলেন যে, ও তাঁর জ্ঞানী উপদেশের বাইরে কিছু বলে না!'

'আমার বাবা গরীব ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি উত্তরাধিকার হিসাবে আমার জন্য রেখে গেছেন তাঁর সৎ নাম। হ্যাঁ, তিনি গরীব কিন্তু সৎ ছিলেন। আর কিছু মনে কোরো না, তিনি তোমার বাবার মত নিজের গাঁয়ের লোকেদের থেকে চুরি করা বাছুরের ব্যবসা করতেন না...'

'দরিদ্র' ও 'সৎ' এই কথাদুটির ওপর করিম বিশেষ জোর দিল। অতিথি চুপ করে ছিল, যেন ভাবছিল অপমানিত বোধ করবে না উড়িয়ে দেবে কথাটা। অবশেষে সে একটু বাঁকা হাসে হাসল:

'বন্ধু, তুমি এমনভাবে কথা বলছ যে, জয়নাব-বাজী আমাকে শত্রু ঠাউরে নেবে।'

'জয়নাব ভালই জানে যে খোলাখুলি শত্রুও আছে আবার ছদ্মবেশী অশুভকামীও আছে।'

হুসেনাগা হঠাৎ দৃঢ়স্বরে বলল:

'এ সব ফালতু। কাজ ঠিকভাবে চালিয়ে যাওয়াই হল আসল কথা। তোমাদের আটশ' পাঁচে সবকিছু আছে কি? মনে রেখ, দু'হাজার মিটার গভীরে, এঁটেলমাটির মর্টার খুব ভারী হওয়া দরকার, নাহলে ধ্বস নামবে।'

এই বিষয়ও অন্যবারের মত করিমের আগ্রহ জাগাতে পারল না, কারণ কোন কথাটা হুসেনাগা প্রাণ থেকে বলছে আর কোন কথাটা শুধুমাত্র মনোযোগ সরানর জন্য বলছে তা তার কাছে পরিষ্কার নয়, তাই অনিচ্ছের সঙ্গে উত্তর দিল:

'সব ঠিক আছে। জিওলজিক্যাল-টেকনিক্যাল দলিলপত্র অনুযায়ী কাজ চালাচ্ছি।'

হুসেনাগা চা শেষ করল।

'দারুণ চা, কড়া, অনেকদিন এমন খাই নি। আমার স্ত্রী ডাক্তার, বলে

কড়া চা হার্টের পক্ষে ক্ষতিকর। আর আমার কড়া চা খেতে ভালো লাগে।'

করিম হেসে বলল:

'ছেলেবেলায় তো তুমি সবকিছুই মাঝামাঝি পছন্দ করতে।'

'ওঃ তুমি তো ভারী ধূর্ত! বলতে চাও যে স্কুলে আমি কখনও তিরিশের বেশী পাই নি? তারপরে কত জল গড়িয়েছে...'

সে নিজের সোনার ঘড়ির দিকে তাকাল।

'কথায় বলে, ঠাট্টার থেকে ঝগড়ার দূরত্ব মাত্র এক ধাপ। যাব এবার। কাল সকালে দেখা হবে...'

সে উঠে ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে দেখল।

'হুম... তোমাদের জায়গা খুবই কম, তাই না?'

'আপনারও কি একটা ঘর?' জয়নাব জিজ্ঞাসা করল।

'তিনটি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুলায় না। সংস্থায় ইতিমধ্যে আমাকে তোমাদের কাছে ঐ নতুন বাড়ীতে চারঘরের ফ্ল্যাট দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দু'এক দিনের মধ্যে উঠে আসব।'

সে করিমকে জানলার কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে পূবে ছ'তলা বাড়ীটির দিকে দেখাল:

'দেখছ তিন তলায়, ডানদিকের ব্যলকনি? ওইটা আমার ফ্ল্যাট হবে।'

আবার সে ঘরের ভিতরে দৃষ্টিপাত করল, খাট আর অন্যান্য আসবাবে ভর্তি হওয়ায় ঘরটি আরো ছোট মনে হচ্ছিল।

'তোমরা বেশ কষ্টেই আছ। যাই হোক, তোমার পক্ষে যথেষ্ট। তোমার বাবার একটা ভাঙা ঝুপড়িও ছিল না!'

করিম জিওলজিস্টের আপাদমস্তক লক্ষ্য করল। হঠাৎ তার এই লম্বা, চালবাজ, মোটা-হতে-আরম্ভ-করা লোকটির জন্য ঘৃণা হল।

হুসেনাগা বলে চলল, 'মানুষের থাকারজন্য চাই ভাল পরিবেশ।'

'আমরা এই ঘরটিতেও ভালই আছি।' গর্বিতভাবে বলল জয়নাব। 'যদি সুখ আর আনন্দ থাকে পরিবারে তবে ছোট জায়গায়ও কিছু না!'

'তোমার দু'জন দু'জনের জন্যই যেন তৈরী। কথায় বলে, বাসনটা গড়িয়ে পড়ে গেল, ঢাকনিটাও গেল পিছু পিছু...'

করিম জয়নাবের উত্তরে খুশী আর কৃতজ্ঞতা নিয়ে তার দিকে তাকাল।

'যদি বিশ্বাস করতে হয় যে, মানুষের সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে তাহলে স্বামী-স্ত্রীর উৎপত্তি ও একই মাটি থেকে বলতে হয়।'

'সব সময় না। যেমন, আমার স্ত্রী আমার মত কারাবাখের মাটির তৈরী নয়, অন্য মাটি দিয়ে তৈরী। আমি যাই বলি না কেন, সে ঠিক তার উল্টোটা বলে।'

'বোঝা যাচ্ছে, তিনি ভাল লোক।' জয়নাবের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হুসেনোগ্যা কোট আর টুপি পরল।

'ভয় হচ্ছে, আর একটু বেশীক্ষণ থাকলে আমাদের মারপিট লেগে যাবে। চলি!'

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

করিম আর জয়নাব দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল।

'এমন লোকও হয়।' বলল জয়নাব।

'দুঃখের বিষয়, হয়!' বলল করিম।

৪

ভোরবেলায় বোরিং মেশিনে ডিউটি বদল হচ্ছিল। সূর্য দিগন্তের আড়াল থেকে উঠে এসেছে দরাজ হাতে তার রশ্মি জলে ঢেলে দিয়ে। সমুদ্রের ওপর মেঘও ছিল না, কুয়াশাও না। করিমের খুব ভাল লাগছে। দূরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার মনে হল যেন, সমুদ্র আর আকাশ দুই আয়না, একে অপরকে প্রতিফলিত করছে।

খোলা সমুদ্রে দেখা যাচ্ছে একটি বোরিং টাওয়ার। তীর দেখা যায় না এখান থেকে। টাওয়ারের স্টীলের খুঁটিগুলোর কাছে ছোট ছোট ঢেউ ফুটছিল।

ছোট একটা মোটরবোট যাচ্ছিল বোরিং টাওয়ারের দিকে। দু' সপ্তাহে এই তৃতীয়বার করিম সেখানে যাচ্ছে। প্রত্যেকবার তার মনে নতুন চিন্তা জাগে, ঠিকভাবে বলতে গেলে, একই চিন্তা প্রতিবার নতুন করে তার মাথায় আসে। আজ যেন কোন কারণে তার হৃদয়ে উত্তেজনামেশানো আনন্দের জোয়ার। কাজের প্রতি কোনকালেই সে নির্বিকার ছিল না। তার উদ্বেগ অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে লাগল। হুসেনোগ্যা বিশেষ উদ্দীপিত বোধ করছিল। সে একটানা কথা বলে যাচ্ছিল, জোরে হাসছিল। শান্ত সমুদ্রকে যেন তার মনে হচ্ছিল একটা খেলনা।

'এ যে দারুণ ব্যাপার, সমুদ্র আয়নার মতন, চমৎকার বাতাস, দ্রুতগামী মোটরবোট, আর কি চাই ?' বলল সে বিস্ময়ের সুরে।

মোটরবোট বোরিং টাওয়ারে পেঁৗছে গেল, সেখানকার ছোট্ট প্ল্যাটফর্মটা থেকে মোটরবোট পর্যন্ত লম্বা গ্যাংওয়ে দিয়ে জুড়ে দেওয়া হল। করিম আর তার দলের লোকেরা হেমাটাইট, কস্টিক সোডা, ডিজেলের জন্য জ্বালানি আর অন্যান্য জিনিস বয়ে আনতে লাগল। দু'জন ছুটি পেয়ে যাওয়া শ্রমিকও তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল। হুসেনাগা ওপরে উঠে বোরিং টাওয়ার পর্যবেক্ষণ করে দেখতে লাগল। সে কূপ থেকে উঠে এসে কাঠের নালা দিয়ে বয়ে যাওয়া এঁটেলমাটির মর্টার দেখল, মানোমিটারের দিকেও তাকাল।

যখন সবকিছু বোরিং টাওয়ারে নিয়ে আসা হল করিম ধূসর রঙের বর্ষাতির কোণাটা গুটিয়ে ধরে মোটরবোট থেকে লাফিয়ে পড়ল টাওয়ারের প্ল্যাটফর্মে। তার পেছনে অন্যরাও। রোটর-এর আওয়াজ বোরিং টাওয়ারকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

করিম চটপট এগিয়ে গেল লম্বা লোকটির দিকে। অভিবাদন জানাল, না ঘুমোন লালচে চোখগুলির দিকে তাকাল। ড্রিলার ব্রেকের থেকে হাত না সরিয়ে করিমকে অভিবাদন জানাল।

'কেমন চলছে, কিছু হয় নি তো ?'

'তেমন কিছু না। রাত্রে মর্টার খুব তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যাচ্ছিল, তা ঠিক করে ফেলেছি। তুরপুনটাও বদল করেছি।'

ব্রেকের কাছে এগিয়ে এল নতুন ড্রিলার মকরুতিচ্, ডিউটি বদল হল। সবকিছু ঠিক আছে এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত হয়ে করিম দুই ডিউটিরই শ্রমিকদের বলল:

'কমরেডরা, সবাই গিয়ে কণ্ট্রোল কেবিনে জড়ো হন। মকরুতিচ্; তুমি কাজ চালিয়ে যাও।'

যখন সবাই জড় হল করিম আরম্ভ করল: 'ফোরম্যান ইভানোভের দল আমাদের প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছে। তারা কূপ খুঁড়ছে নিফতিয়ানিয়ে কামনি থেকে একটু দূরে।'

ইভানোভের শর্তের কথাও সে বলল। ড্রিলাররা সেই শর্ত মেনে নেবার সিদ্ধান্ত নিল আরো কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করা হল আর ফোরম্যানকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হল।

যখন রাতের ডিউটির শ্রমিকরা মোটরবোটে করে ফিরে গেল, করিম আর রুস্তামভ আটশ' পাঁচ নম্বর তৈলকূপের জিওলজিক্যাল-টেকনিক্যাল তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। করিমের অনুপস্থিতিতে প্রায় একশ' পঞ্চাশ মিটার খোঁড়া হয়েছে। এখন তুরপুন দু' কিলোমিটার গভীরে কাজ করছে। বোরিং চলছে নরম স্তরগুলির ভেতর দিয়ে, তাই তুরপুন ঘন ঘন বদলাতে হচ্ছে না। একমাত্র অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে কাল রাত্রিবেলায়: ড্রিলার বলছিল মর্টার খুব তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যাচ্ছিল হঠাৎ! এটা সত্যিই অপ্রত্যাশিত, কারণ মর্টারের ওজন জিওলজিক্যাল ডকুমেণ্ট অনুযায়ী ঠিক ছিল। তার মানে জিওলজিস্টের ভুল হয়েছে... করিম একটু চিন্তা করে মর্টারের ওজন বদলাবার সিদ্ধান্ত নিল।

'আমি এর প্রতিবাদ করছি।' বলল হুসেনাগা। 'নিজের ইচ্ছে বেশী খাটিও না, তা নাহলে এক্সপেরিমেণ্ট আরম্ভ করবে আর শেষ পর্যন্ত গ্যাস বেরোতে থাকবে। তোমাকে এর জন্য জবাব দিতে হবে, জেনে রেখো! যা লেখা আছে কাগজপত্রে তাই অনুযায়ীই কাজ চালাও, মাথা গরম কোরো না।'

'আর যা লেখা আছে তা যদি অভিজ্ঞতার বিরোধী হয় আর কাজের ক্ষতি করে?'

কিন্তু রুস্তামভ নিজের মতের থেকে টপছোল না। তখন করিম বেতারে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সারদারভকে পেল। সে বলল:

'যা প্রয়োজন মনে কর, তাই কর, তোমার অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস আছে...'

তারপর রেডিওর কাছে রুস্তামভ এগিয়ে এল, সে চুপ করে সারদারভের কথা শুনতে লাগল, মাঝে মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ করতে লাগল, তারপর অসন্তুষ্টভাবে দূরে সরে গেল।

'মনে রেখো, তোমার উল্টোপাল্টা প্ল্যানের জন্য কোন ক্ষতি হলে তার দায়িত্ব সবটা তোমার।' রেগে বলল সে করিমকে। 'আমি নিজের বিপদ ডেকে আনতে চাই না।'

করিম একটু রহস্যের হাসি হেসে কণ্ট্রোল কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল নতুন মর্টার তৈরীর তদারক করতে।

সমুদ্র ফুঁসতে লাগল। হাওয়া একবার টাওয়ারে ধাক্কা মারছে, আবার চুপ হয়ে যাচ্ছে, নতুন করে ধাক্কা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। আকাশ ধূসর-কালো মেঘে ঢেকে গেল, জলের রঙ হয়ে গেল ইস্পাতের মত। করিম

সতর্কভাবে প্রতিটি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছিল। বোরিং মেশিনসমেত প্ল্যাটফর্মটা যেন এক জাহাজ আর সে এই জাহাজের ক্যাপটেন। সে তার সহকর্মীদের ভালো করে লক্ষ্য করল। এখন এই মেশিনের ভাগ্য নির্ভর করছে তাদের ধৈর্য আর ক্ষমতার উপর। তাদের সুনিশ্চিত গতিবিধি দেখে আর অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি অনুভব করে করিম আনন্দিত হল।

রাত বারটা নাগাদ আঠারো মিটার মত খোঁড়া হল। তুরপুন বদলান পর্যন্ত সব ঠিক চলল। হাওয়া কিন্তু তখনও গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঐ প্ল্যাটফর্মের ওপরে।

রুস্তামভ কণ্ট্রোল কেবিনে ঢুকে সোফায় লম্বা হল। সমুদ্রগর্জন শুনতে শুনতে ছাদের দিকে তাকিয়ে সরদারভকে মনে মনে গালিগালাজ করছিল। আর করিম আবার রেডিও যোগাযোগ স্থাপন করছিল। সারদারভ অফিসে ছিল।

'সাবধান হও, বাজপাখীরা!' সে বলল। 'ঝড়ের সম্ভাবনা আছে। খাবার দাবার, অন্যান্য জিনিসপত্র বাঁচিয়ে চল, হঠাৎ যদি কিছু পৌঁছন না যায়।'

'চিন্তা করবেন না! আমরা ঠিক থাকব।'

কথা শেষ করে, করিম টেবিলের ধারে বসে বড় কালো ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালল নিজের আর হুসেনাগার জন্য। কথাবার্তা দানা বাঁধল না। দেখা গেল, প্রায় প্রতিটি প্রশ্নেই তাদের মতভেদ...

রাত দুটো নাগাদ করিম কণ্ট্রোল কেবিন থেকে বেরোল। হাওয়া মুখে ঝাপটা মারছে, বর্ষাতির কোণাগুলো উড়ছে। এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল রোটর থেমে গেছে, কিংবা হয়ত হাওয়ার ঝাপটা সেই আওয়াজকে ঢেকে দিয়েছে। নীচু হয়ে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল মক্‌রতিচের কাছে।

'কি হল, মক্‌রতিচ্? দেখিস, আমরা যেন প্রতিযোগিতায় হেরে না যাই।'

'আমি মর্টারটা দেখেছি, সব ঠিক আছে।'

'গ্যাসের চিহ্ন নেই তো?'

'না, সব ঠিক আছে।'

দেখা গেল, করিম ঠিকই বলেছিল, মর্টার নীচে পড়ার সম্ভাবনাকে সে দূর করেছে এবং সেই সঙ্গে হেমাটাইট ও অন্যান্য বস্তু বাঁচিয়েছে।

'শোন!' বলল সে ড্রিলারের সহকারীকে। 'তোমরা কণ্ট্রোল কেবিনে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও।'

সে কন্ট্রোল কেবিনে নিয়ে গিয়ে তাদের হুসেনাগার কাছে ব্যবস্থা করে দিল। হুসেনাগা ততক্ষণে বিছানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। করিম আবার ফিরে এসে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে লাগল, মর্টার বেরোন পর্যবেক্ষণ করতে লাগল, পাম্পগুলোর আওয়াজ শুনল কান পেতে, তারপর মকৃরতিচের কাছে বসল। কাঠে মাথা হেলিয়ে দিল, হাওয়ার গর্জন আর রোটরের আওয়াজে তার তন্দ্রা এসে গেল, এমনকি আধাঘুমন্ত অবস্থায়ও সে আওয়াজ শুনতে থাকল।

... স্টীলের খুঁটিগুলিতে ঢেউ ধাক্কা মারছিল... করিমের মনে হল তাকে যেন দোলায় শুইয়ে কোথাও দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর হঠাৎ যেকোন একটা বিরাট শক্তি তাকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল বিরাট পাহাড়ের ওপর আবার সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে নীচে। আর চারদিকে সবকিছু গর্জন করছে...

করিম চোখ মেলল। সমুদ্র ফুঁসছে। সে মকৃরতিচের দিকে তাকাল, তার মনে হল: 'কি সুন্দর মুখ! এমন বিপদের সময়েও তার কোন পরিবর্তন হয় নি...'

মকৃরতিচ ব্রেকের হাতলটা সাবধানে ঘোরাচ্ছিল ঘুরন্ত চৌকোণা বস্তুটার থেকে একবারও চোখ না সরিয়ে।

সকাল পাঁচটা। হাওয়া আবার বেড়েছে। উত্তর দিক থেকে ঢেউ এসে টাওয়ারে ধাক্কা মারছে আর সবার মুখে চোখে জলের কণা ছিটিয়ে পড়ছে। এরকম আবহাওয়ায় কোন মোটরবোটই সমুদ্রে বেরোবে না।

সকাল আটটায় তুরপুন বদলাতে হল। সারা রাত নাক ডাকানোর পর হুসেনাগা কন্ট্রোলকেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

'কি ব্যাপার করিম? মর্টারে বুদ্বুদ্ নেই তো?'

'তুমি একটা আস্ত বুদ্বুদ্! সব ঠিক আছে।'

'তুমি বিপজ্জনক লোক।'

'ঝুঁকি ছাড়া ড্রিলিং-এর কাজ হয় না।'

করিম তার দিকে আর নজর দিল না। সে ব্যস্ত নিজের চিন্তায়। ড্রিলিং-এর গতি সম্বন্ধে সারদারভের সঙ্গে কথাবার্তা তার মনে পড়ল আর বুঝতে পারল — সারদারভ ঠিকই বলেছে। যদি ঠিকভাবে কাজ চালান যায়, তবে যন্ত্রের উঠান আর নামানয় যে সময় নষ্ট হয়, তা অনেকটা কমিয়ে আনা যায়। সব নির্ভর করে ড্রিলারের দৃষ্টিশক্তি, উদ্যোগ আর বুদ্ধির

উপর। এই যেমন মকর্‌তিচ ভাল ড্রিলার। সে রোটরের আওয়াজ শুনে অনেক গভীরে তুরপুন কেমন কাজ করে তা বুঝতে পারে। বোরিং-এর থিওরীর সঙ্গেও সে পরিচিত, পাম্প পরীক্ষা করতে তার ভালই লাগে, জিওলজিক্যাল স্ট্রাকচার সম্বন্ধেও একটু জ্ঞান আছে। সে খুব ভাল ফোরম্যান হতে পারবে। কিন্তু প্রায়ই ওর ভুল হয়, অবহেলা করে: সারা দিনে একবারও রোটরের চারপাশটা ধুতে বলে না, যন্ত্রপাতি নিয়ে যেখানে কাজ করবে, সেখানেই ফেলে রেখে দেবে... কিন্তু আজ সে ছিল একেবারে অন্য লোক। পুরো দিনটা ব্রেক ধরে বসেছে, সারা রাত ঘুমোয় নি, ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটার মধ্যে বসে ছিল। বোঝা যাচ্ছে সে ক্লান্ত, শীর্ণ দেখাচ্ছে তাকে...

করিম এগিয়ে গেল তার দিকে:

'কণ্ট্রোল কেবিনে যা, চা খা, ঘুমিয়ে নে দু'তিন ঘণ্টা। দরকার হলে ডেকে দেব 'খন।'

... চার দিন জোর হাওয়া সত্ত্বেও কাজ থেমে রইল না। প্রতি তিন চারঘণ্টা অন্তর অফিস থেকে যোগাযোগ করে খবরাখবর নিচ্ছিল। পঞ্চম দিনে করিম জানাল যে জল আর খাদ্যের ভাণ্ডার শেষ হয়ে আসছে। সারদারভ উত্তর দিল:

'একটু ধৈর্য ধর। সমুদ্রে যাওয়া অসম্ভব! যেই হাওয়া একটু শান্ত হবে, নিফতিয়ানিয়ে কামনি থেকে মোটরবোট যাবে। ভেঙে পড়ো না, বন্ধুরা!'

রুস্তামভ গজরগজর করতে লাগল:

'হুকুম দিতে ক্লান্তি লাগে না। চারতলা বাড়ীতে উষ্ণ ঘরে বসে আমাদের উদ্দীপিত করার চেষ্টা...'

করিম তার দাড়ি গোঁফ যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলল:

'মন খারাপ কোরো না, জিওলজিস্ট। এ জায়গাটাও খারাপ নয়!..'

পঞ্চম দিন সন্ধ্যার দিকে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। রেডিও খারাপ হয়ে গেল। রাত্রি দশটা নাগাদ বিরাট একটা ঢেউয়ের ধাক্কা কণ্ট্রোল কেবিনটাকে নড়িয়ে দিল। হুসেনাগার মনে হল যেন কণ্ট্রোল কেবিন বোরিং টাওয়ার থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে। সে ভয়ে হলুদ হয়ে গেল, একেবারে আত্মসংযম হারিয়ে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল।

'করিম, তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ ? আমরা যে ডুবে যাচ্ছি !'

করিম তার ভয়ে উত্তেজনায় বিকৃত মুখটার দিকে তাকাল, মনে হল তার মুখে একটা থাপ্পড় মেরে চুপ করিয়ে দেয়। সে হাত তুলে জিওলজিস্টের কাঁপা কাঁপা মুখে চেপে ধরল।

'চুপ কর। নিজেকে ঠিক রাখ !'

করিম বুঝতে পারল, ঢেউ এই কণ্ট্রোলকেবিনটাকে এখুনি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, এমন সময়ে বোরিং মেশিনের কাছে থাকাই কম বিপদের। করিম তাড়াতাড়ি করে বোরিং মেশিনের দরকারী কাগজপত্রগুলি আর খাবারদাবার ভর্তি বাক্সটা হাতে নিল আর জিওলজিস্টকে ধাক্কা দিয়ে বার করল কণ্ট্রোল কেবিন থেকে।

'তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি !'

কিন্তু হাওয়ার ধাক্কায় হুসেনাগা সেখানেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শ্রমিকদের মধ্যে একজন হাওয়ার বিরুদ্ধে গুঁড়ি মেরে তার দিকে এগিয়ে এল সাহায্যের জন্য। কোনরকমে সেখানে খাবারের বাক্সটা হাতে ধরে করিমও এসে পেঁছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই, বিরাট একটা কালো ঢেউ কণ্ট্রোল কেবিনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে একটা কাঠের টুকরোর মত দূরে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দিল।

হুসেনাগা ভয়ে অভিভুত চেঁচাবার জন্য মুখ খুলেছিল, কিন্তু করিম তার কানে মুখ নিয়ে চীৎকার করে বলল:

'লোকের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করলে সমুদ্রে ছুড়ে ফেলে দেব !'

হাওয়া ষষ্ঠ দিনেও কমল না। রোটর কিন্তু কাজ করেই চলল। করিমের দল আত্মসমর্পণ করল না। মানুষের ইচ্ছাশক্তির লড়াই চলছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে। মাঝরাত্তিরে ড্রিলার মকুরতিচ অর্ধচেতন করিমের কাঁধে হাত রাখল:

'আমি মর্টারটা চেক করলাম, একটু গ্যাসের ভাব আছে...'

উদ্বিগ্ন করিম উঠল।

'শীগগির ভাই, শীগগির হেমাটাইট লাগবে। ওজন কমে গেছে, মর্টারে বুদ্বুদ্ দেখা দেওয়া খারাপ। কূপের দেওয়ালের চাপ বেড়ে গেছে, গ্যাস বেরিয়ে আসতে পারে।'

হুসেনাগা হিসহিসিয়ে বলল:

'এই তোমার ঝুঁকি নেওয়ার ফল।'

সে কথায় কান না দিয়ে করিম যে বিরাট গামলায় মর্টার তৈরী করা হচ্ছিল সেদিকে এগিয়ে গেল। সে নিজে মর্টারের ওজন নির্ধারণ করল এবং মর্টার তৈরী করতে সাহায্য করল। যখন কূপের মধ্যে তা ঢালা আরম্ভ হল করিম প্ল্যাটফর্মে ফিরে এসে দেখল যে, হুসেনাগা কূপ থেকে বুদ্বুদ্ সমেত মর্টার বেরোতে দেখছে।

'এই হল তোমার আবিষ্কারের ফল। আর বড় জোর এক ঘণ্টার মধ্যে গ্যাস বেরোন আরম্ভ হবে।'

'হতেই পারে না! আতঙ্ক ছড়াস না। আর গ্যাস বেরোচ্ছে এই কারণে না যে আমরা ভারী ড্রিল দিয়ে খুঁড়ি নি, তার কারণ হল— জিওলজিক্যাল তথ্যাদি ভুল। সেখানে পরিষ্কার করে লেখা আছে যে এই অংশে গ্যাসের ভয় নেই।'

'এমন ভুল হতেই পারে...'

'হতে পারে। আমি জিওলজিস্টদের দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু সারদারভ ঠিকই আমাকে মনোযোগী আর সতর্ক হতে বলেছেন।'

হুসেনাগা অবহেলা দেখিয়ে হাত নাড়িয়ে বলল:

'জিওলজি-র জ-ও সে জানে না। বেশী উপদেশ আওড়াতে ভালবাসে।'

'সে কথা তার মুখের ওপর বলার সাহস রেখো, তার পেছনে ফুসুরফুসুর কোরো না। আমি তার সঙ্গে পাঁচ বছর কাজ করছি, সে লোককে ভাল বোঝে আর পেট্রোলকে ভালবাসে।'

'ভালবাসবে না কেন? ভালই তো আছে।'

'তুমি কিসের কথা বলছ? আমরা সবাই একভাবেই সৎ পরিশ্রম করি। প্রকৃত মানুষের কাছে কাজের ছোট বড় নেই। জনগণের জন্য যে কোন কাজেই সে আনন্দ পায়। কিন্তু এমন লোকও আছে যে সবকিছুতেই খালি নিজের লাভ খোঁজে। তাদের নিজের পকেটের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুতেই আগ্রহ নেই। তোমাকে খোলাখুলিই বলি, জানি না মিটিং-এ অথবা নিজের টেবিলে বসলে তোমাকে কেমন দেখায়, কিন্তু সাধারণ জীবনে তুমি মোটেই ভাল দেখাও না। নিজের শিক্ষার অহঙ্কার কর, বুদ্ধিমান ভাব দেখাও আর স্থৈর্য, উদ্দেশ্য কিছু নেই।'

হুসেনাগা মুখ অন্ধকার করে বসে রইল। দাড়িগোঁফ গজানো মাংসলমুখে হাত বোলাতে লাগল ঘন ঘন।

'এ সবকিছুর জন্যই তোমায় ভাল দাম দিতে হবে।' একথা বলে সে

উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ হাওয়া ভীষণ জোরে তাকে ধাক্কা দিল আর সে গড়িয়ে গেল।

... বোরিং মেশিনে অবস্থা ক্রমশই উদ্বেগজনক হয়ে উঠল। এক সময় কূপের মুখ দিয়ে মর্টার বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু ড্রিলাররা ঘাবড়ে যায় নি, মর্টারে হেমাটাইটের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে, তারা সকালের দিকে গ্যাস বেরিয়ে আসার সম্ভাবনাকে দূর করেছে।

ক্লান্ত কিন্তু জাঁকের সুরে করিম রুস্তামভকে বলল:

'বুঝলে, কে ঠিক বলেছিল? যদি আমরা প্রথমে প্রয়োজন ছাড়াই হেমাটাইট ব্যয় করতাম, এখন তাহলে কি করতাম?'

'আমি যা পড়েছি, যা শিখেছি, তাতে বিশ্বাস করি...'

'বিজ্ঞানে বিশ্বাস করা বুদ্ধির কাজ। কিন্তু বিজ্ঞান খালি বইয়েই নেই... আর আমি সেই বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি যা কাজ এগিয়ে নিয়ে যায়।'

সপ্তম দিনে সমুদ্রের গর্জন কমে এলো। হাওয়া পড়ে এলো। দূরে দেখা গেল কালোমত কি একটা জল কেটে এগিয়ে আসছে। ওটা মোটরবোট। বোরিং মেশিনের লোকেরা আনন্দে একে অপরকে অভিনন্দন জানাল। যখন মোটরবোট আর একটু এগিয়ে এল করিম তার ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা সারদারভকে চিনতে পারল, সে তাকে দেখে হাত নাড়ল... স্টীলের খুঁটির গায়ে ধাক্কা খাওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও মোটরবোট বোরিং টাওয়ারের কাছে এগিয়ে এল। মোটরবোট থেকে প্ল্যাটফর্মের ওপর ছুঁড়ে ফেলা হল চেপে মুখবাঁধা একটা বস্তা, তারপরে আরো, আরো। সেই বস্তাগুলিতে ছিল খাবার দাবার, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি। ঠিক সময় বেছে নিয়ে সারদারভ চটপট লাফিয়ে পড়ল ছোট কাঠের জায়গায়। মোটরবোটটা সরে গেল। জল কেটে সেটা তীরে ফিরে চলল।

সারদারভ যেখানে আগে কন্ট্রোল কেবিন ছিল, সেদিকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা ছাড়াই সব বুঝতে পারল যে কি ভয়ংকর দিনগুলিই না তারা এখানে কাটিয়েছে। সে করিম, মক্‌রতিচ ও অন্যদের আলিঙ্গন ও চুম্বন করল। করিম কথা বলতে চেষ্টা করছিল কিন্তু তার রক্তাভ চোখদুটি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বারবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কথা কি আর এই বোরিং টাওয়ারের প্ল্যাটফর্ম নাড়িয়ে দেওয়া ঢেউগুলোর থেকে বেশী বুঝিয়ে দিতে পারে।

শ্রান্ত ক্লান্ত কাস্পিয়ান সাগর বিরাট শহরের পায়ের নীচে শান্ত হয়ে পড়ে আছে। মোটরবোট লোক ভর্তি করে নিয়ে তীরের দিকে চলেছে। লোকগুলির সামনে দেখা দিল তাদের অতিপ্রিয় শহর। তাদের হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততর হল। প্রত্যেকের জন্যই তাদের আত্মীয়স্বজনরা ঘাটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। করিম ডেকে দাঁড়িয়ে জয়নাবের কথা ভাবছিল: কি চিন্তাই যে করেছে বেচারী তার সম্বন্ধে! তার আর তর সইছে না তাদেরকে দেখতে পাবার জন্য...

ফ্ল্যাট আর জয়নাবের কাজ নিয়ে যে বিরোধ তাদের মধ্যে চলছিল সমুদ্রে যাবার আগে তা' এখন তার কাছে এত তুচ্ছ মনে হল...

বসন্তের সূর্যালোকে শহর ও সমুদ্র ভরে গিয়েছে, কাঁচে চকচক করছে রৌদ্র আর নাগরুনি পার্কের গাছের মাথার মধ্যেও তা ঝিলমিল করছে। সবাই তীরে নামল। সারদারভ করিমকে গাড়ীতে বসাল।

তারা এসফাল্ট বাঁধান রাস্তার উপর দিয়ে চলল, যখন গাড়ী করিমের বাড়ীর রাস্তায় বাঁক নিল, যেন ডিরেকটরকে নিজের পুরনো বিশ্রী বাড়ীটা দেখানোর লজ্জা থেকে রেহাই পাবার জন্য করিম বলল:

'থামান, আমি এখানে নেমে যাব।'

'বাড়ীতে ডাকতে চাও না?' হেসে বলল সারদারভ পুরনো বাড়ীটার উঠানে গাড়ী দাঁড় করিয়ে।

'অত্যন্ত খুশী হব, আসুন একটু চা খেয়ে যাবেন!' গাড়ী থেকে নেমে বলল করিম।

সারদারভ গাড়ির জানলা দিয়ে তাকিয়ে নিল পুরনো কালো হয়ে যাওয়া নড়বড়ে বাড়ীটার দিকে আর লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

'ঠিক আছে, করিম।' আত্মমগ্ন আর অপরাধীভাবে সে বলল 'আসব কোন এক দিন।' আর নিজের মনে ভাবল: 'আমি কি রকম! সবচেয়ে ভাল কাজের লোকটা, এই পুরনো বাড়ীটায় গুঁতোগুঁতি করে থাকে।'

আর করিমের কাছে এখন এই পুরনো বাড়ীটা মনে হল স্বর্গ। সে জয়নাব আর বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা হবার আনন্দে কোন কথাই বলতে পারছে না। গলার কাছে কি যেন একটা আটকে আসছে। বোধ হয় ক্লান্তি। ধীরে ধীরে গাড়ির কাছ থেকে সরে গিয়ে দরজার বেল টিপল।

দরজা খুলে গেল আর জয়নাব কাঁদতে কাঁদতে হাসতে হাসতে তার বুকের ওপর এসে পড়ল। ছেলেমেয়েরা চীৎকার করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল...

পরের দিন করিম অফিসে গেল।

সারদারভ ছিল না। করিডরে তার দেখা হল হুসেনাগার সঙ্গে। রুস্তামভ এমন ভাব দেখাল যেন করিমকে দেখতে পায় নি। সারদারভের সেক্রেটারী ফিসফিস করে তাকে বলল যে রুস্তামভের খবর ভাল না। ও নাকি গোলেতালে সমুদ্রে নতুন পেট্রোলের জায়গা-আবিষ্কার করা লোকেদের মধ্যে নিজের নাম ঢোকাবার চেষ্টা করেছিল। এখন ওর পদাবনতি হয়েছে।

'ভালই তো, হয়ত শুধরে নেবে, বুদ্ধিমান হবে।'

'ওর মেজাজ দারুণ খারাপ।' বলল মেয়েটি। 'তাকে ফ্ল্যাটও দেওয়া হয় নি, যার জন্য সে এত হন্যে হয়ে ঘুরছিল। স্ত্রীও বলছে: 'আমাদের তিনটি ঘর। আমাদের আর দরকার কি...' ঐ জন্যেই সবাই বলে সে ভাল মেয়ে...'

আধঘণ্টা বাদে সারদারভ ফিরল।

'আটশ' পাঁচ-এর কাজ তাড়াতাড়ি শেষ কর। তোমার জন্য নতুন বোরিং মেশিন তৈরী করা হচ্ছে। টাওয়ারও তৈরী করা হচ্ছে। এবার আর তোমরা একা থাকবে না। একটু দূরে আরো দুটো কূপ খোঁড়া হবে।

'আমরা একাকীত্বকে ভয় পাই না!'

... সন্ধ্যাবেলা জয়নাব বাচ্চাদের ঘুমোতে শুইয়ে, বারান্দায় চায়ের টেবিল পাতল। চা ঢেলে সে ভীরুভাবে বলল:

'করিম, তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।'

'কি ব্যাপারে?'

'সত্যি সত্যি হয়ত আমার কাজের ব্যাপারে চিন্তা করা দরকার?.. শুনলাম পাশের বাড়ীর একতলায় কিণ্ডারগার্টেন খোলা হচ্ছে। তুমি তো জান আমি বাচ্চাদের মধ্যে থাকতে ভালবাসি...'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' জোর দিয়ে বলল করিম। তারপর একমুখ হেসে স্ত্রীর দিকে তাকাল।

মেদিনার হৃদয়

ইয়াভের স্ত্রীকে ভালবেসে সুখী ছিল। শীতকালের নিদ্রাভঙ্গের পর বনানী যেমন বসন্তের সূর্যের প্রাণদায়িনী উষ্ণ রশ্মি প্রাণভরে পান করে আর তার ফলে আরো সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, ইয়াভেরও তেমন মেদিনাকে ভালবাসার ফলে শক্তি আর সুনিশ্চয়তা বোধ করত। তার জীবন যেন এখন নতুন বিরাট অনুভূতিতে পূর্ণ। কেমন করে মেদিনাকে একটু আনন্দ দেওয়া যায়, তার একটু খুশীর হাসি দেখা যায়, সে এখন খালি সেই চিন্তাই করে। মেদিনা সাজগোজ করতে ভালবাসে না, তাই ইয়াভেরকে স্ত্রীর জন্য ফ্যাশনদুরস্ত পোশাকের খোঁজে ছোটাছুটি করতে হয় না অথবা গরমকালে সমুদ্রতীরে যাবার ব্যবস্থা করার জন্য গলদঘর্ম হতে হয় না। এসবের সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল না কারণ মেদিনা ছিল বিনয়ী আর সঞ্চয়ী। স্কুলশিক্ষক ইয়াভেরের মাইনেতে তাদের যথেষ্ট চলে যেত। মেদিনা সেই সব মেয়েদের ভালবাসত না যারা তাদের স্বামীদের বিরাট মাইনে, গাড়ী এসব সম্বন্ধে বড় বড় চাল মারত আর খুব বড় মুখ করে বলত যে প্রত্যেক নতুন পোশাক তারা পাঁচবারের বেশী পরে না। মেদিনা তাদের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করত, তাদেরকে সে হিংসাও করত না, তাদের সম্বন্ধে আলোচনাও করত না। যখন এইরকম কোনো মহিলার কথা উঠত, সে অল্প একটু হেসে, সে জায়গা ছেড়ে উঠে চলে যেত।

মেদিনা ফুল আর মাছ ভীষণ ভালবাসত। তার সারা ফ্ল্যাটটা বিভিন্নরঙের মাছে ভর্তি নানান একুয়ারিয়াম দিয়ে সাজান ছিল। ইয়াভের প্রায় প্রতি সপ্তাহেই যে দোকানে মাছ বিক্রী হয় সেখানে যেত, বন্ধু জানাশোনা সবাইকে জিজ্ঞাসা করত নতুন নতুন ধরণের মাছের সন্ধানে। ইয়াভেরের পায়ের আওয়াজ শুনে, তার ঘণ্টা টেপার ধরণে মেদিনা বুঝতে পারত যে ইয়াভের নতুন কিছু কিনেছে আজ আর ছুটে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করত। অবশ্যই ইয়াভের যদি স্ত্রীর আদর, চুম্বন পাবার জন্য

এসব করত তো বলতে হয় সে নিজেকেই বেশী ভালবাসত। যখনই সে কোন কিছু নিয়ে আসত, তার স্ত্রী কেমন ছেলেমানুষের মত আনন্দ পেত, তা দেখে ইয়াভের বেশী খুশী হত।

মেদিনা ততটাই ভালবাসত ফুল। ফুলের দোকানে যে গোলাপ, লিলি, নার্সিসাস বিক্রী হয় সে ফুল নয়। অবশ্যই সে আনন্দ পেত যখন মে মাসের অসহ্য গরম দিনে ইয়াভের বাড়ী ফিরত হাতে একগুচ্ছ সুগন্ধি গোলাপ নিয়ে। মেদিনা ফুলের তোড়াটি টেবিলের উপর রাখত, প্রতিদিন জল বদলাত, ডাঁটিগুলি একটু করে কেটে দিত, এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে তাদের বাঁচিয়ে রাখত, কখনও কখনও এমনকি একসপ্তাহ পর্যন্ত।

মেদিনা সবচেয়ে বেশী ভালবাসত চীনা গোলাপ আর সেই সমস্ত ফুল যাদের টবে জন্মান হয়, যারা শীত, গ্রীষ্মে সবসময়ই সবুজ থাকে। পথচারীরা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় মেদিনার বারান্দার দিকে তাকিয়ে তার সবুজ গাছ আর উজ্জ্বল ফুলগুলির শোভা উপভোগ করত। এগুলি প্রায় সবই ছিল ইয়াভেরের উপহার।

ইয়াভের জানত যে মেদিনার হৃদয় দয়ালু, পৃথিবীর কারুর কোন ক্ষতি সে কখনও করবে না। যখন প্রতিবেশী বা জানাশোনা কারুর কোন কিছু হত, মেদিনা অন্তর থেকে দুঃখিত হত, সাহায্য করার চেষ্টা করত। তার বেশী কষ্ট হত যদি সেই ঘটনার শিকার হত কোন অসহায় মহিলা বা ছোট্ট শিশু।

মেদিনা আর ইয়াভেরের প্রতিবেশী ছিল মারিয়াম, অসহায় এক মহিলা। তার স্বামী বারাশ ত্রিশের দশকে গ্রাম থেকে বাকুতে আসে আর এক পেট্রোল টাওয়ারে কাজ করতে আরম্ভ করে সাধারণ শ্রমিক হয়ে, তারপরে বেশ উন্নতি করে। শেষ ক' বছর সে বোরিং ফোরম্যান হিসেবে কাজ করছিল। যুদ্ধের ঠিক আগেই সে তার দেশের মেয়ে মারিয়ামকে বিয়ে করে। মারিয়ামের বয়স তখন বিশ বছর। স্কুলে মাত্র চার ক্লাস পড়েছে। সে ছিল ভীরু, লজ্জাবতী। তার স্বামীই ছিল পৃথিবীতে তার কাছে সবকিছু। আর এখন এই দুর্ঘটনা, দেড় বছর আগে জানা গেল যে, বারাশের পেটে ক্যানসার। এই দুরূহ রোগটিকে ঠিক সময়ে ধরা মুশকিল। বারাশের রোগ নির্দ্ধারিত হল এত দেরীতে যখন রোগ তার হিংস্র নখর বসিয়েছে শরীরের একটা বিরাট অংশে। ডাক্তারের আর কিছু করার ছিল না। ছ'মাস হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থেকে বারাশ শেষ নিঃশ্বাস ফেলল। মারিয়াম পাঁচবছরের মেয়ে সোনিয়া

আর দশ বছরের ছেলে নাজিমকে নিয়ে একেবারে একা হয়ে গেল। যখন মৃতদেহ বাড়ীতে নিয়ে আসা হল, মেদিনাও মারিয়ামের সঙ্গে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল, কিন্তু তারপর বুঝল এইভাবে সে মারিয়ামকে শান্ত করতে পারবে না, উল্টে তার দুঃখ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাই সে নিজেকে সামলে নিয়ে মারিয়ামকে সাহায্য করার চেষ্টা করতে লাগল। সে মারিয়ামের বাড়ীর সব কাজ করে দিত, বাচ্চাদের দেখা শোনা করত। যে সব অতিথিরা আসত মারিয়ামকে সমবেদনা জানাতে, তাদের আপ্যায়ন করত। মারিয়ামকে সে মন খারাপ করতে, ভেঙে পড়তে দিত না। রাত্তিরবেলায় ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরেও সে কেবল মারিয়ামের দুঃখের কথাই চিন্তা করত।

'জান ইয়াভের,' বলত মেদিনা, 'ও এত অসহায়, ওর মুখ থেকে রুটীর শেষ টুকরোটাও কেড়ে নাও, তাও ও কিছু বলবে না।'

ইয়াভেরের পরামর্শ অনুযায়ী মেদিনা এখান ওখান ছোটাছুটি করে মারিয়ামের বাচ্চা দুটির জন্য ভাতার বন্দোবস্ত করল, আর তৈল কারখানায় মারিয়ামের একটা কাজ জুটিয়ে দিল।

তৈল কারখানাটা ছিল বেশ দূরে। মারিয়ামকে ভোরবেলায় বেরিয়ে যেতে হত আর ফিরত সেই সন্ধ্যাবেলায়। বাধ্য, শান্ত নাজিম স্কুল থেকে ফিরে স্কুলের পড়া করত, উঠানে খেলা করত। কিন্তু ছোট্ট সোনিয়াকে দেখা শোনা করার কেউ রইল না, মারিয়ামের তাকে একা রেখে যেতে মন চাইত না, প্রথম কয়েক দিন মেদিনা সোনিয়াকে নিজের কাছে রাখল। 'কি করা যাবে। বিপদের দিনে একে অপরকে সাহায্য করাই তো উচিত,' সে বলত। শীগগিরি মেদিনা সোনিয়াকেও কাছের একটা কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দিল। মারিয়ামের জীবন আবার সহজ, অভ্যস্ত হয়ে এল, আর তাতে মেদিনা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

'তাহলে এতদিনে তোমার শান্তি হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করল ইয়াভের।

'এত শান্তি যে বলার নয়। যখন জান যে তুমি কারুর কাজে লাগছ তখন তুমি আরও ওপরে উঠে যাও।'

'সব ঠিক,' বলত ইয়াভের প্রীতিভরা চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে, 'কিন্তু, মনে রেখো, তোমাকে সবচেয়ে প্রয়োজন আমার। এক মিনিটও আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারি না...'

'আমি কি সুখী যে, ইয়াভেরের মত এমন লোকের দেখা পেয়েছি জীবনে,' ভাবল মেদিনা স্বামীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে।

ইয়াভেরও মজনুন নয় আর মেদিনারও লায়লার সঙ্গে কোন মিল নেই। কিন্তু ইয়াভের প্রকৃতই মেদিনাকে প্রাণাধিক ভালবাসত। সেও প্রকৃত সুন্দরী। প্রকৃতপক্ষে সুন্দরী মহিলা, যারা স্বামীর প্রিয় আর যারা স্বামীকে ভালবাসে তাদের সংখ্যা এমন কিছু কম নয়। ইয়াভের জানত যে, মেদিনার সুঠাম চেহারা, ফর্সা মুখ, কালো চোখ, কোঁকড়ান বাদামীচুলের বিনুনী অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ইয়াভেরের কোন ভাবনা ছিল না, সে মেদিনাকে বিশ্বাস করত। তাছাড়া সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করার অধিকার সবারই আছে। সবার চোখেই আর কিছু লোভ নেই। এমন অনেক পুরুষমানুষ আছে যারা নিঃস্বার্থভাবে সৌন্দর্য উপভোগ করে, সম্মান জানায়। আর মেদিনার অনুরাগ কখনো কখনো লায়লার কথাই মনে করিয়ে দিত।

তবুও কখনো কখনো ইয়াভেরের ঈর্ষা নড়েচড়ে বেড়াত। এমন হত যে কখনো সে নিজের ওপর সংযম হারিয়ে ফেলত, ধৈর্যচ্যুতি ঘটত তার, কষ্ট করে সে নিজেকে সামলে রাখত শক্ত কথা যাতে না বলে ফেলে। তবে দশ বছরের বিবাহিত জীবনে এমন হয়েছে মাত্র দু'-তিন বার। হয়েছে তখন, যখন ইয়াভেরের মনে হয়েছে যে মেদিনা আর কারোর সঙ্গে ঠিক তেমন ভাবেই হেসেছে যেমন স্বামীর সঙ্গে হাসে, অথবা মেদিনা তার ভেতরের পবিত্র আগুনের ভাগ যেন আর কাউকে দিচ্ছে।

ইয়াভেরের এক পুরনো বন্ধু ছিল কেরেম, শান্ত, বিষণ্ণ স্বভাবের। যখন ইয়াভেরের বিয়ে হয় নি, তারা প্রায়ই একসঙ্গে সময় কাটাত। তাদের বিয়ের এক বছর বাদে একবার ইয়াভের আর মেদিনার দেখা হয় কেরেমের সঙ্গে অপেরা হলে। তাদের বসার জায়গাও ছিল কাছাকাছি। সর্বদা শান্ত, বিষণ্ণ কেরেম মেদিনাকে দেখে যেন জীবন্ত আর বাচাল হয়ে উঠল। তিন দিন পরে সে ইয়াভেরকে ফোন করল:

'কিহে বন্ধু, বিয়ে করলে, ঠিকানাটাও তো দিলে পারতে, নেমন্তন্নও তো করলে পারতে। আমাকে কি এক গেলাস চা খেতে ডাকাও যায় না?'

বিভিন্ন অজুহাতে কেরেম কয়েকবার তাদের বাড়ী এসেছে। ইয়াভের লক্ষ্য করল মেদিনার প্রতি তার একাগ্র চোখের দৃষ্টি আর বিরক্তি ধরানো মিষ্টি কথাবার্তা আর ভঙ্গী, সব বুঝল। কেরেম অত্যন্ত অশ্লীল। একবার সে চলে যাওয়ার পরে ইয়াভের সতর্কভাবে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল:

'মেদিনা, এই কেরেমকে আমার কেমন যেন ভাল লাগে না। তোমার কি মনে হয় ?'

মেদিনা চাপা হাসি হাসল।

'খারাপ কিছু ওর ভেতরে আছে বলে ত' মনে হয় না। কেন বল তো ?'

এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের এমন নিশ্চিন্ত উত্তর তার মনে খুব আঘাত দিল। কষ্টে রাগ চেপে সে বলল:

'মেদিনা, তুমি লোক চিনতে পার না, সবাইকে বিশ্বাস কর, মনে কর পৃথিবীতে একটাও খারাপ লোক নেই।'

মেদিনার প্রথম থেকেই কেরেমকে ভাল লাগে নি, সে তাকে আপ্যায়ন করত ইয়াভেরের বন্ধু হিসেবেই, সেই জন্যই ইয়াভেরের এই কথাগুলি তার কাছে হাস্যকর মনে হল। তার ইচ্ছে হল, স্বামীকে আর একটু জ্বালাতন করে, শিক্ষা দেয়। কেরেমের মত লোকের ব্যাপারে ঈর্ষা !

'না ইয়াভের, আমার ধারনা কেরেম মোটেই সচ্চরিত্র নয়। কিন্তু আমি কেবল জানি, সে মানুষ, মানুষে বিশ্বাস রাখা উচিত।'

ইয়াভের বিরক্ত হয়ে উঠছিল। 'আমি বলছি: এমন ব্যবহার কর যেন ও আমাদের এখানে আর না আসে আর ও বলছে: মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়। ও কি বুঝতে পারছে না, কেরেম কি ধরণের লোক ?' ইয়াভেরের ইচ্ছা করছিল মেদিনাকে একটা শক্ত কথা বলে কিন্তু কষ্টে নিজেকে সংযত করল। সে খালি দুঃখিতভাবে মাথা নাড়াল।

'যদি তুমি সবাইকে এইভাবে বিশ্বাস করবে, তাহলে আমাদের কি যে হবে ?'

স্বামীর কথায় তার দুঃখের আঁচ পেয়ে মেদিনা তাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করে স্বাভাবিক সুরে বলল, 'বিশ্বাস কর, মেদিনাকে প্রথম দিন তুমি যেমন দেখেছিলে সে শেষ পর্যন্ত তেমনই থেকে যাবে, তাকে তেমনি অকলঙ্কই কবরে শুইয়ে দেবে।'

ইয়াভেরের সমস্ত সন্দেহ বসন্তের মত উড়িয়ে দেবার জন্য মেদিনার একটা কথা, একটা মৃদু হাসি, একটা ভঙ্গীই যথেষ্ট ছিল। ইয়াভের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্বস্তির হাসি হাসল আর লজ্জিত হয়ে ভাবল, 'কি যে সব ভাবনা চিন্তা আমার মাথায় আসে ? আমি কেমন ধরণের লোক যে আমার মেদিনার নিষ্ঠায় সন্দেহ করি ?'

পরের বার মেদিনা কেরেমকে এমন আপ্যায়ন জানাল যে সে আসা বন্ধ করে দিল।

ইয়াভের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিল। সে পড়াতে আরম্ভ করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, বাবা ফ্রণ্ট থেকে ফিরলেন পঙ্গু হয়ে, পরিবারটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হল। ইয়াভেরের বাবা সুলতান অফিসার হয়ে ফ্রণ্টে গিয়েছিলেন। চার বছর ধরে যুদ্ধ করেছেন, গোলাবোমা তার চারপাশ দিয়ে উড়ে গেছে, তার বন্ধু কমরেডদের আঘাত করেছে, কিন্তু তিনি বেঁচে গেছেন। আমাদের সৈন্যদল ইতিমধ্যে জার্মানিতে গিয়ে পেঁছৈছে। সুলতান আশা করছিল যে শীগগিরই অক্ষত অবস্থায় বাড়ী ফিরবে। এই সময়ই ভাগ্য যে চোরের মত পা টিপে টিপে তাঁকে অনুসরণ করছিল, সুযোগ খুঁজছিল, আর হঠাৎ কঠিন আঘাত হানল। বার্লিনের আশেপাশে শেষ লড়াইগুলির সময়ে একেবারে ঘাঁটির কাছে একটা বোমা ফাটল, গোটা বাড়ীটা ধ্বংস হয়ে গেল। তিনজন অফিসার মারা গেল। সুলতান আর দু'জন সৈন্যকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে দিল, তারা ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে গেল। সুলতান হাসপাতালে চোখ মেললেন। ডান হাতটা পঙ্গু হয়ে গেছে, সেখানে পচন আরম্ভ হওয়ায়, তাকে কেটে বাদ দিতে হয়েছে, দৃষ্টি শক্তিও হারান তিনি। বহুদিন চিকিৎসার পরে তিনি বাড়ী ফিরলেন। বাবার কষ্ট কমাবার জন্য ইয়াভের কত চেষ্টাই না করেছে। হাসপাতাল, স্যানাটোরিয়াম, সমস্ত রকমের ওষুধপত্র সবই চেষ্টা করা হয়েছে। ইয়াভেরের মা বাদাম-খালাকে রুগীর বিছানার কাছ থেকে নড়ান যেত না, তাই ইয়াভেরকেই ছোট ভাইবোনেদের কাছে মা-বাবা দুইয়েরই অভাব পূরণ করতে হয়েছে।

জীবনের কষ্টে কাটান দিনগুলি বিভিন্ন জনের ওপর বিভিন্ন ধরণের প্রভাব ফেলে: কারুর হৃদয় প্রস্তরের মত কঠিন হয়, আবার কারুর হৃদয় হয়ে ওঠে দয়ালু, আশপাশের সবার প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ। ইয়াভের হল এই দ্বিতীয় ধরণের লোক। সুলতানের মৃত্যুর শোক, ইয়াভেরের মায়ের শোকে একেবারে বুড়িয়ে যাওয়া, ছোটোছোটো ভাইবোনেদের চোখে জমে থাকা বাবার বিচ্ছেদের বেদনা এসবই ইয়াভেরের হৃদয়ে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেল, আর তাকে করে তুলল আরো সহৃদয় ও সংবেদনশীল। স্কুলে সারাদিন বাচ্চাদের সঙ্গে থাকার ফলে তার হৃদয়ে আরো দয়ার সঞ্চার হল। জীবনের কতকগুলি অন্ধকার দিক, কিছু নোংরা ও নিষ্ঠুর প্রথা যা বহু

পুরুষ ধরে চলে আসছে, তা সে কিছুই জানত না। সে মেদিনাকে দোষ দিচ্ছিল সবাইকে বিশ্বাস করার জন্য, আসলে সে নিজেই ছিল শিশুর মত সরল আর অল্পেই সবাইকে বিশ্বাস করত। কে জানে তার মত পুরুষের ভাগ্য কি ঘটত যদি সে মেদিনার মত অকপট ও উদার মেয়েকে বিয়ে না করে কোন লঘুচিত্ত, খারাপ স্বভাবের মেয়েকে বিয়ে করত...

মেদিনার প্রতি তার ভালবাসা ছিল যেন তার সবার প্রতি বিশ্বাস আর ভালবাসারই একটা অংশ। কেরেমের ঘটনার পরে সে স্ত্রীকে আরো বেশী ভালবাসতে লাগল। পাঁচদিনের বিচ্ছেদ তার কাছে মনে হতে লাগল যেন একটা গোটা বছরের বিচ্ছেদের বেদনা। যখন ইয়াভের স্কুল থেকে ফিরে বাকুর পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত নতুন বাড়ীগুলির একটিতে নিজের দু' ঘরের ফ্ল্যাটের দরজায় বেল টিপত, যখন সে মেদিনার সুন্দর গলা শুনত, আবার তার সঙ্গে মিলিত হত, তখন তাকে দেখতে হয়। তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, নিজের কাজে খুশী, সমস্ত লোকের ওপর, পৃথিবীর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে সে করিডরে পা দিত, স্ত্রীকে চুম্বন করে তিনবছরের ছোট্ট মেয়ে লায়লাকে কোলে নিয়ে বুকে চেপে ধরত, গালটা এগিয়ে দিয়ে বলত: 'বাবাকে একটা চুমো দে।' যদি বাবার মুখ পরিষ্কার দাড়ি কামান হত তবে মেয়ে বাবাকে আদর করত আর যদি তা না হত তাহলে মেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে দূরে সরে যেত আর ছোট ছোট হাতদুটি দিয়ে বাবার গাল ছুঁয়ে বলত: 'খোঁচা লাগে...'

আজও যেই বেল বাজল, মেদিনার সুন্দর গলা শোনা গেল, 'যাই' আর সে দরজার দিকে এগোল। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল ইয়াভের একা নয়। দরজা খুলে সে বিস্ময়ে পিছিয়ে গেল, ইয়াভেরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক, বড়সড় চেহারা, বাদামী চোখ। তার মাথায় টুপি ছিল না, ঘন কোঁকড়ান চুল কপালে এসে পড়েছে। রোদেপোড়া মুখে সুখী মানুষের হাসি। তার সাদা সিল্কের শার্ট ধূসর রঙের পশমের ট্রাউজারের ওপরে ফেলা ছিল। তার জামার লম্বা, চওড়া হাতাগুলিতে কাফ ছিল না, তাই তার হাবভাব মনে হচ্ছিল যেন আরো খোলামেলা। মেদিনা সঙ্গে সঙ্গেই তাকে চিনতে পারল। ও হল রসিম, তারা স্কুলে ক্লাস সেভেন থেকে শেষ ক্লাস পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছে।

কি বদলে গেছে রসিম। যেন একেবারে পালোয়ান ফরহাদ — সেইরকমই সুগঠিত, শক্তপোক্ত। তার কাছে ইয়াভেরকে দেখাচ্ছে কি ছোট্ট, মলিন,

দুর্বল। যেন যে ঘরে এতক্ষণ মোমবাতি জ্বলছিল সেখানে হঠাৎ উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলো জেলে দেওয়া হয়েছে। যুবকটিও মেদিনাকে চিনতে পেরে যেন মনে হল বিস্ময়ে কেঁপে উঠল। তার বড় বড় বাদামী চোখে স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। ছোট্ট, রোগা, রোদেপোড়া স্কুলের ছাত্রী মেদিনা কি সুন্দর হয়েছে, যেন গোলাপফুলের মত ফুটে উঠেছে।

স্কুলে থাকার সময়েই রসিম চমৎকার ছবি আঁকত। দেয়ালপত্রিকার প্রায় প্রতি সংখ্যায় তার আঁকা ছবি স্থান পেত। বন্ধুরা আর বিশেষ করে উঁচু ক্লাশের ছাত্রীরা তাকে রেহাই দিত না, সবসময়েই সমুদ্রের দৃশ্য, কুমারী বুরুজ, নিজেদের ছবি অথবা স্কুলের বাড়ী এঁকে দেবার জন্য অনুরোধ করত। গত তিন-চার বছরে মেদিনা প্রায়ই খবরের কাগজে তার নাম পড়েছে, রেডিওতে শুনেছে 'প্রতিভাবান শিল্পীর' অনেক প্রশংসা। কিন্তু মেদিনা জানত না যে রসিমের সঙ্গে তার স্বামীর পরিচয় আছে। সে জানত না যে, এই সেদিন মস্কো থেকে ফিরবার সময় তার স্বামী রসিমের সঙ্গে এক কুপেতে এসেছে। তিন দিন তারা একসঙ্গে ছিল, খাওয়া দাওয়া একসঙ্গে করেছে, অনেক গল্প করেছে, দু'জনেরই পরস্পরকে খুব ভাল লেগেছে। আর এখন হঠাৎ রাস্তায় দেখা হওয়ায় ইয়াভের রসিমকে কিছুতে ছাড়ে নি, বাড়ীতে ধরে নিয়ে এসেছে।

মেদিনা এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে লাল হয়ে গেল, সে যে আগেই রসিমকে জানত সে কথা বলার অবকাশ পেল না, ইয়াভের তাদের পরিচয় করিয়ে দিল। চেককাটা এপ্রনে হাত মুছে মেদিনা হাত এগিয়ে দিল, শিল্পী মেদিনার হাতে চাপ দিয়ে ইয়াভেরকে বলল:

'মেদিনা-খানুমের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়, একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি।'

মেদিনা আবার লাল হয়ে গেল। তার মনে হল তার নিজেরই একথা বলা উচিত ছিল স্বামীকে। কেন যে সে রসিমের আগেই সেকথা বলল না। যদি ইয়াভের কিছু সন্দেহ করে বসে? কিন্তু ইয়াভের তাতে তেমন গুরুত্ব দিল না।

'তাই নাকি? তবে তো আরো ভাল!' চীৎকার করে বলল সে। মেদিনার দিকে একটা ছোট্ট কাঁচের শিশি এগিয়ে দিল, তার ভেতরে একটা ছোট্ট মাছ ছোটাছুটি করছে। 'চীনা মাছ, সহজে পাওয়া যায় না'

মেদিনা শিশিটা নিল। ইয়াভের শিল্পীকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল।

'আসুন, যতক্ষণ মেদিনা আমাদের জন্য কিছু খাবার তৈরী করে, আমি আপনাকে ওর ফুলবাগান দেখাই।'

মেদিনা একটু রাগভাব নিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাত ইসারায় তাকে কাছে ডেকে ফিসফিস করে বলল:

'আমার আজ তেমন কিছু রান্না হয়নি। তুমি সবসময় এমনি কর। কি যে তোমার স্বভাব, কিছু না বলে ক'য়ে হঠাৎ অতিথি নিয়ে হাজির। সকালেও তো বলতে পারতে। ভাল কিছু রান্না করতাম।'

ইয়াভের হঠাৎ ভীষণ জোরে মেদিনার কথার উত্তর দিল:

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, যা আছে দাও। ওই যে বলে না, যা আছে তাতেই আনন্দ। রসিমের সঙ্গে হঠাৎ দেখা।'

রসিম বুঝল কি কথা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সেও যোগ দিল:

'ইয়াভের আমাকে ডাকল আর আমিও চলে এলাম। দেখেছেন, আমি কেমন নির্লজ্জ অতিথি?'

মেদিনা তার বড় বড় মনোযোগী চোখের থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল:

'সর্বদা স্বাগতম। আমি আজ দলমা রান্না করেছি।'

'ওরে বাবা, দারুণ!' বলে উঠল রসিম, আর তারপরেই নিজের চিন্তায় ডুবে গেল অন্যমনস্ক লোকেদের মত।

কিন্তু ইয়াভের মনে হল, কিছু লক্ষ্য করল না। 'ভাল কথা, যে আজ আমার স্বামীর মেজাজ ভালো, অন্য দিনের মত সব কিছুতে নজর দিচ্ছে না,' ভাবল মেদিনা আর তারপর নিজের ভাবনায় তার নিজেরই লজ্জা হল, 'কি এমন হয়েছে? যেন আমি ওর কাছ থেকে কিছু লুকোতে চাচ্ছি...'

'বাবা, এসেছে,' চেঁচিয়ে উঠল ছোট্ট লায়লা। তার দুটি সরু বেনীতে লাল টকটকে ফিতে বাঁধা। পাশের ঘর থেকে সে ছুটে এসে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেদিনা রান্নাঘরে চলে গেল। মেয়েকে চুমা খেয়ে ইয়াভের রসিমকে দেখিয়ে বলল:

'এই কাকুমণির সঙ্গে ভাব করে নাও। এ খুব ভাল ছবি আঁকে। তোমার জন্যে ছোট্ট মানুষ, মোরগ, শিয়াল সব এঁকে দেবে।'

লায়লা ভীবুভাবে চেয়ে দেখল রসিমের দিকে, কিন্তু আর প্রথম ডাকেই হাত বাড়িয়ে গেল তার দিকে। তাতে ইয়াভের খুব খুশী হল। বাড়ীতে আসা অতিথিরা কে কেমন এইভাবে পরীক্ষা হয়ে যেত লায়লার মাধ্যমে।

যদি সে প্রথমেই অতিথির সঙ্গে ভাব করে নেয়, তাহলে বোঝা যায় অতিথি লোক ভাল: আর যদি কারুর কাছে যেতে চাইত না তার মানে সে ভাল লোক নয়।

'মেদিনা, দেখ, দেখ,' রান্নাঘরের দরজা একটু খুলে ইয়াভের চেঁচিয়ে বলল, 'রসিম কেমন লায়লার সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে।

মেদিনা রান্নাঘর থেকে না বেরিয়েই জবাব দিল: 'খুব ভাল কথা।'

ওদিকে লায়লা ছোট ছোট হাত দিয়ে রসিমের নাক ধরে বলছে:

'কাকুমণি ভাল।' সেই থেকেই রসিমকে এবাড়ীতে 'ভালকাকু' বলে ডাকা হতে লাগল।

৪

রসিমকে দেখে মেদিনা কেন লাল হয়ে উঠল আর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। হতে পারে, স্কুলজীবনে তাদের মধ্যে কোন একটা কিছু যোগ ছিল, বা মেদিনা রসিমকে ভালবাসত আর রসিম তার প্রতি মনোযোগ দিত না। রসিম তখনই তো সুন্দর ছিল। সুন্দর, সুঠাম চেহারায় আর প্রতিভায় সমবয়সীদের থেকে সে সবসময়ই উপরে ছিল। অন্য মেয়েরা তো তার থেকে চোখ সরাত না। কিন্তু মেদিনা সে ধরণের নয়। এমনকি চোখের কোণ দিয়েও সে রসিমের দিকে দেখত না। রসিমের উপস্থিতিতে তার কোন পরিবর্তন হত না। হতে পারে যে, রসিম আকৃষ্ট হয়েছিল মেদিনার প্রতি কিন্তু মেদিনার উদাসীনতা বুঝতে পেরেছিল? না, তাও ঠিক নয়, তখন রসিমের মাথায়ই আসতে পারত না আরো সুন্দর সুন্দর, তার সঙ্গে আলাপ জমাতে ইচ্ছুক মেয়েদের ছেড়ে মেদিনার দিকে নজর দেবার। রসিম খালি জানত যে মেদিনা সব থেকে ভাল ছাত্রী, এমনকি অঙ্কেও তার সব থেকে বেশী নম্বর। যাই হোক, একথা সবারই জানা আছে যে কোন মেয়ে কেবলমাত্র অঙ্কে বেশী নম্বর পাওয়ার জন্যই তার প্রেমে পড়ে না কেউ।

মেদিনার মন এত অস্থির কেন? কেন সে রান্নাঘর থেকে বেরোতে পারছে না, কেন ভয় পাচ্ছে রসিমের সঙ্গে টেবিলে বসতে? এই সব ভাবনায় মেদিনা নিজেই অবাক হয়ে গেল। সে তার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়েছে অনুভব করে বিস্মিত হল। 'আমার হল কি?' ভাবল সে।

সত্যি, মেদিনা তার অদ্ভুত আচরণের কারণ বুঝতে পারছে না। মানুষের হৃদয় সত্যি বড় অদ্ভুত, এত অজানা গোপন কথা আছে তার।

মেদিনা এখন খালি চাইছে যে, তাড়াতাড়ি যেন খাওয়া-দাওয়া চা-এর পালা চুকে যায়, রসিম যেন তাড়াতাড়ি চলে যায়, যাতে সে আবার তার প্রিয় স্বামীর সঙ্গে, ছোট্ট মেয়ের সঙ্গে একা থাকতে পারে। আজ যেন কেউ তাদের পরিবারের শান্তি, সুখ নষ্ট না করে। কিন্তু মেদিনার ইচ্ছা সত্ত্বেও রসিমের চলে যাবার কোন তাড়া দেখা গেল না আর ইয়াভেরও তাকে ছেড়ে দেবার আগ্রহ দেখাল না। খেতে বসে যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল, চা খাওয়ার সময়েও তা চলতে থাকল। কখনও ইয়াভের আর রসিম ভীষণ তর্ক জুড়ে দিচ্ছিল আবার কখনও কখনও ধীরে ধীরে কথা বলছিল। যখন রাতের অন্ধকার নামল, শহরের উজ্জ্বল আলোগুলো জ্বলে উঠল, ইয়াভেরের অনুরোধে আবার চা তৈরী করে এনে মেদিনাও সেই আলোচনায় যোগ দিল।

আলোচনা চলছিল সঙ্গীত বিষয়ে। এই বিষয় নিয়ে তখন বাড়ীতে, থিয়েটার হলে, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ভীষণ তর্ক হত।

যেই তারা খেতে বসল, রেডিওতে সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচারের কথা ঘোষণা করা হল।

'দেখা যাক, কি শোনায়,' বলল ইয়াভের রেডিও খুলে, 'আপনি সঙ্গীতের ভক্ত ?'

'ভক্ত, কিন্তু সব ধরণের সঙ্গীতের নয়।' বলল রসিম। 'সত্যি কথা বলতে কি, এমন কিছু সঙ্গীত আছে যা আমি সহ্য করতে পারি না।'

ইয়াভের নিজের মতের লোক খুঁজে পেয়ে খুশী হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল। তার চোখ যেন বলছিল: 'দেখছ, খালি আমি একাই না, ও যে নিজেই শিল্পী, শিল্প বোঝে ওরও ভাল লাগে না।'

ইয়াভের অমনি অমনি তাকায় নি স্ত্রীর দিকে। প্রায়ই স্ত্রীর সঙ্গে গান শুনতে শুনতে সে হঠাৎ রেডিও বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ তার সে গান ভাল লাগে নি। এখন ইয়াভের এমন একজন জোরাল সমর্থনকারী পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠল।

'আমারও তাই মত। কখনও কখনও এমন গান দেয়, যেন মগজ খুঁড়তে থাকে। আর তার নাম দেওয়া হচ্ছে আধুনিক, নতুন আরও কত কি। আর সেই সঙ্গীত যেন কাঠের তক্তার মত মানুষের বুকে আঘাত করে, গুমগুম আওয়াজ তোলে, আবার আঘাত করে — কোন কিছু বোঝার চেষ্টা করে

পারবে না। মাথা ফেটে যায়, ক্লান্ত হয়ে পড়ি, নার্ভ উত্তেজিত হয়। আমার ধারণায় — সঙ্গীত কখনই দুর্বোধ্য কতকগুলি ধ্বনির এলোমেলো সংযোজন নয়, সঙ্গীত মানুষের হৃদয়ে উল্লাস আনে, অনুভূতি বৃদ্ধি করে। আমি কি ঠিক কথা বলছি না?'

মৌদিনা রসিমকে লক্ষ্য করে দেখতে থাকল: তার ভঙ্গী, কথা বলার ধরণ, কণ্ঠস্বর নরম ও পরিষ্কার এবং মুখে ধরে থাকা অবিচলিত হাসি। তার ভেতরে অদ্ভুত এক স্থৈর্য সবাইকে তার দিকে আকৃষ্ট করে। তার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। বিনয় দেখিয়ে সে কখনও তর্কে পিছিয়ে থাকে না। ইয়াভেরের প্রশ্নে তার উত্তর মৌদিনার কাছে মনে হল অকপট আর প্রত্যয়জনক।

'মনে হচ্ছে, ইয়াভের, আমরা দু'জনেই সঙ্গীত একরকমই বুঝি। আপনি যে জিনিসটার কথা বলছেন আমরা শিল্পীরা তাকে বলি ইমোশন্যাল আর্ট। আমিও অবশ্য এই আর্টেরই ভক্ত। কিন্তু যে সব শিল্পীরা অনুভূতিহীন হৃদয়ের অধিকারী, তারা তাদের এই অনুভূতিহীনতা ঢাকবার জন্য, ঐ যে আপনি বললেন বিষয়ের আড়ালে গা-ঢাকা দেয়। কেউ কেউ তাদের প্রতিভাহীনতা ঢাকবার চেষ্টা করে, আবার কেউ অল্পে খ্যাতি লাভের চেষ্টা করে।'

ইয়াভের তার প্রতিটি কথা উপভোগ করছিল, আর কষ্ট করে নিজেকে ধরে রাখছিল যাতে ছুটে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন আর চুম্বন না করে বসে।

'বন্ধু হে, তোমার যা সম্বন্ধে ইচ্ছে হয় লেখো, আপত্তি করব না, কিন্তু লেখো প্রাণ থেকে, যেন তা মনকে নাড়া দেয়।'

'ঠিক বলেছেন। যেখানে অকপটতা, প্রাণের সাড়া নেই, সেখানে কোন আর্টই থাকতে পারে না। যখন আধুনিক যুগের কথা লেখা হয় তখন অকপটতার বিশেষ প্রয়োজন যে সব লেখকরা নিজেদের বিভিন্ন খুঁত বিষয়ের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখেন, তাঁরা একথা বুঝতে পারেন না যে, প্রকৃত আধুনিকতা চিরকালই আবেগময় প্রকৃত সাহিত্যের জন্ম দিয়েছে। দুর্বল সাহিত্যকে কখনও আধুনিক ও নতুন বলা যায় না।'

ইয়াভের আর রসিমের কথায় এমন সময় মৌদিনাও যোগ দিল, ঠাট্টা করে মন্তব্য করল রসিমের উদ্দেশ্যে:

'আর আপনাদের শিল্পীদের কেন এমন দোষে দোষী করা হয় না? আমি এমন ছবি দেখেছি যা দেখে মনে হয় তা কোন ছুতোরের সৃষ্টি।

প্রাণ ভরে ছবিতে যেখানে যেমন খুশী রঙ মাখিয়ে রেখেছে। এ সম্বন্ধে আপনারা চুপ কেন?'

রসিম বড় বড় বাদামী চোখে চাইল মেদিনার দিকে। তার কথায় কোন গোপন ইঙ্গিত খুঁজে না পেয়ে সবিনয়ে উত্তর দিল রসিম:

'আপনি ঠিক বলেছেন, মেদিনা-খানুম। সত্য কথার সামনে আমি মাথা নীচু করি। সত্যি সত্যি এমন ছবি হয় যা দেখে অকর্মা ছুতোরের কথাই মনে পড়ে। কিন্তু সব ছবিই তো আর এমন নয়। এমন সৃষ্টিও আছে, যা সত্যি সত্যি আনন্দ দেয়। মনে রাখবেন, আমরাও খুঁজি, পাবার চেষ্টা করি প্রয়োজনীয় রঙ, প্রয়োজনীয় টান, ভাব যার সাহায্যে আমরা যুগের মনোভাবকে প্রকাশ করতে পারি। আমরা প্রকৃত চেষ্টা করি। আমরা সৃষ্টি করি, কাউকে নকল করি না। একেও মূল্য দেওয়া উচিত।'

এমন সময়ে রেডিওতে জাতীয় সঙ্গীত 'রাস্ত' আরম্ভ হল। ইয়াভের রেডিওর চাবি ডান দিকে একটু ঘুরিয়ে দিল। জোরে বাজনা আরম্ভ হল।

'এই হল আসল সঙ্গীত! প্রাণে সাড়া জাগানো!' উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল ইয়াভের।

'রাস্তের' সুর যা নিয়ে আসে জীবনের প্রতি, সংগ্রামের প্রতি আহ্বান, ইয়াভেরকে প্রকৃত আনন্দ দেয়।

'এমন সঙ্গীত অনন্তকাল ধরে শোনা যায়।' সে বলল উচ্ছ্বসিত হয়ে।

'রাস্তের' পরে লোকসঙ্গীতের এক বাজনা আরম্ভ হল। তাও ইয়াভের খুশী হয়ে শুনল। কিন্তু তারপরে যখন সিমফনি অর্কেস্ট্রা একটা অতি সাধারণ সুর বাজাতে আরম্ভ করল, ইয়াভের রেডিও বন্ধ করে দিল।

'কিছুই বোঝা যায় না, খালি ক্যাঁ কোঁ আওয়াজ। জানেন রসিম, আমার মনে হয় আমাদের সুরকাররা আমাদের লোকসঙ্গীতকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। আসল পথ থেকে তারা সরে গেছে। ভয় হয়, যে তারা এত দূরে সরে যাবে যে আমাদের কথাও আর শুনতে পাবে না। মাফ করবেন কিন্তু একটা প্রবাদ আছে, দল থেকে পিছিয়ে পড়া বাছুরটাকে নেকড়ে ধরে। ঠিক কিনা, অ্যাঁ?'

রসিম চিন্তায় ডুবে গেল। বোধ হয় সে সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত প্রকাশ করতে চাইল না। আর ইয়াভের ধৈর্যহীন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তার সমর্থনের আশায়।

'এমন হয় ঠিকই,' ধীরে ধীরে আরম্ভ করল রসিম, 'কিন্তু অধিকাংশ

খোঁজে। আপনি আমার সঙ্গে একমত যে আর সবকিছুর মত সঙ্গীতেরও বিবর্তন দরকার? একমত যে, মানুষ চার দেওয়ালের মধ্যে আটকা পড়ে থাকলে তার উন্নতি হয় না? ছোটবেলায় বাবার কাছে শোনা একটা গল্প মনে পড়ে। পঁচিশ সালে তাঁকে একবার কেলবেজারী এলাকায় যেতে হয়। তখন এখনকার মত রাস্তাঘাট ছিল না। শীতকালে পাহাড়, উপত্যকা সব কিছু তিনমাসের জন্য তুষারের নীচে অদৃশ্য হয়ে যেত। কেলবেজারী ছিল চারপাশের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন জায়গা। বাবা গিয়ে হাজির হলেন এই অঞ্চলের একেবারে গভীরে, ইয়ানশাগ গ্রামে, মুরোভ্‌দাগ পাহাড়ের নীচে সবথেকে দুরূহ জায়গায়। বাবা সেখানে একজন নব্বই বছরবয়সী স্থানীয় কবি-গায়কের দেখা পান, সে নিজেই গান রচনা করে গাইত আর সঙ্গে সাজ্‌ বাদ্যযন্ত্র বাজাত। এই লোকটি শহর কি জিনিস জানত না। তার ধারণায় পৃথিবীর সব থেকে বড় শহর হল কেলবেজারী। এই কেলবেজারী ছিল আসলে ছোট্ট একটা অঞ্চল। এই কবি-গায়কের প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি আর সূক্ষ্ম রুচির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন বাবা। সেই সঙ্গে এ কারণেও দুঃখ করতেন যে ঐ কবির বাইরের জগতের সম্বন্ধে ধারণা ছিল শিশুর মত। বাবা বলতেন, 'যদি অল্প বয়সে ও দেশটা ঘুরে দেখত, অন্যদের থেকে শিখত, তাহলে ওর প্রতিভার প্রকাশ পেত। ইয়ানশাগ বেচারীকে চেপে মেরে ফেলছে, তার সব রস শুষে নিচ্ছে, সে এখন পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে।' আমাদের সময়ে তো দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। সবাই ওপরে ওঠার চেষ্টা করে, চারপাশে তাকিয়ে দেখে, খোঁজে অন্যের কাছ থেকে কি শেখা যায়।'

ইয়াভের চুপ করে চিন্তামগ্ন হয়ে রসিমের কথা শুনছিল। মাত্র কয়েক মিনিট আগে পরস্পরকে বুঝতে পারার যে অনুভূতি তাদের দু'জনকে কাছে এনেছিল, তা যেন গলে মিলিয়ে যেতে থাকল। রসিমের কথাগুলিকে ইয়াভেরের অত্যন্ত কঠোর মনে হল। তার কোঁচকান ভুরু দেখে মেদিনা বুঝল সে এবার ফুঁসে উঠবে। তাই হল।

'ইয়ানশাগ উপত্যকায় কুঁজো বুড়ো হওয়া নিশ্চয়ই ভাল কথা নয়। কিন্তু যদি বিভিন্ন আধুনিক সুরকারের সিমফনি, কনসার্ট, সুর আমার ভাল না লাগে তো আমি কি করব? মন ভরে না। কেন মন ভরে না? কারণ এই সব সিমফনির আমাদের সঙ্গীতের সঙ্গে কোন যোগ নেই!'

তাদের বাড়ীতে সাধারণত সবসময়ই মতৈক্য থাকত, তাই স্বামীর এই সব ধরণের মন্তব্যর কঠোরতা সাধারণত মেদিনা নরম করার চেষ্টা করত।

কিন্তু এখন ইয়াভেরের কথা মেদিনার কানে অদ্ভুত শোনাল। ইয়াভের ভুল করছে। এত সহজ সত্যটা সে কেন বুঝতে পারছে না? যদি সিমফনির আমাদের সঙ্গীতের সঙ্গে যোগ না থাকে তাহলে 'কের-অগলু' আমাদের এমন মুগ্ধ করে কেন? তখন তো আমাদের অপেরাও ছিল না।

কিন্তু মেদিনা ইচ্ছে করেই চুপ করে রইল, প্রতিবাদ করল না। রসিম কি বলে শুনতে চাইল।

রসিম হেসে আরম্ভ করল:

'এই সুরটা সম্বন্ধে তর্ক করব না, এটা অবশ্যই সফল সৃষ্টি নয়। এতে আমি আপনার সঙ্গে একমত। কিন্তু আপনার অন্য কথাগুলির সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। সিমফনি, কনসার্ট, সুরের তো কোন দোষ নেই। এই ফর্মেই যে অনেক অমর সৃষ্টি আছে। আমাদের সুরকারদেরও অনেক সফল সৃষ্টি আছে। নতুন রূপগুলির উন্নতি সাধন করতে গিয়ে আমরা নতুন ঐশ্বর্যের উদ্ভাবন করি — নতুন ধাঁচ, আমাদের সঙ্গীতের নতুন সৌন্দর্য আবিষ্কার করি।'

তর্ক চলতে থাকল। ইয়াভের একগুঁয়েভাবে নিজের মত ধরে রইল। রসিম মেনে নিল না। কিন্তু যখন দেখল যে ইয়াভের রেগে যাচ্ছে তখন তার হাত চেপে ধরে উঠল।

'অভিজ্ঞ লোকেরা বলেন: দিনের আলোয় অশুভ রাত্রির অন্ধকারের শুভের চেয়ে ভাল। আচ্ছা চলি।'

মেদিনা খুশী হল যে সে দেরীতে হলেও চলে গেল শেষ পর্যন্ত। সে প্রাণ থেকে চাইছিল যেন রসিম আর না আসে।

৫

তৃতীয় দিনে দরজার ঘণ্টা বাজল আবার।

রসিম একাই এসেছে। হাতে এল. পি. রেকর্ডের বাক্স। প্রথমে 'কের-অগলু' অপেরার 'চেনলিবেল' দৃশ্যে ভূমিকার রেকর্ডটি বসাল। সিমফনি অর্কেষ্ট্রায় আজেরবাইজানী সঙ্গীত বেজে উঠল। 'কের-অগলুর' পরে তারা শুনল লিস্তের 'ভালবাসার স্বপ্নের' গান।

কি জানি কেন ইয়াভের ও মেদিনা এই চমৎকার ভালবাসার গান শোনার সুযোগ পায় নি। সত্যি সত্যি তা তাদের মুগ্ধ করে দিল। কি

চমৎকারভাবে তাতে প্রকাশিত হয়েছে প্রেমিক হৃদয়ের আনন্দ, বেদনা...

আবার তারা শিল্প বিষয়ে কথা বলা আরম্ভ করল। ইয়াভের আর পূর্ব আলোচ্য বিষয়ে ফিরছিল না। মেদিনা বুঝতে পারল: এখন সে সতর্ক হয়ে গেছে। মনে হল, রসিমও আর ঐ বিষয়ে ফিরতে চাচ্ছে না, ইয়াভেরের দুর্বল জায়গায় আঘাত করে বসার ভয়ে। শিল্পী মোটেই সেই দলের লোক ছিল না, যারা সবসময় নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের চেষ্টায় তৎপর। সাধারণত সে সঙ্গীর কথা মন দিতে শুনত, কোন মানুষের চরিত্রের ভাল দিকটি আবিষ্কার করে আনন্দ পেত, আর নিজে প্রতিবাদ করে অত্যন্ত শান্তভাবে কথা বলত বিনীতভাবে। মেদিনার মনে হতে থাকল যেন রসিমের সঙ্গে কথা বলার পরে মানুষ নিজেই নিজের চোখে অনেক উপরে উঠে যায় আর পোশাকে, কথাবার্তায়, ব্যবহারে সবকিছুতেই পরিপাটী ও সুন্দর হতে ইচ্ছে করে।

এইভাবে শিল্পী ইয়াভেরের বাড়ীর লোক হয়ে গেল। সে দুদিন তিনদিন অন্তর আসত। বসে, ধীরে সুস্থে গল্প গুজব করত। একবার শিল্পের কথা উঠল। এবারে চিত্রকলার আলোচনা আরম্ভ হল। মেদিনা ঘরে যে সব ছবির নকল টাঙিয়েছিল তা রসিম লক্ষ্য করে দেখছিল। একটা ছবিতে ছিল একটি মেয়ে আঙুর তুলছে, অন্যটিতে বরফের পাহাড়। দুটি ছবিই শিল্পভান্ডারের। নেহাতই মুনাফা তোলার কারণে সৃষ্ট এই ছবিগুলির নীচে এমনকি শিল্পীর স্বাক্ষরও নেই।

'মেদিনা-খানুম, এবার দেখছি আপনারও সমালোচনা করতে হয়। আপনি নিজেই তো এই সেদিন শিল্পী-ছুতোরদের সমালোচনা করছিলেন আর নিজেই রংমাখামাখি ছবিগুলি দিয়ে ঘর সাজিয়েছেন — এর মানে কি?' এই প্রথম রসিম আঘাত হানল মেদিনাকে।

'কি করব, অন্য কিছু পাওয়া গেল না। যা পাওয়া গেল, তাই-ই টাঙিয়েছি।'

'আমার এক পরিচিত লোক বেহ্রুজা কেংগেরলির ছবি 'ইয়াশখানার পথ'-এর নকল বিক্রী করে। আমি আপনাকে তা' কিনতে পরামর্শ দিই আর এই ছবিটার জায়গায় তা' টাঙানো যায়।' রসিম আঙুর তোলা মেয়ের ছবিটির দিকে দেখিয়ে বলল। 'ত্রিশ বছর আগে সৃষ্ট এই ছবির দিকে তাকিয়ে আপনি তার ঐশ্বর্য বুঝতে পারবেন। আর এটার জায়গায়...' রসিম রঙচঙা বরফের পাহাড়ের ছবিটা দেখিয়ে বলতে চাইল কিন্তু ইয়াভের তাকে থামিয়ে দিল।

'এটার জায়গায় আমি ওর ছবি টাঙিয়ে দেব।' হেসে মেদিনার দিকে তাকিয়ে সে বলল।

দুই পুরুষমানুষের দৃষ্টির পাল্লায় লজ্জায় লাল হয়ে মেদিনা বলল:

'এমন কথা বল! ফোটো ঝোলাবার দরকার কি? আমি বরং কোন একটা ভাল পোর্ট্রেট খুঁজে বার করব।'

হঠাৎ রসিমের মাথায় একটা কথা খেলে গেল। আনন্দে বড় বড় চোখ করে সে একবার ইয়াভের, একবার মেদিনার দিকে তাকিয়ে বলল:

'যদি অনুমতি দেন আমি আপনাদের দু'জনেরই ইচ্ছা পূরণ করতে পারি। এটা হবে একই সঙ্গে মেদিনা-খানুমের পোর্ট্রেট আর চিত্রকলাও।'

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকাল। মেদিনা কিছু বলবার আগেই ইয়াভের বলল:

'দারুণ! অনেক দিনই ভেবেছি মেদিনার পোর্ট্রেট করাব!'

রসিম স্বপ্নের পাখা মেলে অনেকদূর উড়ে গিয়েছিল। তার চোখের সামনে ভাসছিল সুন্দরী, অভিজাত মহৎ-হৃদয় এক মহিলার পোর্ট্রেট। মেদিনা তখনও একটু দ্বিধা করছিল। পোর্ট্রেটের জন্য শিল্পীর সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা তার কাছে মনে হল সময় নষ্ট। প্রত্যাখ্যান করাও ভাল দেখায় না। তার স্বামী যে ইতিমধ্যেই সমর্থন জানিয়েছে অন্তর থেকেই। মেদিনার হৃদয়ে বিপরীত অনুভূতি দেখা দিয়েছে। এখন তার ইচ্ছে করছিল না যে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে নামে আর রসিম চলে যায়। যেন মনে হল, ঘরের দেয়ালগুলোও তার নিঃশ্বাসে উষ্ণ হয়ে উঠেছে, তারাও যেন তার নরম কণ্ঠস্বর শুনতে চাচ্ছে।

'তাহলে কবে আরম্ভ করব?' জিজ্ঞাসা করল রসিম মেদিনাকে।

সে প্রথম স্বামীর দিকে দেখল, তারপর রসিমের দিকে, তাদের দৃষ্টির মিলন হল। মেদিনার মনে হল শিল্পীর চোখে যেন জ্বলছে রামধনুর সব কটি রঙ আর তার ইতিপূর্বে অজানা এক গোপন রহস্যের জগতে আহ্বান। এই চঞ্চল উজ্জীবিত আহ্বান অসীম আনন্দের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ সুন্দর প্রতিশ্রুতি তাদের কোথায় নিয়ে যাবে? সে উত্তর দেবার আগেই, দূর থেকে যেন এক কণ্ঠস্বর ভেসে এল:

'যদি সবাই রাজী হয়, তাহলে শীগগিরি আরম্ভ করা যাক!'

তার স্বামীর কণ্ঠস্বর এই প্রথম তার কাছে মনে হল অচেনা, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা। ইয়াভের নিজেই তাকে হাত ধরে উৎসাহ দিতে

দিতে সেই মোহময় ও ভয়ঙ্কর জগতে ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে, যেখানে শিল্পী তাকে ডাকছে।

'আপনাকে বিরক্ত করা হবে না?' একটু দিশাহারা হাসি হেসে মেদিনা জিজ্ঞাসা করল। আর তার মুখের রঙ বদলে গেল।

তার এই হাসি শিল্পীকেও একটু দিশাহারা করে দিল।

'কি যে বলেন, আমার খুব ভাল লাগবে।' বলে তাকাল শিল্পী মেদিনার দিকে যেন উদাসীন দৃষ্টিতে, কিন্তু আসলে সে দৃষ্টি ছিল গোপন প্রতিশ্রুতিতে পূর্ণ। মেদিনা সেই দৃষ্টিতে দেখতে পেল মানুষের ইচ্ছাকে জয় করার শক্তি। সে মাথা নামিয়ে ভীরুভাবে বলল:

'ঠিক আছে...'

৬

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় মেদিনা স্বামী আর ছোট্ট লায়লার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া সেরে, বাসনপত্র ধুয়ে, রসিমের আসার আশায় সাজগোজ করে নিল। সাতটা বাজল রসিম আসল না, আটটা বাজল তখনও তার দেখা নেই। মেদিনা দুশ্চিন্তা আরম্ভ করে দিল।

'কিছু ঘটল নাকি?' উদ্বিগ্ন হয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'কি ঘটতে পারে? মিটিংফিটিং-এ আটকে গেছে বোধ হয়, নাহলে ফোন করত। এদিকে সে ঠিক আছে। যদি কোন কিছু কথা দেয়, তা করবেই। সবাই বলে ও নাকি দারুণ প্রতিভাবান শিল্পী। বিশেষজ্ঞদের মত, ওর ওপর আশা করা যায়...'

'স্কুলেও সে সবথেকে ভালদের দলে ছিল,' সমর্থন করল মেদিনা, 'টীচার একবার বুঝিয়ে দিলেই ও সব মনে করে রেখে দিত।'

'আমার সবথেকে ভাল লাগে ওর বিনয়। নিজের কথা কখনো কিছু বলবে না। এমন তো আছে যারা খালি নিজেদের কথাই চিন্তা করে। যে কোন কথাই তোল না কেন—খালি আমি আর আমি! বিরক্ত লাগে।'

মেদিনার ভাল লাগল যে তার স্বামী রসিমের এত প্রশংসা করছে। কি ভাল যে ওরা বন্ধুত্ব জমিয়েছে। এমন সব বন্ধু থাকলে জীবনধারণ সহজ হয়। মেদিনার আবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হল, 'ও এখনও আসছে না কেন?' কিন্তু নিজেকে সংযত করল। এমন সময় টেলিফোন বাজল। মেদিনা রিসিভারটা তুলল। রসিম সঙ্গে সঙ্গেই মেদিনার গলা চিনতে পারল।

'শুভ-সন্ধ্যা, মেদিনা-খানুম,' বলল সে, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে দুঃখিত স্বরে বলল, 'মাফ করবেন, কথা রাখতে পারলাম না, জানেন, আজ আমাদের ইউনিয়নের এক জরুরী সভা ছিল।

'তাতে কি, কাল আসবেন।' বলল মেদিনা আর নিজের কম্পমান কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই ভয় পেয়ে গেল।

'সেই তো হল ব্যাপার যে, কালও আসতে পারছি না।' বলল রসিম। 'আমাকে দশ-পনেরো দিনের জন্য নুখা, কাখি আর জাকাতালিতে চলে যেতে হচ্ছে। তাই, বিদায় জানাচ্ছি। ফিরে আসলে, দেখা হবে।'

রসিম আরো কিসব বলছিল, কিন্তু মেদিনা কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। তার সমস্ত মনোযোগ ছিল স্বামীর প্রতি। তার মনে হল প্রথমেই রিসিভারটা দেওয়া উচিত ছিল ইয়াভেরকে আর এখন দোষী মনে হতে লাগল নিজেকে। স্বামীও তার দিক থেকে চোখ সরাচ্ছিল না। কিন্তু সে দৃষ্টিতে তিরস্কার ছিল না। সে যেন আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল রসিম তার সঙ্গে কি কথা বলছে।

রসিমের এই অপ্রত্যাশিত যাত্রা মেদিনার মনে একটু কষ্ট দিলেও সে একটু স্বস্তি পেল, কারণ বুঝতে পারছিল না কেমন করে শিল্পীর সামনে সিটিং দেবে। হয়ত পরে এ সম্পর্কে সবাই ভুলে যাবে। যাই হোক, এখন সবকিছু ভাল করে ভেবে দেখার তার অনেক সময় আছে। কিন্তু মেদিনার সবকিছু ভাবা হল না, জানাও হল না রসিমের এই চলে যাওয়া সম্পর্কে স্বামী কি বলে। যেই সে রিসিভার রাখল, দরজার বেলটা জোরে বেজে উঠল। প্রতিবেশী মারিয়ামের কান্না শুনে মেদিনা দরজার দিকে ছুটে গেল।

'কি হয়েছে, মারিয়াম ?'

মারিয়াম আরো জোরে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল:

'আমার কি হবে, মেদিনা, ছেলেটাকে জেলে দিয়েছে !'

মেদিনা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। কার ছেলেকে ? সব লোকেই জানে নাজিম ভাল, বুদ্ধিমান ছেলে। স্কুলেও ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। তার সম্বন্ধে কেউ খারাপ ভাবে না। লেখাপড়া করার পরে সে উঠানে খেলা করত, সবাইয়ের চোখে তা স্বাভাবিক। আর হঠাৎ ওকে মিলিশিয়া ধরল !

মেদিনা অভিভূত হয়ে পড়ল। সে মারিয়ামকে ঘরে নিয়ে গেল।

'কি জন্য তাকে ধরেছে ?'

'কিছু জানি না আমি! কিছু জানি না! আমাকে আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও! মরে যাব আমি! ওঃ!' আরো জোরে সে কাঁদতে লাগল।

মেদিনা অনুরোধের দৃষ্টি নিয়ে তাকাল স্বামীর দিকে। ইয়াভের বুঝল — তার সাহায্য করা দরকার। সে মিলিশিয়ায় ফোন করে জানতে পারল ক'মাস ধরে নাজিম বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশছিল। ভর দিনের বেলায় প্রিমরস্কি স্ট্রীটে, একটা ফাঁকা রাস্তায় তারা মারপিট করে। কাকে ছুরি মেরেছে। ছেলেগুলো পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদেরকে ধরেছে।

মারিয়ামের কাছে এটা একটা বিরাট দুর্ভাগ্য। সে দুঃখে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছিল না। ইয়াভের ও মেদিনা অনেকক্ষণ ধরে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করল। অবশেষে গভীর রাতে তাকে ফ্ল্যাটে পেঁছে দিল। ইয়াভের প্রতিশ্রুতি দিল: 'কাল একটা কিছু ভেবে ঠিক করা যাবে।' কিন্তু পরের দিনও নাজিমকে ছাড়ান গেল না।

তখন ইয়াভের মেদিনা আরো অন্য কয়েকজন প্রতিবেশী মিলে আবেদনপত্র লিখল, মিলিশিয়ার বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করল, সরকারী উকিলের কাছে গেল, লিখিতভাবে ছেলেটির দায়িত্ব নিল, তখন তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল মায়ের হাতে।

এই ঘটনায় ইয়াভের একটা ধাক্কা খেল। সে উঠানে খেলতে থাকা বাচ্চাদের ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল। কাজে যাবার সময় আর কাজ থেকে ফেরার সময় বিভিন্ন অজুহাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের লক্ষ্য করত। খাওয়াদাওয়ার পরে ঘরের জানলা দিয়ে উঠানে খেলতে থাকা বাচ্চাদের লক্ষ্য করত। শীঘ্রই সে লক্ষ্য করল: উঠানে খেলতে আসে কিছু অজানা ছেলেও। ন'-দশ বছর বয়সী ছেলেরা শান্ত, শিষ্টভাবে খেলা করত, ঝগড়া ঝাঁটি করত না, উঠান থেকে দূরে কোথাও যেত না; আর একটু বড় — বারো-তেরো বছর বয়সের ছেলেরা, মনে হয়, যেন তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা কি কাজে লাগাবে বুঝতে পারছে না। যেন এই উঠানে তাদের জায়গা কুলায় না। তারা অন্য বাড়ীর উঠানে, রাস্তায় ছোটাছুটি করত। আর ইয়াভের জানত যে বাকুর মত বড় শহরে এটা বড় বিপদের কথা। কি করা উচিত? তাদের কি বলা যায়: 'ঘরে বন্ধ বসে থাক, সমবয়সীদের সঙ্গে খেলা করতে হবে না?' স্কুল আর বাড়ী, এই-ই সব? ইয়াভের নিজে শিক্ষক হয়ে এ কথা কোন শিশুকে বলতে পারে না।

'মেদিনা, সবকিছুর কারণ এই যে বাচ্চাদের ওপর নজর রাখা হয় না। কাল নাজিম অন্য দলে গিয়ে পড়তে পারে। অথবা অন্য কেউ। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে একটা কমিটি তৈরী করতে হবে। সমস্ত বড়রা পালা করে বাচ্চাদের খেলাধুলা করানোর দায়িত্ব নেবে। তোমার কি মনে হয় ?'

স্বামীর প্রস্তাব মেদিনার খুব পছন্দ হল। তার নিজের মাথায় একথা আগে কেন আসে নি ভাবল সে। যদি এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ সত্যি সত্যিই হয় তবে সেও তাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সংসারের কাজের পরে, তার আর সময় কাটে না, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হয় নিজেকে। মেদিনা শিক্ষক, শিক্ষণ কলেজ শেষ করেছে। তিন বছর কিণ্ডারগার্টেনে কাজ করেছে। তারপরে সে চাকরী ছেড়ে দিল। প্রথম প্রথম তার ভালই লাগত, বিশ্রাম করত, বই পড়ত, কিন্তু তারপর বিরক্তি লেগে গেল আর সব কিছুর জন্যই সে নিজেকে দায়ী করতে লাগল।

মেদিনা প্রতিবেশীদের সঙ্গে স্বামীর প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা করল। তারপরে বাড়ীর বাসিন্দারা মিলে এক কমিটি তৈরী করল, যাতে নেওয়া হল পাঁচজন মহিলাকে আর সভাপতি করা হল মেদিনাকে। এখন ইয়াভের বাড়ী ফেরার সময় স্ত্রীকে ব্যস্ত দেখতে পায়। তার মাথায় এখন নতুন নতুন প্ল্যান। ইয়াভের তাকে পরামর্শ দিত, বই নিয়ে আসত। অবশেষে বাচ্চাদের ব্যাপারটা সব ঠিক হয়ে গেল। মেদিনা এখন নতুন নতুন কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। একবার ইয়াভের ঠাট্টা করে বলল তাকে:

'অফিসের কাজেও তুমি এত সময় দিতে না হয়ত। মেদিনা, তুমি ভীষণ জমে গেছ।'

মেদিনা বলল:

'সত্যি কথা বলতে কি ইয়াভের, আমি খালি ভাবি নাজিমের জন্য কথা দিয়েছি, তা রাখতে হবে। তাছাড়া...'

মেদিনা চুপ করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল:

'তাছাড়া, আমি চাই যে খবরের কাগজগুলি আমার কথা লিখুক।'

'কবিরা তোমার সম্বন্ধে গান গাইবে!' বলল ইয়াভের স্ত্রীকে চুম্বন করে।

স্বামীর প্রশংসায় আনন্দিত হয়ে মেদিনা বলল:

'আমার খুব ভাল লাগে ইয়াভের, একটুও ক্লান্ত হই না। তুমি আমাকে ভাল পরামর্শই দিয়েছিলে। বাচ্চাদের জগৎ কি বিস্ময়কর তুমি যদি জানতে!

কত অজানা রহস্য সেখানে! ওদের স্বভাব কি ভাল! ওদেরকে ছেড়ে আসতে আমার ইচ্ছে করে না। যদি জান কেমন করে এগিয়ে যেতে হয় তাহলে সবথেকে অবাধ্য বদমাশটাও তোমার বশ হয়ে যাবে। এখন আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে পৃথিবীতে খারাপ শিশু থাকতে পারে না, দোষ তাদের যারা শিশুকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে না।

'ঠিক, ঠিক,' বলল ইয়াভের আর খুশী হয়ে ভাবল, 'মেদিনা বাচ্চা ভাল মানুষ করতে পারবে, স্বামীকে এতে সুখী করবে।' খারাপ ছেলেমেয়ে থাকার দুঃখ তাকে ভোগ করতে হবে না।

এই নতুন কাজে জড়িয়ে পড়ে মেদিনা আর ইয়াভের শিল্পীর কথা একেবারেই যেন ভুলে গেল। একবার খালি মেদিনা স্বপ্নে দেখল একজনকে যে ঠিক শিল্পীর মত দেখতে। সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন। সারা দিন সে নাজিমের ব্যাপারে ছোটাছুটি করেছে, অবশেষে তাকে বাড়ীতে এনে রাত একটায় শ্রান্ত কিন্তু সন্তুষ্টমনে বিছানায় শুয়েই গভীর ঘুমে ডুবে গেল। স্বপ্নে সে দেখল যেন সে এক গভীর বনে। একজন ঘন চুলদাড়িওয়ালা লোক দাঁড়িয়ে আছে বিরাট এক ওক গাছে বাঁধা অবস্থায়। মাথার চুলগুলি তার মুখের ওপর এসে পড়েছে। সে দড়িটা ছেঁড়বার চেষ্টা করছিল, অসহায়ভাবে চেঁচাচ্ছিল আর কাকে যেন ডাকছিল সাহায্যের জন্য। তার বড় বড় খয়েরী চোখ শিল্পীর কথা মনে পড়িয়ে দিল তাকে। মেদিনা ছুটে গেল সাহায্যের জন্য, এমন সময় সেই বন, সেই ওক গাছ ও সেই লোকটি সব মিলিয়ে গেল।

শিল্পী যেমন হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তেমনই হঠাৎ একদিন এসে হাজির হল। ইয়াভের ও মেদিনা সন্ধ্যাবেলায় চা খাচ্ছিল, কথা বলছিল, রেডিও শুনছিল, ছোট্ট লায়লার সঙ্গে খেলা করছিল। দরজার ঘণ্টা বাজল। ইয়াভের দরজা খুলল।

'আরে ভাল কাকু যে!' চীৎকার করে বলল সে। 'কোথায় ছিলে এতদিন?'

মেদিনা করিডরে বেরোতে চাইছিল, কিন্তু আনন্দে উত্তেজনায় তার হৃদয় এত কাঁপছিল যে চুপ করে বসে রইল। শিল্পী ঘরে ঢুকে সৌজন্যের সঙ্গে অভিবাদন জানাল। মেদিনা লক্ষ্য করল তার চোখে যেন ছায়া — যেমন কুয়াশা বসন্তের সকালে চার দিক ছেয়ে ফেলে তেমনই।

'এতদিন ধরে কোথায় ঘুরলেন? বসুন!' বলল ইয়াভের।

শিল্পী বসল আরামচেয়ারে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে বিচ্ছেদ

বেদনায় কাতর। যেন রোগা হয়ে গেছে। ইয়াভেরের প্রশ্নের উত্তরে সে যেখানে যেখানে গিয়েছিল সেই সব জায়গায় আবহাওয়ার কথা বলল। নিজের নতুন সৃষ্টির কথা বলল। এইভাবে সন্ধ্যা কেটে গেল। কেবল চলে যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে রসিম বলল যে পরের দিন থেকে মেদিনার পোর্ট্রেট আরম্ভ করবে।

'আমি তৈরী, আমার এখানে সবকিছু ছকা হয়ে গেছে,' বলে সে তার বুকে হাত রাখল, 'ঠিক রইল, কেমন?'

'ভয় হয়। আবার কিছু ঘটবে, এবার আপনি আলতাই চলে যাবেন হয়ত,' মৃদু হেসে বলল মেদিনা।

'না, আর কোথাও যাব না, কালই শুরু করব।'

৭

আজকাল সন্ধ্যা সাতটা বাজার সময় হলেই, মেদিনা শোবার ঘরের দিকে ছুটত। কখনো পরত ছোট ছোট ফুলের ছাপওলা হলুদ রঙের সিল্কের পোশাক, যাতে তাকে খুব ভাল মানাত, কখনো পরত পশমের পোশাক, চুলটা ঠিক করে নিত, কয়েক মিনিট আয়নার সামনে দাঁড়াত, নিজের রূপে মুগ্ধ হত। মেদিনা বেশী রঙচঙের ব্যবহার পছন্দ করত না। কখনও সে ঠোঁটে রঙ লাগায় নি। স্বামীর সঙ্গে যখন থিয়েটার, সিনেমা বা আর কোথাও যেত, মুখে একটু পাউডার বুলোত আর সেন্ট মাখত। কিন্তু তাও মাসে দু'তিনবারের বেশী নয়। আর এখন সে নিজের পোশাক আশাকের দিকে খুব নজর দিচ্ছে। প্রথম প্রথম ইয়াভেরের এমন কি ভালও লাগল তা, স্ত্রীকে সবসময়ই সুন্দর দেখতে সে ভালবাসত, কিন্তু যখন সে লক্ষ্য করল যে স্ত্রী নিজেকে নিয়ে একটু বেশী বাড়াবাড়িই করে ফেলছে, তখন কিছু একটা সন্দেহ করল। তার মনে পড়ল, আগে সে ছোট ছোট ফুলওলা হলুদ পোশাকটা পরতে চাইত না, এমন কি প্রতিবাদ করত যখন ইয়াভের তাকে পরতে বলত:

'তুমি এই রান্নাবান্নার পোশাকটা ছাড়তে পার না? নতুনটা পর না কেন!'

'শুধু শুধু ওটাকে নষ্ট করে লাভ কি, বাড়ীতে এই ঠিক আছে?'

এখন মেদিনা প্রতি দু'-তিন দিন অন্তর ভাল করে ইস্ত্রি করে ওই হলুদ পোশাকটা, যেটাতে তার সরু কোমর আর সুডৌল কাঁধকে চমৎকার

দেখায়। কিন্তু স্ত্রীর সম্বন্ধে খারাপ কথা ভাবতে ইয়াভেরের ইচ্ছে হয় না। সে তাকে বিশ্বাস করে সমস্ত সন্দেহ তাড়ায় মন থেকে; তার খুবই দুঃখ হবে যদি এই সব সন্দেহ থেকে সে মেদিনাকে মনে কষ্ট দিয়ে বসে। সেই জন্য সে এই ব্যাপারে সন্দেহকে চাপা দেবার চেষ্টা করত। ইয়াভের কিছু বলত না স্ত্রীকে, কিন্তু তার প্রতি সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নজর রাখত।

আর মেদিনার ধারণায় এসবই স্বাভাবিক। সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করত যে, এতে খারাপ কিছু নেই আর রসিমও তার স্বামীর বন্ধু হিসাবে ওদের এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, গল্প করে, চা খায়, গান শোনে। কখনো তারা নার্দি* খেলে। রান্না করার পোশাক যেটা থেকে সাত মাইল দূর থেকে ভাজা আলু আর পেঁয়াজের গন্ধ বেরোয়, সেটা পরে অতিথির সামনে বেরোনই বরং লজ্জার। এইভাবে মেদিনা নিজের আচরণের পক্ষে যুক্তি খুঁজত। রসিমের জন্যই সে ঐ হলুদ পোশাক পরে, তার মধ্যে যে জেগেছে রসিমের চোখে নিজেকে ভালো লাগানোর অদম্য ইচ্ছা এ কথা সে বুঝতে পারত না। তার ভঙ্গীতে, কথাবার্তায়, চোখে যে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে, তা সে জানত না। তাকে দেখে মনে হয় যেন সে শীতের সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়ে হঠাৎ রূপবান বসন্তের স্বপ্ন দেখেছে। আর সেই বসন্তের সৌন্দর্য তার মধ্যে নতুন আবেগের জন্ম দিয়েছে। হ্যাঁ, রসিমের বড় বড় চোখে এক অদেখা, অজানা জগতের আহ্বান মেদিনাকে হাতছানি দিত।

যেহেতু পোর্ট্রেটের কাজ এগিয়ে চলল, এই আকর্ষণও বেড়ে চলল। প্রথমে রসিম সপ্তাহে দু'দিন করে আসত, তারপর একদিন অন্তর করে আসতে লাগল। মেদিনা চা আনত, জ্যাম, চিনি, তার তৈরী বিভিন্ন রকমের মিষ্টি সাজিয়ে দিত, তারপরে ছবির সিটিং আরম্ভ হত। তারা এটা ওটা সম্বন্ধে কথা বলত, কথা বলতে বলতেই রসিম রংতুলি হাতে নিয়ে সবার অলক্ষ্যে ধীরেসুস্থে কাজ আরম্ভ করে দিত। কথা বলার সময় শিল্পী ইয়াভেরকেই সবসময় উদ্দেশ্য করে বলত, তার কথা শুনত, ভাব দেখাত যেন তার সব মনোযোগ ইয়াভেরের প্রতিই। কিন্তু মেদিনা জানত এর আড়ালে শিল্পী তার নিজের প্রকৃত চিন্তাধারাকে ঢাকতে চাইছে, আসলে তার সমস্ত চিন্তাধারা মেদিনাতেই নিবদ্ধ। এমনকি তার স্বামীর ঈর্ষাময়

---

* নার্দি — লুডো ধরণের এক জাতীয় খেলা। — সম্পাঃ

চোখগুলিও ধরতে পারত না তার এই গোপন চিন্তাধারাকে। রসিম এমন ব্যবহার করত যাতে ইয়াভেরের একটুও সন্দেহ না হয়, আর মেদিনাকে আহ্বান জানাত এক জাদুর জগতে।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। ছবিটা আরও বেশী করে ফুটে উঠতে লাগল। এলোমেলো মাখিয়ে রাখা রঙের মধ্যে থেকে ফুটে উঠল গভীর ভাবাবেগে পূর্ণ এক ছবি। একবার নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে মেদিনা নিজেই অবাক হয়ে গেল। শিল্পী তার চোখে ফুটিয়ে তুলেছে তার হৃদয়ের আবেগ, দুঃখ, যা সে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে; বাদামী রঙের বেণীতে ঘেরা মেদিনার সুন্দর মুখে যেন কোন গোপন আবেগ জ্বলছে।

পোর্ট্রেট দেখে ইয়াভের আনন্দে চীৎকার করে উঠল:

'দারুণ! রেমব্রাঁও নিজের সাস্কিয়র পোর্ট্রেট এমন উদ্দীপনা নিয়ে আঁকেন নি।' বলেই ও যেন হঠাৎ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে চুপ করে গেল।

সে এই পোর্ট্রেটে মেদিনা আর রসিমের দু'জনে দু'জনের প্রতি মনের ভাব মূর্ত দেখতে পেল, যা তাদের ভাবে, ভঙ্গীতে প্রচ্ছন্ন থাকত। এ যেন পোর্ট্রেট নয়, তাদের প্রেমের ঘোষণা। এই ভাবনা ইয়াভেরকে উত্তেজিত করে তুলল, এতদিন সে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কাউকে জানত না। তার ইচ্ছে হল সে তার হৃদয়টা মেলে ধরে দেখিয়ে দেয় যে শিল্পীর ভালবাসার তুলনায় তা কত বড়। এই ভালবাসা তার চোখ, তার সারা অস্তিত্বে আর তার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে। তার বলতে ইচ্ছে হল: 'মেদিনা দেখ! এখানের একটা কণাও তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না... কোথাকার এক শিল্পী কি তোমাকে আমার থেকে বেশী ভালবাসতে পারে?..'

কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। এসব কথা এখন মেদিনার কাছে হাস্যকর মনে হবে। শিল্পী ওকে জাদু করেছে। এই চিন্তায় তার হৃদয় ভেঙে পড়ল, চোখে বিষণ্নতা নেমে হল। বহুদিন পথ চলার পর ক্লান্ত পথিকের মত সে তক্তপোষের ওপর পড়ে গেল।

মেদিনা ও শিল্পী দু'জনেই বুঝতে পারল, ইয়াভেরের মনের অবস্থা এখন কি। দুঃসহ নিস্তব্ধতা নেমে এল। শিল্পীর দৃষ্টিতে বিরক্তি ও সহানুভূতি দুইই ছিল। সে অসহায় বোধ করছিল। কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। তার প্রাণ অপরাধবোধে কেঁদে মরছিল...

মেদিনাও দিশাহারা বোধ করতে লাগল। এই প্রথম তার স্বামীকে মনে

হল অসহায়, নিপীড়িত। যেন তার কাঁধে দুর্বহ বোঝা এসে পড়েছে।

'ইয়াভের এখন কি করবে?' মাথায় এল মেদিনার। 'বাড়ী, পরিবার ছেড়ে চলে যাবে নাকি।' ইয়াভের মেদিনার দিকে তাকিয়েছিল আগের চেয়ে আরো বেশী নরম ভালবাসাভরা দৃষ্টি নিয়ে। কিন্তু তার প্রতিটি ভঙ্গীতে প্রকাশ পাচ্ছিল বিনীত অহঙ্কার।

নিজের ওপর মেদিনা ও রসিমের একাগ্র দৃষ্টি অনুভব করে ইয়াভের ভাবল:

'কি করব আমি এখন? মেদিনার প্রতি চীৎকার করে উঠব, রসিমকে বার করে দেব? কিন্তু এভাবে কি মেদিনার তার প্রতি আকর্ষণ কমানো যাবে? রসিমকে কি বোঝান যাবে সে কি ভয়ঙ্কর খেলা খেলছে? না, তাহলে হয়ত দুর্ঘটনা আরো আগেই ঘটে যাবে, আর ওদের দু'জনের পক্ষে সেই পথে যাওয়া সহজ হবে, যা ওদের কাছে এখনও কুয়াশাঘেরা। আচ্ছা, হয়ত ওদের মধ্যে তেমন কোনো সম্পর্ক নেই? হয়ত এটা সবই তার ঈর্ষা আর কল্পনার ফল? হতে পারে।' এখন ইয়াভেরের মনে পড়ল তার জেঠতুত ভাইয়ের পরিবারের কথা। তার স্ত্রী অতিথি আপ্যায়ন করার সময়, একজনের প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দিয়েছিল, তা লক্ষ্য করে তার ভাই ঈর্ষায় পাগল হয়ে যায়। সে নিজের প্রিয় স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে, পরিবারের পুরনো বন্ধু সেই অতিথিকে অপমান করে। পরের দিন অফিস থেকে এসে সে টেবিলে একটা চিরকুট পেল: 'আমি জানতাম না যে, এই লোকটিকে ভালবাসতাম। আমি নিজেকে বোঝাতাম যে, খালি তোমাকেই ভালবাসি। তোমার মারা চড়টাই আমাকে জাগিয়ে দিল। আমি বুঝেছি যে এ পর্যন্ত আমি একটা বিরাট ভুল করেছি। চিরকালের জন্য তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি, বিদায়!'

না, ইয়াভের এমন নীচতা করতে পারবে না। তাছাড়া ভালবাসার প্রথম পরীক্ষাই যদি সে পাশ করতে না পারল তাহলে তেমন ভালোবাসায় দরকার কি? যদি কোনো মেয়ে তার স্বামীর থেকে বেশী রূপবান, সামাজিক মর্যাদায় অনেক উঁচু, আরো শিক্ষিত কোনো পুরুষমানুষের দেখা পেয়ে সব ভুলে যায়, তাহলে তার বাড়ীতে থাকার দরকার কি? এমন মেয়ে যা মনে আসে তা করুক, যেখানে যেতে চায়, যাক!

রসিমের দিকে আর না তাকিয়ে ইয়াভের স্ত্রীকে বলল:

'মেদিনা, আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমাদের স্কুলে

মিটিং আছে। আমার অবশ্য থাকা দরকার সেখানে। তোমরা বস, আমি ফিরব এখুনি।' মেদিনার উত্তরের অপেক্ষা না করে তার প্রতি দীর্ঘ মনোযোগী কটাক্ষপাত করে সে বেরিয়ে গেল।

এই দৃষ্টি, যা সেদিনও মেদিনার হৃদয়কে উষ্ণ করে তুলত, তা এখন মনে হল যেন নিভে আসা আগুনের ছাই। মেদিনা বুঝতে পারল না ইয়াভের কেন এমন করল। রেগে গেল নাকি ? ঈর্ষা নাকি ? নাকি সে দেখাতে চাইছে যে সে নীচ সন্দেহের অনেক ওপরে আর আগের মতই তার স্ত্রীর ওপর অগাধ বিশ্বাস আছে ? সে তার গমনপথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল, তার পদশব্দ শুনতে থাকল। ইয়াভের যত দূরে চলে যেতে লাগল ততই বেশী করে বিষণ্ণতা তার হৃদয়কে নিংড়ে দিচ্ছিল। অসতর্ক শিশু যেমন হঠাৎ পাওয়া জাদুর আয়না ভেঙে ফেলে কষ্ট পায় মেদিনাও তেমন কষ্ট পাচ্ছিল যে এমন মূল্যবান ধন পেয়েও সে তাকে রক্ষা করতে পারল না। এমন কষ্ট ভোগ করার কারণ কি ? সে কি স্বামীর সঙ্গে সুখে ছিল না ? একথা সত্যি যে, তার সুখ ছিল যেন ছোট্ট শান্ত নদী, তাতে ঢেউ এসে কখনও কূল ছাপিয়ে যায় নি। 'ঠিক আছে, প্রত্যেকেই নিজের ধরণে বাঁচতে চায়, প্রত্যেকের কাছেই সুখ কথার মানে আলাদা আর প্রত্যেকেরই সুখ নিজস্ব। আমার সুখ হল — এই। হ্যাঁ, আমাদের বিচ্ছেদ প্রয়োজন।' দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল সে।

ঘরে ফিরে সে শিল্পীর মুখোমুখি হল। যখন তাদের দৃষ্টি মিলল মেদিনার সব সিদ্ধান্ত কুয়াশার মত মিলিয়ে গেল। মেদিনা যেন কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে দেয়ালে হেলান দিল। রসিমের খয়েরী চোখে, তার সমস্ত চেহারায় অসীম বিষণ্ণতা। দুঃসহ নিস্তব্ধতায় তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। মেদিনার মনে হল যেন এখন তার সমস্ত ইচ্ছা, জীবন, ভাগ্য সব রসিমের হাতে, সে যা চায়, সবকিছু করতে পারে। সে কথা যেন বুঝতে পেরে শিল্পী তার হাত ধরে নিয়ে তক্তপোষে বসিয়ে দিল।

'আমি জানি যে, ঠিক করছি না, কিন্তু আমি আর পারছি না।'

মেদিনার সারা শরীর কেঁপে উঠল। যেন জ্বরো রুগী হঠাৎ সংজ্ঞা ফিরে পেল, সে হাত দিয়ে রসিমকে এক পাশে সরিয়ে দিল।

'আপনাকে অনুরোধ করছি এসব কথা বলবেন না। আপনি দেখছেন আমি বিবাহিতা, মেয়ে আছে। আপনি আপনার সুখ অন্য জায়গায় পেতে পারেন, যে কোন ভাল মেয়ে আপনাকে বিয়ে করতে রাজী হবে।'

শিল্পী মেদিনার থেকে চোখ সরাচ্ছিল না। মেদিনাও সেই চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে দৃষ্টিতে ছিল প্রার্থনা, অনুরোধ।

'আমি এমন কথা বলব না যে স্কুলেই আপনাকে ভালবাসতাম। এমন মিথ্যা কোন কাজের নয়। যদি বলি যে বছরগুলিতে আমরা পরস্পরকে জানতাম না, তখন আমি খালি শিল্পচর্চাই করেছি, তাও হবে মিথ্যা। আমার জীবনে নারী এসেছে কিন্তু তাদের কেউ আমাকে এমন মুগ্ধ করে নি, এমন সুখের প্রতিশ্রুতি দেয় নি।'

শিল্পী বলছিল আর মেদিনার হৃদয় কখনো নরম হচ্ছিল, কখনো আবার পাথরের মত শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। এখন সে বুঝতে পারছিল বিপজ্জনক মুহূর্তগুলি কেটে গেছে, কেটে গেছে সেই মুহূর্তগুলি লোকে যখন কোনো চিন্তা না করে চোখবাঁধা অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার মত নারীর তার আবেগ অনুভূতিকে যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেওয়া উচিত। হতে পারে, সত্যিই হয়ত আপনার সঙ্গে আমি আরো বেশী সুখী হব। কিন্তু তার জন্য কি দাম দিতে হবে ? যে লোক আমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে তার জীবন, আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ ? না, এমন সুখ আপনার আমার কারুরই দরকার নেই।'

'আপনার মেয়েকে আমি তার নিজের বাবার থেকে বেশী ভাল দেখাশোনা করব।' প্রতিবাদ করল শিল্পী। 'বিশ্বাস করুন, আমি এমন হাল্কামনের মানুষ নই। আমি সব ভেবে দেখেছি। এই দু'মাস ধরে আমি অনেক বছরের যন্ত্রণা সয়েছি। তখন আমি অমনি অমনি বাকু থেকে চলে যাই নি। আমি নিজের থেকে আর আপনার থেকে পালাতে চেয়েছিলাম। পারলাম না। কি করা যাবে... ইয়াভের আমাদের বুঝতে পারবে। ও যখন দেখবে যে, আপনার তার প্রতি মনোভাব পালটে গেছে, তার পরিবারে আর আগের মত হৃদয়ের উত্তাপ নেই, তখন ও নিজেই সুখী হতে পারবে নাকি ?'

'হয়ত সবই ঠিক। কিন্তু তা আমার জন্য নয়, অন্যদের জন্য। আমি জানি, এমন মেয়ে আছে যে দ্বিতীয়বার ভালবেসে, কোনো চিন্তা না করে বাড়ী, সংসার, ছেলেমেয়ে ফেলে চলে যায়। আমি তাদের দোষ দিই না। হয়ত, এতে তাদের অধিকার। কিন্তু আমার সুখ তাতে নয়। আমার মত মেয়ে বিবেককে ধ্বংস করে ফেলে সুখ পায় না। একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে তারা খোঁড়া হয়ে যায়। আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকে না। কিছু

লোক তাদের ভীরু, দুর্বল বলে থাকে। বলুক! তাতে আমার কিছু যায় আসে না।'

শিল্পী মুখ ফিরিয়ে নিল যাতে মেদিনা তার চোখের জল দেখতে না পায়।

'আপনি বিরাট বড় ভালবাসা পাবার যোগ্য মেদিনা!' ফিসফিসিয়ে বলল সে। তারপর পোর্ট্রেটের দিকে দেখিয়ে বলল, 'আমায় আরো দুটি সন্ধ্যা দিন ছবিটি শেষ করার জন্য...'

যাতে কেঁদে না ফেলে সেইজন্য নিজেকে কষ্টে ধরে রেখে কাঁপা গলায় মেদিনা বলল:

'এখানেই থামা ভাল। শেষ করার দরকার নেই।'

সে উঠে দরজার দিকে গেল।

রসিম কোট পরল।

'শেষবারের জন্য একবার আপনার করমর্দন করতে দিন। কথা দিন, যে আমার সম্বন্ধে খারাপ ভাববেন না। আরো মনে রাখবেন: আপনার এক বন্ধু আছে, সে যে কোন কঠিন সময়ে আপনার সব ইচ্ছা বিশ্বাসী ভৃত্যের মত পূরণ করে দেবে। কেমন?'

তার চোখের দিকে না তাকিয়ে মেদিনা সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়ল, তারপর তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে তক্তপোষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার এখন খালি একটা ইচ্ছাই হচ্ছিল কেঁদে বুকের সব ভার হালকা করা। কিন্তু সে কাঁদতে পারছিল না, কি যেন বাধা দিচ্ছিল। এমন সময় দরজায় ঘণ্টা বাজল। ইয়াভের ফিরল। মেদিনা ভাবছিল যে সে ফিরবে ক্রুদ্ধ হয়ে। কিন্তু সে আগের মতই শান্ত, ধীর — হয়ত সে চেষ্টা করছে এমন দেখাতে। খালি চোখের নীচে বিষণ্ণতার কালো ছায়া সে লুকাতে পারছিল না। মেদিনার মনে হল যেন ইয়াভেরের মুখের থেকে এই ছায়াকে কোন দিনই মুছে ফেলা যাবে না। তাকে করিডরে ঢুকতে দিয়ে মেদিনা সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরে তার কাঁধে মাথা রাখল।

'ইয়াভের, প্রিয় আমার...' আর থাকতে না পেরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

ইয়াভের স্ত্রীর চোখের জল মুছিয়ে দিল, মাথায় হাত বুলিয়ে দিল, চুম্বন করল।

'বোকা মেয়ে, কি হয়েছে কি? কেঁদো না, মেয়ের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে।'

বিদ্রোহী চন্দ্রা

আমার কন্যা সেভদের প্রতি

চন্দ্রার সম্বন্ধে চিন্তাতেই আমার এই অন্ধকার জেলখানার ঘরের বিষণ্ন দেওয়ালগুলি আলোকিত। তিক্ততায় ভরা এই জীবন, এই নীল আকাশ আর লাল সূর্যাস্ত, এই এত বড় পৃথিবী যার গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস আমার ঘরের বাইরে থেকে পরিষ্কার শোনা যায়, এই সবকিছুর মধ্যে একান্ত আমার নিজস্ব হয়ে থাকে শুধু চন্দ্রার প্রতি আমার ভালবাসা আর তার সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা।

চন্দ্রার মনপ্রাণকে, হৃদয়কে, যার সৃষ্টি কেবল সুখ ও ভালবাসার জন্য, ব্যথাবেদনার জন্য নয়, তাকে আমার মত করে কে আর বুঝবে...

একথা বলার অধিকার আমার আছে কারণ আমি তাকে ভালবাসতাম। আর কে না জানে যে, ভালবাসা মানুষের অনুভূতিকে, দৃষ্টিশক্তিকে আরো তীক্ষ্ণ করে তোলে। চন্দ্রা কখনও এক মুহূর্তের জন্য আমার চোখের আড়াল হয় নি। বইয়ের খোলা পাতার মতই আমি তার চিন্তাভাবনাগুলি পড়তে পারতাম।

লোকে বলে ভালবাসা নাকি অন্ধ, কিন্তু আমি অন্ধ ছিলাম না। আমি চন্দ্রাকে দেখতাম ঠিক তেমনভাবেই যেমন তাকে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে। আমি ফুলের সুগন্ধ অনুভব করতাম কারণ তারা চন্দ্রার বসনাঞ্চল স্পর্শ করেছে, তারার জ্যোতি দেখতে পেতাম কারণ প্রতিরাত্রে চন্দ্রার চোখের সঙ্গে তাদের মিলন হত। মেঘহীন আকাশ আমার কাছে এত সুন্দর আর উজ্জ্বল মনে হত কারণ সে প্রতিদিন চন্দ্রার মৃদুহাসি দেখতে পায়। এমনকি এখনও, যখন আমি কলকাতার জেলখানার এই মৃত্যুগুহায় বসে আমার মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় শেষ কয়েকটি ঘণ্টা অতিবাহিত করছি, তখনও আমার মধ্যে যে প্রাণ ধুকধুক করছে তার জন্য চন্দ্রার প্রতি কৃতজ্ঞ আমি...

চন্দ্রার প্রতি ভালবাসা। কেমন করে যে তার কথা বলি ? !

আমাদের গ্রাম অথবা অন্য গ্রামাঞ্চলে যেখানেই ভাগ্য আমাকে নিয়ে গেছে কোনোখানেই আমি তার মত আর কোনো মেয়ে দেখি নি। সকালের সূর্যালোকে ঝিকমিক করা ভোরের শিশিরমাখা পদ্মফুলের মতই সে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ভারতের উত্তপ্ত সূর্য আমাদের মেয়েদের খুব ছোট বয়সেই পুড়িয়ে কালো করে দেয়, কিন্তু চন্দ্রা হিমালয়ের সাদা চূড়ার চেয়ে সাদা। তার কোমল সুডৌল কাঁধ আর সুকোমল কুমারী বক্ষ, সব মিলিয়ে সে অদ্ভুত কোমল আর সুন্দর। তার দিকে তাকিয়ে আমার প্রায়ই মনে হত: ভারতবর্ষের সব মেয়েই তার মত হতে পারত যদি ক্ষুধা, প্রচণ্ডপরিশ্রম আর দুঃখ কষ্ট তাদের সৌন্দর্যকে নষ্ট না করে দিত। আর মনে মনে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করতাম: 'ধন্য তুমি, হে রাম ! যদি তুমি চন্দ্রাকে সৃষ্টি না করতে তাহলে পৃথিবী একেবারে নিঃস্ব আর জ্যোতিহীন হয়ে যেত। সে কি তোমার অসীম ক্ষমতার প্রতিমূর্তি নয় ?'

আমার এই চিন্তাধারাকে আপনারা অদ্ভুত আর হাস্যকর ভাববেন না — কারণ এ হল প্রেমিকের চিন্তাধারা। আর আমি সত্য সত্যই বিশ্বাস করতাম যে রাম চন্দ্রাকে সৃষ্টি করেছেন সবাইকে তাঁর অসীম ক্ষমতা দেখবার জন্য। তাকে সৃষ্টি করে যেন তিনি বড়ছোট, শিক্ষিতমূর্খ, নম্র অহংকারী সবাইকে বলেছেন: 'দেখ, আমি কি না পারি। এত সুন্দর বস্তুও আমি সৃষ্টি করতে পারি !'

আমার মনে হত যেন দুঃখে শোকে পাথর হয়ে যাওয়া মানুষদের একটু আনন্দ দেওয়ার জন্যই রাম চন্দ্রাকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আমার মনে হত যে যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষতবিক্ষত আমাদের এই দেশে যে এমন একজন আছে এ সুখের কথা।

আমি নিজেই অনেকবার দেখেছি চন্দ্রা এমন অনেকের মুখে হাসি ফুটিয়েছে যারা জীবনে কখনও হাসে নি, তাদেরও আনন্দ দিয়েছে যারা মায়ের কোল থেকেই জীবনে কখনও সুখের মুখ দেখে নি।

প্রায়ই সে তার ছোঁয়াচে হাসি দিয়ে আমাদের মাটি আর বেতের তৈরী জীর্ণ ঘরগুলিতে জীবনের সঞ্চার করেছে। এমনকি যখন সে রেগে যেত বা বিষণ্নবোধ করত তখনও তার চোখে এক নরম আলো চিকচিক করত। তার চার পাশের জীবন ছিল বালি আর নুড়িপাথর বয়ে নিয়ে আসা মরুভূমির হাওয়ার মতই। কোনো কিছুই তার মনে ছায়া ফেলতে পারত না, সর্বদাই

সে হতভাগ্য মানুষদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। তার একটা মিষ্টি কথা ক্রুদ্ধ ও হতাশ মানুষের মনে শান্তি এনে দিত।

কখনও ভুলব না সেই ঘটনা, যখন আমার চোখের সামনেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত একজন লোককে সে মৃত্যুর পথ থেকে ফিরিয়ে আনে। তার সবে তখন পনর বছর পূর্ণ হয়েছে। যখন সে তার সেই অপূর্ব হাসি হেসে বলল, 'মৃত্যুর জন্য তাড়াহুড়ো করে লাভ কি, মৃত্যু নিজেই কোন একসময় তোমায় খুঁজে নেবে।' — তখন সেই লোকটিও উত্তরে তার প্রতি মৃদু হাসল। আর যেন জীবন তাকে ছুঁয়ে গেল। সে বেঁচে রইল।

একদিন তার সামনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তার পিতা রাহুলকে বললাম:

'চন্দ্রা বসন্তের প্রাণবায়ু। সে সবাইকে জীবন দেয়।'

তার পিতাও তখন কোন প্রতিবাদ করল না।

'আমারও কখনও কখনও মনে হয় যে চন্দ্রা বসন্তের প্রাণবায়ু,' বলল সে। 'যখন ওর জন্ম হয়, আমি গ্রামে ছিলাম না। আমি দু'সপ্তাহ পরে ফিরলাম, আর আমার মনে হল আমাদের দীন কুটীর যেন আলোকিত হয়ে উঠেছে। আমি ঘরের চৌকাঠ ডিঙোনো মাত্রই আমার স্ত্রী কাঁথায় মোড়া একটি ছোট্ট শিশুকে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি তাকে বুকে চেপে ধরলাম। শিশুটি চোখ মেলল, আমার দিকে তাকাল আর মৃদু হাসল। আর আমি বুঝলাম তারই ভেতরে রয়েছে সেই আলো যা আমাদের বাড়ীটাকে ভরিয়ে তুলেছে।'

... হ্যাঁ, আমি ভালবাসতাম চন্দ্রাকে, আর সেই ভালবাসাই হল আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমি দীন, নিঃস্ব। সবচেয়ে দীনদরিদ্রেরও যাতে অধিকার আছে — সূর্যালোক, আমার তাও নেই। তবুও আমি সোনাদানা, মণিমাণিক্যে মোড়া অনেক ধনীর চেয়েও ধনী। আমি সুখ দেখেছি, ওরা তাও জানে না। আমার হৃদয় চন্দ্রার প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ। আর তাদের হৃদয় বিদ্বেষ, হিংসায় পূর্ণ। তারা সবসময় সোনা আর মানুষজনের ওপর অধিকার হারাবার ভয়ে ভীত। যারা পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ এবং ভাল মানুষ আমার গুরু গান্ধীকে জেলে বন্দী করে রেখেছে আর ভারতমাতার সবচেয়ে বুদ্ধিমান সন্তান নেহরুকেও বন্দী করেছে, এমনকি তারাও বুঝতে পারে যে, অধিকার আর সোনা যে কোন দিন তাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া

হতে পারে। কিন্তু আমার ভয়ের কিছুই নেই। আমার অন্তরের একেবারে অন্তঃস্তলে যা আছে, তার থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে কে পারে ?

চন্দ্রার পিতা ছিল দরিদ্র, খোলা আকাশের নীচে তার জন্ম — আর সেই শুষ্ক, জীর্ণ, নিষ্ফলা জমিতেই সে জীবন কাটিয়েছে। বহুদিনের পুরনো রোগে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার মতই সে অভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। পঁচিশবছর আগে যখন রাহুলের বয়স দশ বছরও হয় নি, তার পরিবারের সবাই অনাহারে মারা যায়। ঐ সময় আমাদের গ্রামের আধখানাই শেষ হয়ে যায়। অনেক বাড়ীর দরজা চিরকালের মত বন্ধ হয়ে যায়। যারা জানে যে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ কি জিনিস, তারা এতে আশ্চর্য হবে না।

ঐ বছরই আমি আমার বাবা, দুই ভাই আর বোনকে হারাই। আমি রাহুলের থেকে বছর আষ্টেকের বড় ছিলাম। আমি বিশ্বাস করতাম যে দেবদেবীরা আমাদের ওপর রেগে গেছেন, তাই সতর্কভাবে পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাবার শপথ নিলাম। সাধারণ মানুষ যার থেকে সামান্যতম সুখও পায় তার সবকিছু ত্যাগ করলাম এবং বিবাহ না করার পণ নিলাম। কিন্তু রাহুল আমার চেয়ে ছোট ছিল আর ছেলেবেলা থেকেই সে ছিল বিদ্রোহী স্বভাবের, সবেতেই তার অবিশ্বাস। আমার কাছে পৃথিবী ছিল অজানা দৈবিক শক্তিতে পূর্ণ, আর সে অকম্পিত পদে এগিয়ে যেত রামের মূর্তির দিকে, যেন সেটা একটা সাধারণ পাথর। পবিত্র জীব বানরগুলি, যাদের দিকে আমি সাধারণ চোখে তাকাতেই পারতাম না, তাদেরকে সে লাঠি দিয়ে এক গাছ থেকে আর এক গাছে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত, তাদের শিশুগুলির লেজ এমনভাবে চেপে ধরত যে সারা বনময় তাদের কান্না শোনা যেত। আমি ভাবতাম, ওর ভেতরে শয়তান বাসা বেঁধেছে কিন্তু তবু তার সঙ্গ ছাড়তেও পারতাম না। সে ছিল হাসি-খুশী, সাহসী, বিশ্বস্ত বন্ধু...

রাহুলের চরিত্রের এই দিকটা চন্দ্রার মধ্যেও আছে। চারাগাছের যেমন সূর্যের প্রতি আকর্ষণ তারও ঠিক তেমনি জীবনের প্রতি আকর্ষণ। দুঃখকষ্ট তার হৃদয়কে শুকিয়ে দেয় নি। সর্বদা সে হাসি খুশী, আনন্দময়ী, সৌজন্যশীলা।

জেলে আসার মাসখানেক আগে আমি রাহুলের বাড়ী গিয়েছিলাম। গ্রামের মাঝখানে তার নলখাগড়ার কুটীর। যখন আমি ঘরে ঢুকলাম, রাহুল মেঝেতে মাদুর পেতে বসে তিনজন কৃষকের সঙ্গে কোনো বিষয়ে কথা

বলছিল। চন্দ্রা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরনে ছিল মোটা সুতীর কাপড়। তার নমনীয় তন্বী দেহে ঐ শাড়ি এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন তার পরনে আছে দামী সূক্ষ্ম বস্ত্র। চন্দ্রা মাথা নাড়িয়ে আমাকে ভিতরে আহ্বান জানিয়ে একটু সরে দাঁড়াল। রাহুল আর কৃষকরা উঠে দাঁড়াল।

রাহুল ইঙ্গিতে সশঙ্কিত কৃষকদের বোঝাল যে আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। তারপর আবার বলতে লাগল:

'আমি তোমাদের বলছি, এ চলতে দেওয়া যায় না। ওদের গ্রাম থেকে বার ক'রে দিতে হবে। যদি ওদেরকে তোমরা এখন ছেড়ে দাও তো ওরাই তোমাদের জমি থেকে হটিয়ে দেবে। তোমাদের যে এই মাটিতেই জন্ম, এখানেই যে তোমাদের পিতামাতারা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন... তাতে ওদের কিছুই যায় আসে না... তোমরা এই ইয়াঙ্কিগুলোকে জান না, এরা নিজেদের টুকরোটা ইংরেজদের থেকেও শক্ত করে কামড়ে ধরে। একবার যদি তোমরা এদের ঢুকতে দাও তাহলে ঐ জমির টুকরো, যা তোমাদের কোনোরকমে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাও হারাবে। তোমরা স্ত্রী পুত্র সমেত রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াবে, ভিখারীর দলের সংখ্যা বাড়াবে... না, তা হতে দেওয়া যায় না। ভারতবর্ষের থেকে এক প্রভুই এখনও বিদায় নিতে না নিতেই আর একজন ইতিমধ্যেই এসে তার শরীরে হিংস্র নখ বেঁধাতে আরম্ভ করেছে। এই দুই শত্রুই জাহান্নমে যাক!'

'আমি যদি শহরে গিয়ে কাপড়ের কারখানায় কাজ নিই?' দোনামনা করে বলল একজন কৃষক।

'সেখানে নিশ্চয়ই সবাই তোমার অপেক্ষায়ই আছে।' বিদ্রূপ করে বলল রাহুল। 'তুমি আসামাত্রই তারা তোমাকে আলিঙ্গন করে বলবে: এই তোমার চাকরি, এই তোমার রুজি, কাজ কর, থাক। আসলে শহরের রাস্তায় রাস্তায় তোমার মত ক্ষুধার্ত হাজার হাজার লোকের ভীড়। তারা কাজ আর রুটীর সন্ধানে ঘুরছে আর দরজার থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কুকুরের মতন। জান তারা শূদ্রদের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করে? তাদের থেকে দূরে সরে থাকে যেন তারা কুষ্ঠরোগী... তুমি রাস্তায় মরে পড়ে থাকবে, তোমার দেহটা নিয়ে শিয়ালে কামড়াকামড়ি করবে, আর কেউ তোমার দিকে এগোবে না।'

রাহুল যে ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিল তাতে কৃষকগুলি সেই দূর অজানা

জগৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা জানত, রাহুল সত্য কথা বলছে। সে সব জায়গাতেই তো গিয়েছে। শহরে কাপড়ের কারখানাতেও সে কাজ করেছে, সেই সময় সেখানে গাড়ীচাপা পড়ে সে একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছে... চন্দ্রাকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসার আগে কত গভীর দুঃখকষ্টই না সে সহ্য করেছে।

আমি তার জামাটা ছুঁলাম:

'তোমরা কি সম্বন্ধে আলোচনা করছ, রাহুল ?'

রাহুল বাঁকা হাসি হেসে বলল:

'আমাদের জমিদার মহাপ্রভু সঙ্গে করে একজন লোককে নিয়ে এসেছেন। এঁকে তিনি নিজের জমির এক অংশ চাবাগান করার জন্য ইজারা দিতে মনস্থ করেছেন। আর যে সব কৃষকদের এখনও এক টুকরো করে জমি আছে ঐ ভদ্রলোকটি তাদের বলেছে, তোমরা আমাকে বিক্রী করে দাও তোমাদের জমি, তার বদলে তোমরা আমার হয়ে কাজ করবে জমিতে...'

ছোট্ট, কালো হাড়জিরজিরে রোগা একজন কৃষক ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল:

'হ্যাঁ, উনি বলেছেন, জমি চাষের ভার আমাদের...

'ওঃ, কি আমার উপকারী!' তাকে থামিয়ে দিল রাহুল। তারপর উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল:

'আমি এই সব লোককে ভাল করেই জানি। এরা সোনাকে পূজা করে, যেমন আপনি রামকে পূজা করেন। আমাদের গ্রামের মধ্যে এক পা' বাড়াতে দিলেই, সে সবার অলক্ষ্যে আমাদের সবাইকে গিলে খাবে...'

একজন কদাকার কৃষক, যার লোমহীন চোখগুলি ঝাঁটার মত ভ্রূর নীচে চকচক করছিল, হাত দিয়ে খালি পা চুলকে বলল:

'আমরা কোথায় যাব ? পথ কোথায় ?'

'একটাই পথ আছে।' গলা নামিয়ে বলে চলল রাহুল। 'আমাদের জমিদার যদি জমি ছেড়ে দিতেই চায় তবে ইয়াঙ্কিকে না দিয়ে তা' আমাদের দিক। ন্যায্যমত তার দাম ঠিক করে কৃষকদের কাছে বেচুক। যদি জমি ভাল ফসল দেয় তবে তিন-চার বছরের মধ্যে আমরা সব টাকাটা শোধ করে দেব।'

'জমিদার যদি রাজী না হয়, তাহলে আমরা কি করব ?' বলল তৃতীয় কৃষকটি, যার নগ্ন হাতপাগুলি সরু সরু কাঠির মত।

'যদি জমি না দিতে চায়, আমরা জমি দখল করে নেব। এই জমিতে আমাদের পূর্বপুরুষের রক্ত, ঘাম পড়েছে, এই জমিতে আমাদের অধিকার।

আমরা কিছুতে এই জমি বিদেশীদের হাতে তুলে দেব না যতক্ষণ আমাদের বাহুতে একটু শক্তিও আছে।'

রাহুল হাতের মুঠি পাকিয়ে শূন্যে ঝাঁকিয়ে আমার দিকে জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে তাকাল। চন্দ্রা আর কৃষকরাও আমার দিকে তাকাল যেন সমর্থন পাবার আশায়।

'না, বাছারা,' বললাম আমি, 'বলপ্রয়োগ আর বিদ্বেষ দ্বারা কোন ভাল ফল পাওয়া যায় না। সারা ভারতবর্ষে এখন জনগণ অসীম ধৈর্য দেখিয়েছে। জনগণ বিভিন্ন জায়গায় সমবেত হচ্ছে, মিছিল করছে, ইংরাজদের প্রতি বলছে: 'শান্তিপূর্ণভাবে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাও!' তারা রক্তপাত ঘটাচ্ছে না, শক্তিপ্রয়োগ করতে চাচ্ছে না। সত্য তোমাদের পক্ষে। তোমাদের উদ্দেশ্য জনহিতকর। কিন্তু অসৎপথে সে উদ্দেশ্য সাধন করা উচিত নয়। বলপ্রয়োগ করো না। এই শক্তির প্রয়োগই পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করে, মানবজীবনে অশেষ দুঃখ কষ্ট নিয়ে আসে। বলপ্রয়োগে বিশ্বাস করো না, সত্যকথায় বিশ্বাস করো, সত্যকথা এমনকি অত্যাচারীর হৃদয়েও প্রবেশ করে। তাদের কাছে একথা বুঝিয়ে বল তারাও হিংসা থেকে বিরত হবে এবং সবার মঙ্গল করতে চাইবে...'

সহজ স্বাভাবিকভাবে আমি বলে যেতে লাগলাম। আমি বলছিলাম সেই সব কথা যা আমি আমার কুটীরের নিস্তব্ধতায় বসে চিন্তা করতাম, দেবদেবীরা যাদের মুখ দিয়ে সত্য কথা বলান তাদের কাছ থেকে যা আমি শিখেছি সেই সব কথা।

কিন্তু হঠাৎ একটা বিদ্বেষপূর্ণ হাসি আমাকে থামিয়ে দিল।

আমি দেখলাম যে রাহুল আমার কথা শুনছে না, সে বাইরে তাকিয়ে আছে তার ঘরের দরজার মধ্য দিয়ে... কৃষকদের মুখেচোখে দিশাহারাভাব। আর চন্দ্রা... সেও যেন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট, কিন্তু বরাবরের মতনই মিষ্টি হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'চন্দ্রা,' শক্তিসঞ্চয় করে আমি বললাম, 'যখন তুমি মাসখানেক আগে শান্তির আহ্বানের সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করছিলে, তখন প্রথম স্বাক্ষর করি আমি। তুমি জনগণকে শান্তির পথে আহ্বান জানাচ্ছিলে, তাহলে এখনও তাদের মধ্যে প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের বীজ ছড়াও। এতেই আমাদের সুখ, আমাদের পরিত্রাণ। ন্যায়ের পথে থাকতে গেলে অসীম ধৈর্য রাখতে হয়।

বলপ্রয়োগ করো না। এমনকি তারা যারা তোমাদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করে, মিষ্টি কথায় তাদেরও বশ করা যায়।'

রাহুল আমাকে উপেক্ষা করে উঠানে বেরিয়ে গেল। আমি তাকে এজন্য মাফ কর দিলাম। যারা পৃথিবীর জনগণকে সত্যকথা শোনায় তাদের অনেক অপমান সহ্য করতে হয়।

আমি বেরিয়ে এলাম, অনুভব করছিলাম যে চন্দ্রার বিস্মিত কিন্তু স্নেহময় দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করছে।

আমার সবচেয়ে কষ্ট লাগছিল এই ভেবে যে সেও আমার কথা বুঝল না। কেমন করে আমি অত্যাচারীর হৃদয়ে সাড়া জাগাব যদি চন্দ্রা, আমার প্রাণের চন্দ্রা, আমার আহ্বানে কান না দেয় ?

সকালবেলায় আমি গ্রামের চত্বরে বেরিয়ে রাহুলকে দেখতে পেলাম। তাকে ঘিরে একটা ভীড় জমে উঠেছে। আমিও এগিয়ে গেলাম সেদিকে।

রাহুল সেই সব বিদ্রোহের কথাবার্তাগুলি দিয়েই কৃষকদের উত্তেজিত করছে। আমি তার কথা শুনতে লাগলাম। তার কথার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছিল অসীম ঘৃণা। সেই ঘৃণা দিয়েই সে কৃষকের প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে তুলতে চাইছে।

আমি আবার গ্রামবাসীদের আহ্বান জানালাম শান্তির পথে চলার জন্য। আমি তাদের বোঝালাম যে মানুষের রক্তপাত, স্বজাতির রক্তপাত ঘটানো আমাদের ধর্মের বিরোধী।

দুঃসহ নিস্তব্ধতায় বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তারা আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি রাহুলকে পাশ কাটিয়ে গেলাম। এবারে আমি ওর চোখে নতুন একটা কিছু দেখতে পেলাম: সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি তার পথের মাঝখানে পড়ে থাকা একটা গাছ।

গ্রামের প্রান্তে দেখতে পেলাম চন্দ্রাকে। আমাদের গ্রামের মেয়েরা তাকে ঘিরে আছে। বাবার মত সেও তার চারদিকের লোকদের শোনাচ্ছে উত্তেজিত বিদ্রোহী কথাবার্তা:

'আমরা আমাদের ভাইদের ও স্বামীদের সঙ্গে যোগ দেব। এই পৃথিবীতে দুর্বলদের গিলে খাওয়া হয়। আমাদের শক্তিশালী হতেই হবে, তা' নাহলে আমরা কখনই ন্যায় ও সুখ লাভ করব না !..'

আমি আবার গিয়ে সেখানে কথায় যোগ দিলাম।

'শক্তিতেই সুখ নয়, বাছারা, সুখ ধৈর্যে,' বললাম আমি, 'ধৈর্য ধর। তোমাদের স্বামীদের রক্তাক্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত কর। চেষ্টা কর যেন তাদের হৃদয় সর্বদাই ভালবাসায় পূর্ণ থাকে।'

চন্দ্রা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। রাহুলের মত তার চোখের দৃষ্টিতে অতটা হতাশা ও বিরক্তি ছিল না, যেন অন্তরঙ্গ ব্যক্তির দোষ শুধরে দিয়ে নরমভাবে বলল:

'আপনি তো নিজেই বলেছেন, সত্য আমাদের পক্ষে, তাহলে আমাদের সত্যর জন্য লড়াই করত বাধা দেবেন না। জানবেন যে আমরা বাঁচতে চাই। এখনকার চেয়ে ভালভাবে বাঁচতে চাই। আমরা চাই যে আমাদের পরিশ্রমে উৎপন্ন রুটির টুকরো আমাদের মুখ থেকে যেন কেড়ে নেওয়া না হয়... আপনি তো জানেন কত কষ্ট করে ঐ রুটির টুকরোটা যোগাড় করতে হয়!'

এমনভাবে কেবল চন্দ্রাই বলতে পারে, যে জীবনে কখনও ঠিক ছাড়া ভুল কথা বলে নি। আমি তার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, কিন্তু আমার মনে হল যেন সে আমারই মনের অনেক অনেক গভীরে লুকিয়ে থাকা কথাটাই বলে দিয়েছে। আমি তার কথার কোন প্রতিবাদ করতে পারলাম না। চুপ করে চলে এলাম।

ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলায় জমিদারের বাড়ী আমার ডাক পড়ল। জমিদার আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর দেহরক্ষী আর জমাদারকে পাঠিয়েছেন।

দরজার পর্দাটা একটু সরান ছিল, আমি দূর থেকেই দেখতে পেলাম সদা বিষণ্ন, মসৃণ ধূসর মুখ, যার চোখে অশুভ আলোর ছায়া। তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসছেন দেখে আমি কেমন যেন কেঁপে উঠলাম। তখুনি আমার মনে হল: এই জগৎ চিরকালই আমার কাছে কোলাহলময় মৃত্যুপুরী মনে হত, কোন কিছু এমনকি মৃত্যুকেও আমার ভয় নেই। তবুও আমি নির্ভয়ে এই লোকটির চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না। তার ভেতরে কি যে এক অশুভ শক্তি রয়েছে। কৃষকরা বলত যে যদি কোন লোক তার পছন্দ না হয় তো জমাদার তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে অথবা হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে ধরবে। এ হল জল্লাদ। দয়া, বিবেক বা ধর্ম কোন কিছুই তার নেই।

এমন লোককে জিজ্ঞাসা করার কোনো মানেই হয় না কেন জমিদারের আমাকে দরকার। কোনো কথা না বলে আমি চললাম তার সঙ্গে।

জমিদারের বাড়ীটা ছিল গ্রামের থেকে একটু দূরে। ঘন পত্রপল্লবে

মর্মরিত উঁচু উঁচু গাছপালায় ঘেরা। ছোট দরজা খুলে আমি উঠোনে ঢুকলাম, নদীর বালি বিছানো পথ ধরে বারান্দাওয়ালা একতলা বাড়ীটির দিকে এগিয়ে গেলাম। বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান। আমি ফুলের সুগন্ধ উপভোগ করতে করতে, পথের ওপর গাছপালার চাঁদোয়ার নীচ দিয়ে চলতে লাগলাম। ফুলবাগানের চারদিক ঘিরে ঘন হয়ে গজিয়ে উঠেছে আইভিলতা। তার ফাঁক দিয়ে সূর্যের একটা রশ্মিও ভেতরে ঢুকতে পারে না।

আমি দরজা অবধি যাবার আগেই জমিদার বেরিয়ে এলেন। মাঝারি লম্বা, বড়কানাওয়ালা স্প্যানিশটুপি, সাদা শার্ট, সরু টান টান হয়ে বসা প্যাণ্ট পরনে, পায়ে চটি। অপ্রত্যাশিত সম্মানসহকারে তিনি আমায় গ্রহণ করলেন এবং বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন।

তাঁর এই অনভ্যস্ত সৌজন্যপ্রদর্শনে আমার মাথায় অদ্ভুত চিন্তা জাগতে লাগল তাই আমি যে সব ঘরের মধ্যে দিয়ে এলাম সেগুলোকে ভাল করে দেখলাম না পর্যন্ত।

আমরা একটি হলঘরে প্রবেশ করলাম, যার বিশালত্ব বিস্ময়ের উদ্রেক করে। দুই জানলার মাঝখানের দেওয়ালে বইভর্তি তাক। আমাদের জমিদার অল্পবয়সী, বোম্বাইতে পড়াশোনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে তিনি বেশ গর্ববোধও করেন। উল্টো দিকের দেওয়ালের কাছে মিহি বুটীদার কাপড়ে ঢাকা নীচু চওড়া তক্তপোষ। ঘরের মাঝখানে ছিল মেহগনি কাঠের ছোট ছোট কতকগুলি টেবিল। এইরকম একটি টেবিলের কাছে বসেছিল বিরাট বড়সড় চেহারার ভদ্রলোক, আমাদের জমিদারের থেকে তার চেহারা দু'গুণ বড়। জমিদারের চাপা রঙের পাশে সেই ভদ্রলোকের মুখ যেন সাদা মনে হল। আসলে সেই মুখে একটা হলদেটেভাব ছিল। তার চোখের রঙও ধূসর কি হলুদ ঠিক বোঝা যায় না। যদি তার মুখে অকপট প্রায় বেহায়া হাসি না লেগে থাকত, তবে বোধহয় তার কদর্য মুখের দিকে তাকান যেত না। ঐ হাসির জন্য তার অসমান কপালের নীচে বিবর্ণ ভ্রূর কুশ্রী নজরে আসে না। আস্তে আস্তে ধোঁয়া বার করতে থাকা তার পাইপ প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাকে একবার দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে সে ভাগ্য তাকে যা দিয়েছে তাতে সুখী আর নিশ্চয় জানে যে পৃথিবীতে সবকিছু যেমন চলছে, তেমনই চলা উচিত। এককথায়, তাকে দেখলেই বোঝা যায় যে কোন দুশ্চিন্তা তার অন্তর্জগতকে আচ্ছন্ন করে নেই।

জমিদার আমার পরিচয় দিয়ে বললেন:

'ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই একজন করে গুরু আছেন, মিস্টার স্মিথ। আমাদের গ্রামের গুরু হলেন মিস্টার রামুলি। তিনি গান্ধীর উপযুক্ত শিষ্য ও অনুবর্তী।'

'অল রাইট!' বেশ সৌজন্যের সঙ্গেই বললেন মিস্টার স্মিথ। তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে উঠে ধূমায়িত পাইপটা বাঁহাতে নিয়ে আমার দিকে ডানহাতটা বাড়িয়ে দিয়ে আবার বললেন: 'অল রাইট...'

তারপর মিস্টার স্মিথ সেইরকম ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে আবার নিজের জায়গাতে বসলেন। জমিদার আমাকেও বসার জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

'বসুন, মিস্টার রামুলি। বিশ্বাস করুন, মিস্টার স্মিথ আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় আনন্দিত। মিস্টার স্মিথ বলেন যে, গান্ধীর দর্শন এবং তাঁর প্রচারিত বাণী চিরকালই তাঁর ভাল লাগত। তাঁর মতে, যদি পৃথিবীতে সবাই গান্ধীর উপদেশমত জীবনধারণ করত, তাহলে জীবনে কেউ আর অসুখী থাকত না...'

যতক্ষণ জমিদার কথা বলছিলেন, আমি একবার তাঁর দিকে একবার তাঁর অতিথির দিকে দেখছিলাম। মিস্টার স্মিথও হাতে পাইপটা ধরে একদৃষ্টিতে আমাকে দেখছিলেন। আমাদের আলোকপ্রাপ্ত জমিদার বলে চলেছিলেন সৌজন্যসহকারে একবার আমার দিকে একবার মিস্টার স্মিথের দিকে মাথা নুইয়ে। মনে হচ্ছিল, তিনি নিজেকে দু'জন পরস্পরকে বুঝতে অক্ষম লোকের মধ্যে মধ্যস্থতা করছেন। আমি কিন্তু ইংরাজী ভালই বলি। বুঝলাম যে, মিস্টার স্মিথ বেশী রঙচঙা কথাবার্তা বলতে ভালবাসেন না, অন্যেরা তাঁর হয়ে বলে দিক এটাই তিনি বেশী চান। জমিদারের প্রতিটি কথা শুনতে শুনতেই আমি আড়চোখে দেখে নিচ্ছিলাম মিস্টার স্মিথের দিকে। আমার একটু অস্বস্তি লাগছিল যে তিনি আমার . থেকে চোখ সরাচ্ছিলেন না। আর যখন জমিদার থামছিলেন মিস্টার স্মিথ তাঁর কথাগুলিকে সমর্থন করার জন্য 'অল রাইট' বলছিলেন আর কালো হয়ে যাওয়া পাইপটা ধীরে ধীরে চুষছিলেন। সবকিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা বিশ্রী একঘেয়ে হয়ে দাঁড়াল; আমার মনে হতে লাগল যে আমি ঘড়ির পেন্ডুলামের ডাইনে বাঁয়ে দোলার একঘেয়ে আওয়াজ শুনছি।

মাঝে মাঝে মিস্টার স্মিথ সাদা সিল্কের জামায় লেগে থাকা সবুজ টাইটাকে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। জমিদার তখনও বলেই চলেছেন। মনে হচ্ছিল, তিনি যে মিস্টার স্মিথের দার্শনিক মতামত ভাবধারা সম্পর্কে

বিশদভাবে আমাকে শোনাচ্ছেন তা আমি বা মিস্টার স্মিথ শুনি বা না শুনি তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না।

'মিস্টার রামুলি জানবেন আপনি যে এই বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোতে পেরেছেন তার জন্য আপনার মিস্টার স্মিথের কাছে বাধিত হওয়া উচিত। এখন আপনি আমার অতিথি নন, ওঁর অতিথি।'

আমি একটু মাথা নোয়ালাম।

'ধন্যবাদ, মিস্টার স্মিথ। আমি এ সম্মানের যোগ্য নই।'

'অল রাইট!'

এবারে মিস্টার স্মিথ এত জোরে কথাটা বললেন যে আমার মনে হল যেন অন্য কেউ কথা বলল।

জমিদার মুখে খুশী ভাব নিয়ে উঠলেন, সামনের দরজা একটু খুলে কি যেন আদেশ দিলেন।

এক মিনিট কাটল না, জমাদার ট্রেতে করে তিন গেলাস আনারসের রস এনে রাখল। জমিদার একটি গেলাস মিস্টার স্মিথের সামনে রাখলেন, আর একটি আমার সামনে ও অন্যটি নিজে নিলেন।

'মিস্টার স্মিথ মনে করেন, আপনার আরো বেশী সম্মান পাওয়া উচিত।' বললেন তিনি। 'যে ব্যাক্তি নিজের দেশবাসীর বিদ্রোহী মনোভাব ও চিন্তাধারাকে নরম করার চেষ্টা করে, তাদের বিদ্বেষ ও বলপ্রয়োগের পথ থেকে সরিয়ে আনে, তাঁর ভেতরে মস্ত বড় ক্ষমতা আছে, মিস্টার রামুলি।'

আবার পাইপ ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। আবার মিস্টার স্মিথ আমার থেকে চোখ না সরিয়ে ছেলেমানুষের মত বললেন: 'অল রাইট!' তারপর গেলাস নিয়ে রস খেতে লাগলেন।

জমিদারও তাড়াতাড়ি গেলাস হাতে তুলে নিলেন এবং ইঙ্গিতপূর্ণভাবে আমার দিকে তাকালেন, আমিও গেলাস হাতে তুলে নিলাম।

'যা বলছিলাম মিস্টার রামুলি, মিস্টার স্মিথ বলেন যে যেসব লোকেরা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না তারা জন্তু জানোয়ারের জীবন যাপন করে। মিস্টার স্মিথের মতে যখন লোকে আত্মার গভীরে প্রবেশ করতে পারে তখনই সে সংস্কৃতির প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করতে পারে আর তার বিরাট আদর্শ সৃষ্টি করতে পারে। সেইজন্যই তো মিস্টার স্মিথ নিজের প্রাচুর্যময় দেশ ছেড়ে আমাদের গরীব দেশে এসেছেন, এমনকি ভেবে দেখেন নি যে আমাদের দেশের আবহাওয়া ভাল না।'

'অল রাইট !' আবার মিস্টার স্মিথ কেমন এক অদ্ভুত ভেতর থেকে উঠে আসা গমগমে কণ্ঠস্বরে জমিদারের কথার সমর্থন জানালেন।

এবার আমি বুঝতে পারলাম যে বার বার বলা একই কথা প্রত্যেকবারই একটি নির্দিষ্ট সুরে উচ্চারিত হওয়ায় নির্দিষ্ট অর্থ বহন করছিল।

আমার মনে হতে লাগল যে আমাদের অতিথির কোন একটা ইচ্ছা আছে যা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এমন সম্মানিত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করার ঝুঁকি নেব না বলে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে জমিদারের দিকে তাকালাম।

জমিদার তার উত্তরে চোখের ভাষায় আমাকে আশ্বস্ত করলেন। 'স্থির হোন, আপনাকে এখনই কিছু করতে হবে না।' সেই দৃষ্টি যেন আমায় বলল। তার পর জমিদার আবার পুরনো সূত্র ধরে কথা আরম্ভ করল:

'মিস্টার রামুলি, আপনি আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে জনগণকে সুখ দেবার এবং তাদের সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করার প্রচেষ্টা আপনা থেকেই বাস্তবায়িত হবে না। যে সব লোকেরা ধর্ম ছেড়েছে, অপরাধের পথে গেছে তারা নিশ্চয়ই সত্য প্রচারে বাধা দেবে। কিন্তু মিস্টার স্মিথ এমন লোকদেরও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও বলপ্রয়োগের বিরোধী। এদিক থেকে আমাদের দেশের ওপরমহলের বর্তমান রাজনীতি মিস্টার স্মিথের পছন্দ নয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন এই রাজনীতি অনুপযুক্ত। যখন নরম ফলপ্রসূ পথে কাজ করা যায় তখন বিচারালয়, জেলখানা এসবের কোন প্রয়োজনই নেই...'

মিস্টার স্মিথ আমার থেকে চোখ না সরিয়ে — যাদের রঙ আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না ধূসর নাকি হলুদ — পাইপের থেকে ছাই ঝেড়ে আবার তাতে তামাক ভরতে লাগলেন।

আর তা তিনি করছিলেন পাইপের দিকে মোটেই না তাকিয়ে। যেন তাঁর প্রতিটি আঙুলের ডগায় দুটো করে চোখ আছে। 'মিস্টার স্মিথ রাতে ঘুমোবার সময়ও পাইপ কাছছাড়া করেন না বোধ হয়।' ভাবলাম আমি।

যখন জমিদার শেষের কথাগুলি বলছিলেন মিস্টার স্মিথের আঙুলগুলি পাইপে তামাক ভরতে ভরতে মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। সেই একই কথা শোনা গেল কিন্তু যেন একটু কঠোর স্বরে:

'অল রাইট !'

জমিদার নিজের বলা কথার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বলেই চললেন:

'মিস্টার স্মিথের মতে মানবজাতির এত কষ্টের কারণ তার মিথ্যাপথে চলা। খালি সত্যের আলোকই পারে মানুষকে রক্ষা করতে। মিস্টার স্মিথ জানেন যে সত্য আপনার মধ্যে বাসা বেঁধেছে মিস্টার রামুলি। তিনি জানেন যে রাহুলের বাড়ীতে আপনি আপনার মনোভাব জানিয়ে দিতে কোন ভয় পান নি আর আজ গ্রামের চত্বরে সমস্ত গ্রামবাসীর সামনে নিজের মতবাদের সমর্থনে বলেছেন। মিস্টার স্মিথের মতে ভগবানই কেবলমাত্র এমন বীরত্বের কাজকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করতে পারেন।'

মিস্টার স্মিথ দেশলাই জ্বালিয়ে মোটা মোটা ঠোঁটে চেপে ধরা পাইপটাকে জ্বালালেন। তিনি ছেলেমানুষের মত একবার জ্বলে ওঠা, আবার নিভে আসা দেশলাইটাকে নিয়ে খেলা করছিলেন। যখন আগুনের শিখা সরু কাঠিটা বেয়ে মিস্টার স্মিথের আঙুলগুলো ছুঁয়ে গেল, তখন তিনি দেশলাইকাঠিটা সাদা মার্বেলের একটা পাত্রে ফেলে দিলেন।

এই বিখ্যাত অতিথি কিছুক্ষণ পাইপটা চুষলেন, তারপর শেষ পর্যন্ত আমার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ওপর দিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠা মনোযোগ দেখতে লাগলেন।

সম্ভবতঃ আমার মুখে তাঁর আগ্রহ জাগানোর মত আর কিছু নেই। আমিও এই সুযোগে তাঁকে ভাল করে দেখে নিতে লাগলাম। কিন্তু যত ভাল করেই দেখি না কেন আমি তাঁর মধ্যে নতুন কিছুই দেখতে পেলাম না। প্রথম দেখার পরেই তাঁকে আমার যেমন মনে হয়েছিল তেমনই ধীর, স্থির, হিতৈষী, যিনি মুরগীর রক্ত দেখলেও বিচলিত হন মনে হতে লাগল।

'অল রাইট!' নরম স্বরে বললেন মিস্টার স্মিথ। জমিদার তখুনি বিষয় পরিবর্তন করলেন:

'মিস্টার স্মিথ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এটি দিতে চান।'

জমিদার চেয়ার ছেড়ে উঠে টেবিল থেকে কি একটা জিনিস তুলে নিলেন। টাটকা ফুল দিয়ে গাঁথা মালা। জমিদার নিজে হাতে আমাকে সেটা পরিয়ে দিলেন।

আমি এত অভিভূত হয়ে পড়লাম যে কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল, আমি সম্মানিত অতিথিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম:

'ধন্যবাদ মিস্টার স্মিথ। বিশ্বাস করুন, আমি কখনও কল্যাণের পথ থেকে বিচ্যুত হব না...'

'অল রাইট।'

আমি চুপ করে গিয়ে প্রশ্নসূচকভাবে জমিদারের দিকে তাকালাম কারণ কেবল তিনিই এই অতিথির কথার মানে বুঝতে পারেন।

জমিদার তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর দিকে গেলেন আর ছোট্ট একটা লাল বাক্স নিয়ে ফিরে এলেন। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন:

'মিস্টার স্মিথ বলেন, ফুল যতই সুন্দর হোক না কেন তা ঝরে যায়। তিনি আপনাকে এমন একটা স্মৃতিচিহ্ন দিতে চাচ্ছেন, যা জীবনে যত ঝড়ই আসুক না কেন, কোন কিছুই আপনার ক্ষতি করতে পারবে না, এমন কিছু যা আপনাকে সর্বদা মিস্টার স্মিথ-এর কথা মনে করিয়ে দেবে।'

বাক্সটা খুলে তিনি একটা বড় ফিরোজাপাথর বসান আংটি বার করে আমার মধ্যম আঙুলে পরিয়ে দিলেন।

মিস্টার স্মিথ বলেন যে এই আংটি সুখ নিয়ে আসে, খালি মৃত্যুতেই এর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে।

জমিদার নিজের জায়গায় বসলেন।

'বসুন, বসুন মিস্টার রামুলি,' বললেন তিনি। 'মিস্টার স্মিথ বাকী জীবনটা মানবজাতির সেবায় কাটাবেন বলে শপথ নিয়েছেন। ভাল কাজ করা, মূর্খকে আলোকদান করা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান করা — এতেই তিনি জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য দেখেন।'

জমিদারের কথায় একটু স্বস্তি পেলাম। ভাবলাম এই সুযোগে আমাদের কৃষকদের জন্য একটু কথা বলে নেওয়া যাবে। বহুবছর ধরে জমির ইজারা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিসব ধারদেনা এই কৃষকদের কাঁধে চেপে আছে। প্রত্যেক বছর তার ওপর নতুন নতুন দেনা চাপছে।

'সম্মানিত মালিক,' যতটা সম্ভব সম্মান দেখিয়ে বললাম, 'আজ আপনার মুখ দিয়ে স্বয়ং বিষ্ণু কথা বলেছেন। সত্যিই তো, জনগণের মঙ্গল করার থেকে ভাল আর কি হতে পারে। আমাদের কৃষকেরা অনেকেই আপনার কাছে ঋণী। আপনি জানেন, এই সব দেনা তাদের পক্ষে কতটা...'

'অল রাইট!'

এত জোরে এবার কথাটা বললেন মিস্টার স্মিথ যে আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম, তারপরে তাড়াতাড়ি চোখ ফেরালাম জমিদারের দিকে। তাদের মুখে একটা ছায়া দেখতে পেলাম। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তা মিলিয়ে গেল, আবার দেখা দিল সৌজন্যময় মৃদু হাসি।

'বুঝেছি, আপনি কি বলতে চান,' বললেন জমিদার, 'সেইজন্যই তো

মিস্টার স্মিথ এখানে চায়ের বাগান করার মনস্থ করেছেন। যদি আমাদের কৃষকদের পুরো আয়ের হিসাব করতে হয় তো মাসে তা আট টাকাও হয় নি। মিস্টার স্মিথ চাইছেন আমাদের অনুর্বর, নিষ্ফলা জমি নিয়ে নিতে যাতে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করা যায়। তিনি প্রত্যেক কৃষককে কাজ দেবেন আর তার বদলে তারা পাবে পনের টাকা... তারপর বছর কুড়ি বাদে যখন তিনি ঐ জমি সুফলা করে তুলতে পারবেন আর কৃষকদের চা উৎপাদন শিখিয়ে দিতে পারবেন তখন তিনি এই জমিটা তাদের দিয়ে দেবেন আর নিজে,' জমিদার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'নিজে তিনি তখন নির্মল বিবেক নিয়ে ভগবানের সামনে দাঁড়াবেন... মিস্টার স্মিথ, মনে করেন, তিনি লোকের এই সব ভাল কাজ করার জন্য পরলোকে শান্তিলাভ করবেন...'

'অল রাইট!'

আমি মিস্টার স্মিথের দিকে তাকালাম তাঁর এবারের 'অল রাইট'-এর মানে কি বুঝবার জন্য, আসলে আমি প্রাণভরে দেখে নিতে চাচ্ছিলাম সেই ব্যাক্তিটিকে, যিনি পার্থিব সুখ সম্পদের প্রতি উদাসীন, পরলোকে ভগবানের আশীর্বাদ পাবার আশায় অপেক্ষমান এই নিঃস্বার্থ আত্মার বহিরাবরণটিকে। কিন্তু মিস্টার স্মিথের মুখে কি এক অন্তর্দ্বন্দ্বের ছাপ দেখে আমি উদ্বিগ্ন বোধ করলাম। জমিদারও একমুহূর্তের জন্য চিন্তার খেই হারিয়ে দিশাহারা হয়ে মিস্টার স্মিথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এমন সময় অতিথি আবার নিজের অভ্যস্ত কথা 'অল রাইট।' বললেন।

জানি না এবারে তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের জমিদার প্রতিবারেই তাঁর কথার সঠিক অর্থ ধরতে পারেন, এবারেও তিনি হারিয়ে যাওয়া কথার সূত্র ঠিক মনে করতে পারলেন।

'হ্যাঁ মিস্টার রামুলি, মিস্টার স্মিথ নিশ্চিত যে আপনি কৃষকদের বোঝাতে পারবেন। ঐ বিদ্রোহীগুলোর বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে যাওয়া চোখ আপনি খুলে দিন, তাদের ভুল পথ থেকে ফেরান। এমনকি রাহুলের মত লোকেরাও কোনো এক সময়ে অনুতাপ করে। মিস্টার স্মিথ সত্যের শক্তিতে বিশ্বাস করেন। সত্য সর্বশক্তিময়। সত্যই পাহাড়কে ছোট করে দিতে, সমুদ্রকে শুকিয়ে দিতে আর নদীর স্রোত থামিয়ে দিতে পারে। একথা আপনি রাহুল আর তার অনুবর্তী অন্যান্যদের বুঝিয়ে দিন।'

মিস্টার স্মিথ মার্বেল পাথরের ছাইদানিতে পাইপটা ঠুকে ঠুকে ছাই ঝাড়ছিলেন। তারপর আবার আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর

এই গায়ে লেগে থাকা চোখের দৃষ্টি সহ্য করা আমার পক্ষে ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল।

'অল রাইট।'

মিস্টার স্মিথের এবারের কণ্ঠস্বর শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আলোচনা এবার শেষ করা উচিত। আমি উঠলাম। মিস্টার স্মিথের চোখের দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করল হলঘরের দরজা পর্যন্ত, আর জমিদার নিজে আইভিলতায় ঘেরা বাগান পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন আমাকে।

মিষ্টি কথার শক্তিতে আরো বেশী বিশ্বাস নিয়ে আমি জমিদারের বাড়ী ছাড়লাম এবং বুঝতে পারলাম যে, বিদ্বেষ বা বলপ্রয়োগ ছাড়াই মানুষ সুখ পেতে পারে। ঠিক করলাম, কালই কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

কৃষকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বিশেষ অপেক্ষা করতে হল না। কয়েকটি ঘটনার ফলে আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ আরো তাড়াতাড়িই ঘটল।

গ্রামের শান্তিপূর্ণ জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। সর্বত্রই যেন একটা আলোড়ন। দু'জন কৃষকের দেখা হলেই আরম্ভ হয়ে যায় জমিদারের সম্পর্কে, মিস্টার স্মিথের সম্পর্কে, চ্যবাগান সম্পর্কে আলোচনা। ভারতীয় কৃষকের কাছে তার ঐ এক টুকরো জমির দাম কতখানি তা কি আপনাদের জানা আছে? এইরকম পরিস্থিতিতে মিস্টার স্মিথ আমাদের গ্রামে ব্যবসা শুরু করার মতলব করেছেন। এমনকি জমিহীন কৃষকরাও ঐ নিঃস্বার্থ চাবাগান ব্যবসায়ীকে গ্রাম থেকে বহিষ্কার করে দেবার পক্ষে। তাদের এই মনোভাবকে যে রাহুল আর সঙ্গীরা আরও তাতিয়ে তুলছে তাতে আমার কোন সন্দেহই ছিল না। আর তাদের মধ্যে চন্দ্রাও অবশ্যই ছিল।

মিস্টার স্মিথেরও আর তর সইছে না বোঝা যাচ্ছে। তিনি জমিদারের ওপর চাপ দিচ্ছেন আর কৃষকদের ওপরও কি এক অজানা চাপ আসছে। যত বেশী করে এই চাপ বোঝা যাচ্ছিল, ততই বেশী করে জানা যাচ্ছিল গ্রামে গোপন শক্তির অস্তিত্ব। মিস্টার স্মিথ খুবই অসময়ে ব্যবসা আরম্ভ করার কাজে লেগেছেন।

পরের দিন এক গেলাস ছাগলের দুধ, দুটো বিস্কুট আর জমিদারের পাঠান কলা খেয়ে রাস্তায় বেরোলাম। পোড়ো মন্দিরের সামনে দেখলাম এক বিরাট ভীড়। জমাদার মন্দিরের সামনে একটা বড় পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে বলছিল:

'তোমরা এতদিন যে সব বিদেশীদের দেখেছ, মিস্টার স্মিথ তেমন নন। তিনি আমাদের গ্রামের মঙ্গল চান, তিনি চান যে ভারতবর্ষ ধনী হয়ে উঠুক, উন্নতি লাভ করুক। তিনি আমাদের রুটি দেবেন।'

ভীড়ের মধ্য থেকে চীৎকার শোনা গেল:

'ওর রুটি ওর গলাতেই আটকে যাক!'

জমাদারের লম্বা হলুদ মুখ আরো ঝুলে পড়ল। আমার দিকে তাকাল সে যেন আমার সাহায্য চাইল, তারপর নেমে পড়ল পাথরটির ওপর থেকে। আমি দৃঢ়পদে এগিয়ে গিয়ে পাথরখণ্ডটির উপর উঠে দাঁড়ালাম।

'ভাইসব!' আরম্ভ করলাম। 'তোমাদের মনের কথা আমার থেকে ভাল করে আর কেউ জানে না। আমি জানি কার কি দুঃখ, কার ব্যথা কোথায়। আজ পনের বছর ধরে আমি পিতার স্নেহে তোমাদের শিশুদের শিক্ষাদান করছি। তোমাদের ভাই হিসাবে, তোমাদের শিশুদের গুরু হিসাবে আমি বলছি: 'ভাইসব, আমি চিরকালই তোমাদের ভাল চেয়েছি!'

কৃষকরা অদ্ভুত স্তব্ধতার সঙ্গে আমার কথাগুলি শুনছিল। এক মুহূর্তের জন্য থেমে আমি আমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলির মুখের দিকে তাকালাম। তাদের চোখে চাপা উৎকণ্ঠা। আমার গলার কাছে কি যেন আটকাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাইছিলাম:

'ভাইসব! তোমাদের কথায় আমি ক্রোধ ও বিদ্বেষ শুনতে পাচ্ছি। হিংসার পথ ছাড়! যাকে তুমি শত্রু মনে কর তার কথাও ধৈর্যসহকারে শোন। ক্রোধ আর বিদ্বেষের পথ প্রাজ্ঞ লোকের জন্য নয়। রাম আমাদের ভ্রাতৃত্ব আর ভালবাসা শিখিয়েছেন।'

আমি চিরকাল যা বিশ্বাস করে এসেছি তাই বলছিলাম। কিন্তু আমাকে ঘিরে থাকা চোখগুলির কঠোর, ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে আমার কথাগুলি জোর হারিয়ে ফেলল। আমার কথাগুলি যেন শূন্য মনে হচ্ছিল। হতাশ হয়ে আমি নেমে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে রাহুল লাফিয়ে উঠল পাথরখণ্ডটির উপর।

'বন্ধুরা!' চীৎকার করে বলল সে। 'ভরপেট খালিপেটের কথায় কান দেয় না। আমাদের পেট পিঠে লেগে গেছে, পিঠ নুয়ে গেছে, গাছের শুকনো ডালগুলোর মত আমরা নীরবে বোঝা বয়েছি, সহ্য করেছি, আর আমাদের বলা হচ্ছে: অপেক্ষা কর, আরো নত হও। কিন্তু আমাদের উত্তর: না! যথেষ্ট হয়েছে! আমাদের পিঠ আর নোয়াবে না, আর সহ্য করা যায় না। যে জমিতে বছরে তিনবার ফসল তোলা যায়,

সেখানে আমরা ক্ষুধায় মরব না। ক্ষুধাকে, দুর্ভিক্ষকে দূরে হঠাতে হবে।'

রাহুল সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল আর সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, আমরা ক্ষুধার বিনাশ করতে চাই!' জোর দিয়ে বলল সে। 'তোমরা জিজ্ঞাসা করবে, কেমন করে তা সম্ভব? আমার উত্তর, যেমন ভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তা করেছে তেমন ভাবেই...' রাহুল হঠাৎ বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল: 'তোমরা সেই গল্পটা জাননা, যেখানে কৃষক লোভী ধূর্ত অতিথিকে নিজের ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল? আমাদেরও ঘরে লোভী অনুপ্রবেশকারীদের আর সহ্য করা উচিত নয়। তিনশ' বছর ধরে আমাদের দেশ কি এইজন্যই ইংরেজ মিস্টার স্মিথদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে এসেছে যে এখন একজন ইয়াঙ্কি মিস্টার স্মিথ আমাদের ঘাড়ে চাপতে চায়। 'দূর হয়ে যাও!' আমরা বলব এই সব মিস্টারদের। 'আমাদের বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও, নিজেদের বাড়ীতে আমরা যেমন চাই তেমনই থাকব!'

দারুণ হৈচৈ আরম্ভ হল। কৃষকদের গলার আওয়াজ পোড়ো মন্দিরের দেওয়াল কাঁপিয়ে তুলল।

'রক্তচোষা দূর হয়ে যাও!'

'এখান থেকে বার করে দাও মিস্টার স্মিথকে!'

এরপরে যা ঘটল, তা' আমার মনে পড়ে না আমাদের গ্রামে কখনও দেখেছি বলে।

দূরে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে দেখা দিল এক মোটর গাড়ি। গাড়িটি গ্রামের পথ দিয়ে একেবারে মন্দিরের দিকে এগিয়ে এল। চমৎকার চকচকে নিকেলে তৈরী বড়, সুন্দর গাড়ী।

সবাই গিয়ে আসা গাড়ীটির দিকে তাকাল। আমি তখুনি চিনতে পারলাম সেটি মিস্টার স্মিথের গাড়ী।

'ন্যায়পরায়ণ ব্যাক্তিটি বড় অসময়ে এসে পড়েছেন দেখছি। উনিও এর মধ্যে মাথা গলাবেন নাকি?' ভাবলাম আমি।

'ঐ যে উনি নিজেই এসে হাজির হয়েছেন!' হঠাৎ চীৎকার করে বলল রাহুল। 'উনি আমাদের লুঠ করছেন আবার আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছেন। ওকে গাড়ী থেকে নামতে দিও না।'

ক্রুদ্ধ কৃষকদলকে আমার মনে হল যেন ফুটন্ত জলস্রোত। যেদিকে স্রোত

বইতে শুরু করবে সেই দিকেই সব জল যাবে। রাহুলের কথাকে সবাই সমর্থন জানাল চীৎকার করে।

কৃষকরা নীচু হয়ে পাথর কুড়িয়ে নিল। গাড়িটা পুরোপুরি এগিয়ে আসার আগেই একটা ভারী পাথর এসে পড়ল তার উইণ্ডস্ক্রীনের ওপর। কতকগুলো পাথর গাড়ীর গায়ে পড়ে রঙ চটিয়ে দিল। ড্রাইভার ভয় পেয়ে হঠাৎ ব্রেক কষল, গাড়ী খানিকটা পিছিয়ে গেল, পেছন ঘুরল, তারপর মারখাওয়া জন্তুর মত ফিরে চলল ধুলো উড়িয়ে।

সারা দিন আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে এর ফলাফল কি হবে ভাবছিলাম। ভাবলাম জমিদার আর মিস্টার স্মিথ শহর থেকে পুলিস ডাকবে, আবার রক্তপাত ঘটবে। ভয় হচ্ছিল, কালীদেবী আবার কারো মৃত্যু চান।

কিন্তু সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার আঁধার নামল, পুলিস এল না। গ্রামে কোন সশস্ত্র লোককেই দেখা গেল না। কৃষকরাও যে যার ঘরে লুকিয়ে আছে। জমিদারের বাড়ীও নিস্তব্ধ, শুধু কদাচিৎ চাকরেরা বাড়ীর থেকে বেরিয়ে আসছিল উঠানে।

'আশ্চর্য হবার কি আছে?' ভাবলাম আমি। 'মিস্টার স্মিথ প্রকৃতই মানুষের মত মানুষ। তিনি পুলিস ও অস্ত্র প্রয়োগ করবেন না। তিনি কৃষকদের কাছে প্রমাণ করবেন যে তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে এখানে আসেন নি, এসেছেন হিতকর উদ্দেশ্য নিয়ে।'

এই ধরণের চিন্তাধারায় যতই শান্তি পাবার চেষ্টা করি না কেন রাত্রে ঘুম আসতে অনেক দেরী হল।

আমার দুর্ভাবনা হচ্ছিল। ভাবছিলাম, কেমন করে রাহুলকে বোঝান যায়, সে ভুল করছে, শক্তিপ্রয়োগ করে এক্ষেত্রে কিছুই লাভ নেই। যদি আমি তাকে বোঝাতে পারতাম, তাহলে আমাদের গ্রামকে দুর্ভাগ্য মুক্ত করতে পারতাম। কৃষকরা রাহুলকে বিশ্বাস করে। আর রাহুল এখন বুদ্ধিযুক্তির বাইরে চলে গেছে...

বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। পরিষ্কার আকাশে অনেক তারার ঝিকিমিকি। তাদের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল যেন তারাও আমাদের মঙ্গলের পথে আহ্বান জানাচ্ছে, মানুষের বিদ্বেষভাবকে শান্ত করতে চাইছে। এই বিশ্বজগতের সর্বত্রই কেমন ঐকতান। হায়, যদি মানুষ নিজের ভেতর থেকে বিদ্বেষ, ক্রোধ দূর করে দিতে পারত, যদি একজন

অপরজন ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করতে পারত... তাহলে তারা কি সুখীই না হত!'

এমন মনের ভাব নিয়ে আমি রাহুলের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম মহিলাকণ্ঠের তীক্ষ্ম কর্ণবিদারী চীৎকার। চন্দ্রার গলা! আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল — কি দুঃখময় তার স্বর। আমি ছুটে গেলাম সেই কুটীরের দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে নিথর হয়ে গেলাম। রাহুল দরজার গোড়ায় লম্বা হয়ে পড়ে আছে। চন্দ্রা তার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদছে।

চন্দ্রার হাত ধরে ওঠাবার চেষ্টা করলাম তাকে।

'চন্দ্রা, কি হয়েছে! রাহুলের কী হল? জ্ঞান হারিয়েছে নাকি?'

চন্দ্রা ক্রুদ্ধ অশ্রুপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে, নীরবে রাহুলের শরীরের থেকে বেরিয়ে থাকা ছোরার হাতলটা দেখিয়ে দিল।

'দেখ, দেখ, রামুলি, আমার বাবার কি অবস্থা করেছে। তুমি তো তাকে জানতে, তার কি এমন মৃত্যু হওয়া উচিত? পাথরও চুপ করে থাকতে পারত না, যদি তাদের মুখে ভাষা থাকত, তারাও ঘাতকদের অভিশাপ দিত, প্রতিশোধের পথ খুঁজত। দেখ, রামুলি, দেখ!..'

চন্দ্রা চীৎকার করে কাঁদছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি চন্দ্রার কথা বা কান্না শুনছিলাম না। যেন স্বয়ং কালীর ক্রুদ্ধ স্বর আমার কানে বর্ষিত হচ্ছিল। যেন মনে হল রাহুলের দরজার কাছে পড়ে আছে অসংখ্য মৃতদেহ, সেখানে কি কতকগুলি ছায়া যেন নাচানাচি করছে আর যেন শুনতে পেলাম যুদ্ধের দামামা...

কালীরই জিত হল। সত্তর হাজার মাথাওয়ালা, সত্তর হাজার হাতওয়ালা যুদ্ধের দেবতা নৃত্য করে বেড়াতে লাগল পৃথিবীতে।

আমি চোখ বন্ধ করলাম, যেন কি এক বোঝার ভারে টলতে টলতে বাইরে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

কয়েকদিন বাদে গেলাম জমিদারের বাড়ী, এবার আমন্ত্রণ ছাড়াই গেলাম। বাড়ীর প্রবেশপথে জমাদারের দেখা পেলাম। তার রক্তরাঙা চোখগুলি আমার মুখের পরে আটকে রইল কিছুক্ষণ।

জমাদার আমার আসার খবর জানাতে ভেতরে গেল, এক মিনিটের মধ্যেই স্বয়ং জমিদার বেরিয়ে এলেন।

'আরে, মিস্টার রামুলি যে! আসুন, আসুন।' আমাকে নিয়ে এলেন সেই পরিচিত হলঘরটিতে।

সেবারের মতই হলঘরের মাঝখানে ঠিক সেই টেবিলটিতেই সেই পাইপ মুখে ধরে বসেছিলেন মিস্টার স্মিথ। আমি তাঁকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাতে তার উত্তরে তিনি সেই একই কথা বললেন:

'অল রাইট!'

জমিদার আমাকে ইঙ্গিতে বসতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমি না বসে উৎকণ্ঠিতভাবে বললাম:

'রাহুলকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছে। খুনীকে খুঁজে বার করে তার বিচার করা দরকার।'

মিস্টার স্মিথ আর জমিদার চোখাচোখি করলেন।

আর আবার আমি শুনলাম সেই একই কথা যাতে আমি প্রচণ্ড বিরক্ত বোধ করতে লাগলাম:

'অল রাইট!'

জমিদার নিরুপায়ের ভঙ্গীতে হাত ছড়িয়ে বললেন:

'করার কিছু নেই, রামুলি। এই পাপেভরা জগৎটাকে এত তাড়াতাড়ি শুধরে ফেলা যাবে না। রাহুল নিজেই দোষী। সব সময় শক্তি আর অস্ত্রের কথা বলত, সেই অস্ত্রেই নিজেই মরল। মিস্টার স্মিথ এই দুঃখজনক ঘটনায় মর্মাহত। তিনি বলছেন আজ তিনি দুঃখে গলা দিয়ে এক টুকরো রুটিও নামাতে পারেন নি। দেখুন, দেখুন মিস্টার স্মিথের দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

আমার মনে হল যে ঐ রাত্রের ঘটনার পরে মিস্টার স্মিথের মুখচোখ বিবর্ণ দেখাচ্ছে। তিনি আবার আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিলেন। মনে হল যেন তিনিও আমার মত কষ্ট পাচ্ছেন।

'অল রাইট!'

জমিদার আলতো করে আমার কনুই ছুঁয়ে আবার আমায় বসতে বললেন। আমি তাঁর দিকে দিশাহারা হয়ে তাকিয়ে বসলাম।

'মিস্টার রামুলি,' জমিদার আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ঐ মেয়েটি কি করেছে আপনি জানেন? এমন কখনও শোনা যায় নি।'

'কোন মেয়েটি?'

'চন্দ্রা। ও বনে গিয়ে কতকগুলো গুণ্ডাকে যোগাড় করেছে। ভারতীয় মেয়ে কখনও হাতে অস্ত্র তুলে নেবে এমন শুনি নি। মিস্টার স্মিথ যখন

জানতে পারলেন, হতভম্ব হয়ে গেলেন। এমন নৈতিক পতন দেখে তিনি দুঃখিত। একটা মেয়ে, বনে, গুন্ডাদের সঙ্গে, অস্ত্র নিয়ে!.. ছিঃ ছিঃ! গতকাল রাতে চন্দ্রা আমার দু'জন ভৃত্যকে ধরেছে, একজনকে সে মেরে ফেলেছে, আর অন্যজনের হাতে আমায় একটা চিঠি পাঠিয়েছে...

'চিঠি?'

'এই যে।'

জমিদার আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন ছোট ছোট অক্ষরে ভর্তি একটা কাগজ। কাগজটা নেবার সময় আমার হাত কাঁপছিল। হ্যাঁ, এটা চন্দ্রাই লিখেছে। এ তারই সতর্ক, ছেলেমানুষী হাতের লেখা। আমি ঠিক চিনলাম, কারণ আমিই তো তাকে লিখতে শিখিয়েছি। সেই হাত যা একদিন লিখত আমাদের কবিদের বিভিন্ন কবিতা পাখী ও ফুল সম্বন্ধে, মিষ্টি শিশুদের জগৎ সম্বন্ধে, সেই হাতই এমন কঠোর কর্কশ চিঠি লিখেছে জমিদারকে! সে দাবী করেছে যে মিস্টার স্মিথ যেন চিরকালের জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে যায় এবং হুমকি দিয়েছে যে যদি তা করা না হয় তাহলে জমিদারের বাড়ীতে আগুন লাগান হবে। আমি পড়ছিলাম আর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার চন্দ্রা, পেলব, নরম, পদ্মফুলের মত সাদা চন্দ্রা এমন সব লিখেছে!..

'দেখছেন মিস্টার রামুলি, জগৎটা কেমন নষ্ট হয়ে গেছে, নীতিচরিত্র বলতে আর কিছু নেই। মিস্টার স্মিথ বলছেন নৈতিক অধঃপতন একটা কঠিন অসুখ, কেবল আধ্যাত্মিক গুরুই মানুষকে এর থেকে রক্ষা করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের স্বভাবে নম্রতা আসে, ততক্ষণ তার সমস্ত কার্যকলাপ হিংসার পথেই যাবে। রামুলি, মিস্টার স্মিথ আপনার মধ্যেই চন্দ্রার ভাগ্য দেখতে পাচ্ছেন।'

'আমি? আমি কেমন করে তাকে বাঁচাব?'

'তার সঙ্গে কথা বলুন। তাকে বোঝান, মিস্টার রামুলি। আপনার বিবেক পরিষ্কার, উদ্দেশ্য মহৎ। এই পথহারান মানুষটিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনুন। তাকে বলবেন মিস্টার স্মিথ আর আমি তাকে পুরোপুরি মাফ করতে রাজী কেবল তার আত্মাকে রক্ষা করার জন্য, কেবল তাকে হিংসার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য। ও জমির অধিকার নিক, আমরা ওকে টাকা দেব, খালি যেন ও বন ছেড়ে নিজের ঘরে পরিচ্ছন্ন নৈতিক জীবনে ফিরে আসে।'

সবকিছু শুনছিলাম, কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। উল্টোপাল্টা অনুভূতি আমার ভেতরটা ছিঁড়ে খাচ্ছিল। আমার আনন্দ হচ্ছিল যে এরা চন্দ্রার ভাল করতে চাইছেন। কিন্তু সে কি আমার কথা শুনবে? সে আর আগের মত বিনীত নম্র নেই। মৃত রাহুলের আত্মা যেন তার ওপর ভর করেছে। কি করব?

মিস্টার স্মিথ আমার দিকে শিশুসুলভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সম্ভবতঃ কৃষকদের দুঃখকষ্টে মর্মপীড়িত হয়ে পাইপ টানছিলেন।

'অল রাইট!' হঠাৎ কর্কশভাবে বলে উঠলেন তিনি।

জমিদার মিস্টার স্মিথের দিকে তাকালেন তাড়াতাড়ি, তারপরে টেবিলে কাগজ রেখে লিখতে লাগলেন।

'এই নিন, মিস্টার রামুলি, আমাদের উত্তর। এটা চন্দ্রাকে দেবেন। আমরা তাকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে তার জীবন নিরাপদ থাকবে। আমাদের কথা সে যেন বিশ্বাস করে, আপনিও আমাদের শপথে বিশ্বাস করুন...'

হঠাৎ আবার কর্কশ ভাঙা গলায় মিস্টার স্মিথ বললেন: 'অল রাইট।'

আমি চটপট উঠে চলে যেতে চাইলাম। কারণ চন্দ্রার জীবন ও ভবিষ্যৎ এখন আমার হাতে। আমি তার জন্য শান্তি ও সুখ নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু মিস্টার স্মিথের এই কর্কশ চীৎকারের পরে জমিদার আমায় থামালেন।

'মিস্টার রামুলি, সত্যের জয়লাভের পথের কোন সীমা নেই। আর সে পথ চন্দ্রার জন্য খোলা। তাকে বলবেন যত তাড়াতাড়ি চন্দ্রা মিথ্যাপথ ত্যাগ করে, ততই তার ও সবার পক্ষেই মঙ্গল...'

'অল রাইট!' আবার শোনা গেল।

চন্দ্রার প্রতি তাদের এই মনোভাবের জন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম।

ভাবলাম, এবার তাড়াতাড়ি চন্দ্রার দেখা পেলে হয়। কিন্তু কোথায় তার দেখা পাব? জানি না, কোথায় সে আশ্রয় নিয়েছে? সৌভাগ্যবশতঃ আমি রাহুলের একজন বন্ধুর দেখা পেলাম গ্রামে। আমার সন্দেহ ছিল না যে সে চন্দ্রাকে চিঠি পাঠিয়ে দিতে পারবে, তাই একটা ছোট্ট চিরকুট লিখে তার হাতে দিলাম।

'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া ভীষণ দরকার,' লিখলাম, 'পাঁচ মিনিটের জন্য অন্তত। যা আমি তোমায় বলব তা তোমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

ভোরবেলায় উত্তর পেলাম। সে আসবে লিখেছে। প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার সঙ্গে আমি তার অপেক্ষা করছিলাম। সেদিন রাত গেল, পরের রাতও গেল, চন্দ্রা এল না।

গ্রাম আগের মতই বিক্ষুব্ধ। শোনা যাচ্ছিল যে, চন্দ্রার বাহিনী বেশ বেড়ে উঠেছে। চারপাশের গ্রামগুলি থেকে তার কাছে লোক যেত জঙ্গলের অলক্ষ্য পথ বেয়ে। যেত লুণ্ঠিত, ক্ষুধার্ত লোকেরা তার দলে নাম লেখাতে। শোনা যেত যে এমনকি শহর থেকেও লোক আসত তার কাছে।

চন্দ্রার বাহিনী সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা যেত যে, তারা অত্যাচারীদের ওপর প্রতিশোধ নেয়, হতভাগ্য লোকেদের রক্ষা করে, ক্ষুধার্তদের খাদ্য যোগায়। এই সব কাহিনীর কতটা সত্য আর কতটা গ্রামের দরিদ্রের দেখা স্বপ্ন তা আমার জানা নেই। কিন্তু আমি লোভীর মত চন্দ্রার সম্পর্কে প্রতিটি কথা শুনতাম।

অবশেষে চন্দ্রা এল আমার কাছে। মাঝরাতেরও অনেক পরে, যখন ঘন অন্ধকার আকাশের তারাগুলোকে ঢেকে দিয়েছে কে যেন আমাকে ডাকল। আমি আমার নলখাগড়ার কুটীর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম অন্ধকারে।

'কে ?'

'রামুলি, তুমি আমাকে ডেকেছ, আমি এসেছি,' বলল চন্দ্রা। 'তুমি আমাকে কি বলতে চেয়েছিলে ? তাড়াতাড়ি বল...'

'চন্দ্রা,' গম্ভীর ও উৎকণ্ঠিতভাবে আরম্ভ করলাম। 'তোমার ভাগ্য ভাল। সুখের ঘরের দরজা তোমার জন্য খোলা।'

'কোন দরজা ? কি সুখ ?' হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করল সে।

'এই যে,' আমি তার হাতে জমিদারের চিঠিটা দিলাম। 'তোমাকে স্বাধীনতা দিচ্ছে। কেউ তোমাকে ছুঁতে সাহস করবে না। জমিদার শপথ করে বলেছেন...'

'কিন্তু সেই হতভাগ্যরা যারা আমার সঙ্গে বনে চলে এসেছে, রামুলি ? তাদের ভগ্ন হৃদয়ের ব্যথা কে সারাবে ? আর আমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ, রামুলি ? আর আমাদের মাতৃভূমি, যে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হারিয়ে কাঁদছে, তার কষ্ট কে ঘোচাবে ? এসব দায়িত্ব কে নেবে, রামুলি ?'

অন্ধকারে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ক্রুদ্ধ ও অটল শোনাচ্ছিল। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। আমার ইচ্ছে হল তার পায়ে পড়ি।

'চন্দ্রা! এইসব চিন্তাধারা তোমার হৃদয়কে পাথরে পরিণত করেছে। ছাড় এসব চিন্তা। দৈবশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। এই বিরাট দুঃখময় পৃথিবীতে তুমি কি পরিবর্তন আনবে? তুমি যদি সব মেনে নাও, তবে তোমার হৃদয় শান্ত হবে...'

'ওঃ রামুলি!' কণ্ঠস্বরে তিক্ততা ও সহানুভূতি নিয়ে বলল সে 'তাদের এতগুলি মন্দ কাজও কি তোমার চোখ খুলে দেয় নি? আর আমি ভাবছিলাম যে এখন তুমি আমাদের সঙ্গে, জনগণের সঙ্গে থাকবে...'

আমি তাকে বাধা দিলাম:

'আমি বরাবরই তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। আমি আমার দেশের লোকের বিরুদ্ধে যেতে পারি? আমি স্বপ্ন দেখতাম, কবে লোকেরা ভাই বলে সবাইকে ভাববে। আমি চাইতাম যে, সবাই যাতে পুরোপুরি সুখী হয়...'

আমার গলা কেঁপে গেল। আর কথা বেরোল না আমার মুখ দিয়ে। চন্দ্রা একটু নরম হল।

'আমার লক্ষ্মী রামুলি, সবাই যদি তোমার মত এমন হত তাহলে মিষ্টি কথায় সত্যিই ভুল শোধরান যেত। কিন্তু সবাই তা নয়। যারা তোমায় এই চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে, তারাই আমার বাবার বুকে ছুরি বসিয়েছে। এখন ওরা তোমার হাত দিয়ে আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে চায়। না, রামুলি, আমরা অনেক দিন ঘুমিয়ে থেকেছি, আমরা অন্ধ ছিলাম। কিন্তু এখন আমাদের চোখ খুলে গেছে আর তুমি আবার তাদের বন্ধ করে দিতে চাও।'

'এ ভুল, চন্দ্রা। ওরা তোমার বাবাকে মারে নি। ওরা আমার সামনে কত দুঃখ প্রকাশ করল। আমি তাদের চোখে জল দেখেছি।'

চন্দ্রা ব্যঙ্গের হাসি হাসল।

'তুমি ওদের চোখে জল দেখেছ? শুনেছি কুমীরের চোখেও কখনও কখনও জল দেখা যায়। তুমি ওদের চোখের জলে বিশ্বাস কর বলেই ওরা তোমায় বোকা মনে করে... বিদায়, রামুলি! জমিদার আর মিস্টার স্মিথেদের দেওয়া সুখে আমার দরকার নেই!'

সে জমিদারের চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল।

'বিদায় রামুলি। যদি কখনও ঘুম থেকে জেগে ওঠ আর আমাদের সঙ্গে মিলে লড়াই করতে চাও তো আমায় খবর দিও। আমরা তোমাকে দলে নেব...'

এই বলে চন্দ্রা এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। কাছেই কোথায় টিলাটার

ধারে আমি আরো দুটো ছায়া দেখতে পেলাম। নিশ্চয়ই এরা চন্দ্রার বন্ধু ওকে পাহারা দিচ্ছিল।

ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমি তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে যেদিকে চন্দ্রা আর তার বন্ধুদের পায়ের হালকা আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

ঐ সময় আমার অসম্ভব উৎকণ্ঠা হতে লাগল। হঠাৎ দূরে কাদের যেন গলা শোনা গেল। তারপর চেঁচামেচি, গালাগালি। কে যেন চীৎকার করে উঠল ভীষণ যন্ত্রণায়। তারপর সব চুপচাপ। পরপর তিনটি বন্দুকের গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

এরপর সারা গ্রামটা যেন আরো বেশী গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবে গেল।

কি করব ? কতবার আমি এই একই প্রশ্ন করেছি নিজেকে কিন্তু তার কোন উত্তরও পাই নি কোনবারই। কি ঘটেছে ? হয়ত চন্দ্রার আর তার অনুচরদেরই অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল ? চন্দ্রা এখন কোথায় ? সে কি ধরা পড়েছে না পালিয়ে যেতে পেরেছে ?

অনেকক্ষণ চিন্তা করার পর আমি ঠিক করলাম তখুনি জমিদারের বাড়ী যেতে। সেখানে সব খবরই আমি পেতে পারতাম। আর যদি চন্দ্রা ধরা পড়েও থাকে, তাকে ছাড়াতেও পারতাম। তারা কি নিজেদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে ?

কিন্তু তারপর ভাবলাম সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিত। সকালে কি হয়েছে সব জানলে পরে আমিও আমার কর্তব্য স্থির করতে পারব।

ভোরের আলো ফুটতেই আমি রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। কিন্তু গ্রামের যে কোন লোকের কাছেই আমি জিজ্ঞাসা করি না কেন রাতের ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলে।

কেউ বলল রাতে চন্দ্রার বাহিনী জমিদারের বাড়ীতে হানা দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। সেই সংঘর্ষে চন্দ্রার সমস্ত লোক নাকি মরে গেছে, চন্দ্রা নিজেও আহত হয়েছে, কিন্তু সে পালাতে পেরেছে।

আমি জানতাম গুজব আর জল্পনাকল্পনার এখন শেষ থাকবে না। গ্রামবাসীরা আমার চেয়ে বেশী জানে না, কিন্তু তাদের প্রচণ্ড কল্পনা শক্তি।

কেবল জমিদার সব জানতে পারেন। তাঁর কাছে আমি সব প্রয়োজনীয় খবর পেতে পারি। গেলাম তাঁর বাড়ী। কিন্তু তিনি বাড়ীতে নেই।

জমাদার বেরিয়ে এল।

'তোর মালিকের সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।' বললাম আমি।

'মালিকের সঙ্গে? যদি তুমি তাঁর গাড়ী ধাওয়া করে তাঁকে ধরে ফেল তবেই তা সম্ভব... উনি আর মিস্টার স্মিথ চলে গেছেন।'

'কখন ফিরবেন?'

'যখন ভগবানের ইচ্ছা...'

বোঝা যাচ্ছিল জমাদার কোন রকমে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে নানারকম মুখভঙ্গী করছিল আর আমায় চোখ টিপল। আমি পেছন ঘুরলাম ওর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়ার জন্য। কিন্তু সে আমার হাতটা ধরল খপ করে তারপরে টেনে আনল গেটের ঠিক পাশেই ছোট্ট ঘরটায়, এখানেই নরকের দ্বাররক্ষকের মত এই লোকটা থাকে।

'চল, চল, গুরুমশাই, আমার সঙ্গে একটু গল্পই না হয় করলে।'

তার থাবা থেকে হাত ছাড়াতে পারলাম না, সে আমায় ঘরে এনে ঢোকাল। ঘরের এক কোণে মাদুরের ওপর একটা থালায় কিছুটা মাংস মাখা ভাত।

দুটো খালি আর একটা সবে খোলা বোতল দেখে জমাদারের খুশমেজাজের কারণ বুঝতে পারলাম। আমার কাঁধে চাপ দিয়ে সে জোর করে আমায় মাদুরে বসিয়ে দিল, বোতল থেকে গেলাসে ঢেলে আমায় দিল।

'খাও গুরু। এবার তুমি কাকে বেচতে এসেছ, বল?'

ভীষণ বিরক্ত লাগা সত্ত্বেও আমি কোন উত্তর দিলাম না।

জমাদার মত্ত অবস্থায় বলে চলল:

'বেশী নাক উঁচু করো না, গুরু। তুমি আর আমি একই দড়িতে বাঁধা। তুমিও লোক মার আমিও তাই, তবে তোমার মিষ্টি কথার বিষে লোক মারার মত ধূর্তামি আমি করি না। আমার সোজাসুজি অস্ত্র — ছুরি। তোমার মিষ্টি কথা বলা জিভই হল তোমার ছুরি... তুমি তো বেশ ভালই জাল বোন হে বন্ধু। সে জালে তো এর মধ্যেই বেশ কটা পাখী ধরা পড়ল। তাই না?'

তারপর সে আমার সামনে রাখা মদটা নিজের গলায় ঢেলে দিয়ে আবার গেলাসটা ভরে আমার সামনে রাখল।

'তুমি এক একটা পাখীর জন্য কত করে পাও? সত্যি করে বল, মাথাপিছু কত পাও? আমাকে সামান্য দেয়, মাত্র ১০০ টাকা। এই সামান্যর জন্য কি আর অত পরিশ্রম করা আর ঐ নোংরা মানুষগুলোর রক্তে হাত নোংরা করা পোষায়? যাক্, না খেয়ে মরার থেকে এ তবু ভাল।'

বিভিন্ন মহাপুরুষের বাণী স্মরণ করতে লাগলাম যাতে নিজের রাগ সংযত করতে পারি আর এই জানোয়ারটার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়ি।

'জমাদার,' কম্পিত কণ্ঠে আমি বললাম, 'তুমি এই সব জিনিস ছোঁও কি করে?'

জমাদার ঘর কাঁপিয়ে হা-হা করে হেসে উঠল, তারপর আমার অনাবৃত বক্ষস্থলে হাতের মুঠি দিয়ে আঘাত করে বলল:

'বোকা সেজো না গরুর। আমি তোমাদের সবাইকে জানি। আমাকে ঠকাতে পারবে না। তোমাদের ঐ মিষ্টি মিষ্টি বুলির আড়ালে কি লুকানো আছে, সব জানি... খাও, খাও। জমিদারের থেকে তুমি আরো অনেক টাকা পাবে। চালিয়ে যাও। কাল রাতে ওরা চন্দ্রাকে ধরতে পারে নি। শয়তানটা আমাদের দু'জনকে খুন করে পালিয়েছে। কিন্তু তার একজন সঙ্গী আমাদের ছুরি খেয়েছে। তুমি যদি চন্দ্রাকে আর একবার আমাদের ফাঁদে এনে ফেল তো জমিদার তোমাকে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দেবে।'

আমার জীবনে এই প্রথম মদের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা মিলিয়ে গেল। ভাবলাম, কি অদ্ভুত শক্তি আছে এতে যে, চেপে বন্ধ করে রাখা মুখ খুলে দেয় আর মানুষের ভেতরে থেকে সবচেয়ে দামী, প্রয়োজনীয় গোপন কথাগুলি টেনে বের করে আনে। এবার আমি এই পাজিটার প্রতিটি কথা লোভীর মত গিলতে লাগলাম।

সে বলেই চলল:

'আমার কাজের মূল্য বোঝো না, রামুলি। একেবারেই না। তোমার কি ধারণা, রাহুলকে মারার জন্য আমি কত টাকা পেয়েছি? ঐ একশ' টাকাই... রাহুলের জন্যও একশ'! ভেবে দেখ!'

বিস্ময়, আতঙ্ক ত্রাস আমাকে চেপে ধরল। রাহুলের ঘাতক আমার সামনে! ওই তাকে মেরেছে!

'রাহুলকে কিন্তু আমি চমৎকার বিঁধেছি। দারুণ, তাই না? পিছন থেকে আমরা ওর কাছে এগিয়ে গেলাম। ছেলেগুলো ওর হাত চেপে ধরে পিছন দিকে মুড়িয়ে দিল আর আমি একেবারে ঠিক বুকে ছুরিটা বসিয়ে দিলাম। সেখানেই সে পড়ে রইল...'

জমাদারের কথায় আর বিস্মিত হচ্ছিলাম না আমি, আতঙ্কও হচ্ছিল না। এখন আমার ভেতরটা কেবল ঘৃণায় পূর্ণ। কিন্তু উথলে ওঠা বিদ্বেষ চেপে বসে রইলাম, সবকিছু শেষ পর্যন্ত জানার জন্য।

'জমিদার জানতেন যে, রাহুলকে মারা হবে?' রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম।

'জানবে না কেন? মিস্টার স্মিথের ঐ শয়তানীভরা মাথাটাই তো সমস্ত মতলব ভেঁজেছে। ওঃ কি শয়তান লোকটা। চোখের পলক না ফেলেই ও তোমাকে মদের বদলে বিষ ঢেলে দেবে। খাও, খাও গুরুদ। আমি আর যাই করি বন্ধুকে বিষ খাওয়াব না। খাও, খাও।'

জমাদার নীচুস্বরে কি বক্‌বক্‌ করছিল, গালিগালাজ করছিল, আবার বকবক করছিল। বুঝতে পারছিলাম না, কি করে ওর হাত থেকে ছাড়া পাব। এমন সময় হঠাৎ গাড়ীর আওয়াজ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জমাদার বোতলগুলো আর নোংরা বাসনপত্র মাদুর দিয়ে ঢাকা দিল।

'দেখেছ?! এদের একটা কথাও কি বিশ্বাস করা যায়? চিরটাকাল এই। শয়তানেরও মাথা ঘুরিয়ে দেবে। বলে গেলেন সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না, দু'ঘণ্টাও কাটল না ফিরে এলেন...'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে, নেশা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে করতে সে বাইরে বেরোল। আমিও তার পেছন পেছন বেরোলাম।

বাগানের আইভিলতা ঘেরা পথে মিস্টার স্মিথ পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। আমাদের ওপর শূন্য অমানবিক দৃষ্টি রেখে বললেন:

'অল রাইট।'

মিস্টার স্মিথের স্বরে যেন সন্দেহ প্রকাশ পেল। তাঁর বিশাল শরীর, তাঁর উদাসীনভাবে ধোঁয়া ওড়ানো পাইপ — এসব কিছু আমার বিরক্তি জাগাচ্ছিল আর আমার ভেতরে ফুটতে থাকা রাগে একেবারে আগুন জ্বালিয়ে দিল। এই সময়ই দেখলাম জমিদারও মুখে ধূর্ত হাসি নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন।

'এই যে, মিস্টার রামুলি!' দূর থেকেই বললেন তিনি। তার পর একটু থতমতভাবে আরম্ভ করলেন: 'মিস্টার স্মিথ আর আমি... আমি আর মিস্টার স্মিথ দু'জনেই... খুবই দুঃখিত যে আপনার সত্য জ্ঞান চন্দ্রাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে পারে নি। কিন্তু আমরা মনে করি আপনি এই মেয়েটিকে ভুল পথ থেকে ফেরাবার চেষ্টা আর একবার করবেন...'

বোধ হয় আমার চোখ, মুখ, সারা শরীর দিয়ে আগুন ছুটে বেরোচ্ছিল। কারণ জমিদার হঠাৎ কথার মাঝখানে থেমে উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলেন:

'মিস্টার রামুলি, আপনার কি হয়েছে? আপনি অসুস্থ নাকি?'

'জমিদার!' ঘৃণায় কাঁপতে কাঁপতে আমি বললাম। 'এই নোংরা

খেলা বন্ধ করার সময় হয়েছে। আমি আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম, আপনি এই বোবা লোকটার চিন্তাধারার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছেন। আমি বোকা ছিলাম, তাই বুঝি নি আপনি কত নীচ আর জঘন্য। আর আপনার এই ধার্মিক মিস্টার স্মিথ আরও বেশী বদমাস ও নোংরা...'

মিস্টার স্মিথ ধীরে ধীরে মুখ থেকে পাইপ নামালেন। আমি ভাবছিলাম তিনি আবার তার সেই অভ্যস্ত বুলি ঝাড়বেন। কিন্তু তিনি চুপচাপ আমার কাছে এগিয়ে এলেন, আমার কানের কাছে চাপা স্বরে ঘড়ঘড় করে বললেন:

'নির্বোধ। নিজের পিঠ বাঁচাতে যদি চাস তো আজেবাজে বকিস না।'

'না, মিস্টার স্মিথ, আমি আজেবাজে বকছি না। আমি আবার বলছি, আপনি জঘন্য জীব, আর আপনি বদমাস, বদমাস! এখন আমি সব কথা জানি আর শীগগির আমাদের সবাইও তা জানবে...'

আমি চলে যেতে চাইলাম। কিন্তু হঠাৎ কিসে যেন আমার মুখের চামড়া পুড়ে গেল। আমি পিছিয়ে গেলাম। মিস্টার স্মিথ আমার মুখের ওপর পাইপটা নামিয়ে এনেছেন, কিন্তু আমি তাঁর লোমেভরা হাতটা ধরে ফেললাম আর তাঁরই নিজের হাত দিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করলাম তাঁরই বিস্মিত মুখে, ব্যাঙের মত ফোলা ফোলা চোখে।

এর পরের ঘটনা আপনারা হয়ত বুঝতেই পেরেছেন। আমাকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হল। বিচারকরা এক ঘণ্টা ধরে আমার গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের বিচার করলেন। আমাকে চন্দ্রার ডাকাতদলের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রাখার অপরাধে অপরাধী করা হল, যেন আমি জমিদারের বিশ্বাস উৎপাদন করে জমিদারের বাড়ীতে ঢুকি, যেখানে একজন সম্মানিত ব্যাক্তিকে প্রচণ্ড অপমানিত করি, এমনকি পাইপের গরম ছাই এমনভাবে তাঁর মুখে ফেলি যে তাঁর চোখ একটুর জন্য বেঁচে গেছে (এই সম্মানিত ব্যাক্তিটির নাম উহ্য রাখা হয়)। 'এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অপরাধের বিচার করে', এই ভাবে বলা হয় বিচারাদেশে, আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল... এখন আমি ফাঁসিকাঠে ঝোলার অপেক্ষায় আছি।

কিন্তু আমি মৃত্যুর কথা চিন্তা করছি না, চন্দ্রার কথা চিন্তা করছি।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে শেষ কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়। আর আমি চীৎকার করে বলব চন্দ্রাকে, এই বিশ্বাসে যে সে শুনতে পাবে আমার এই কথাগুলি:

'চন্দ্রা, লড়াই চালিয়ে যাও, এতেই সুখ!'

লেখক সম্পর্কে

মিরজা ইব্রাহিমভ্ — সোভিয়েত আজেরবাইজানের গণলেখক, একাডেমিশিয়ান, সামাজিক কর্মী, শান্তির জন্য সংগ্রামেরত সংস্থাগর্নলির নেতৃবৃন্দের অন্যতম বলে পরিচিত।

১৯১১ সালে দক্ষিণ আজেরবাইজানের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে মিরজা আজ্দার ওগলি ইব্রাহিমভের জন্ম হয়। অল্প বয়সে খেতমজর্র হিসাবে কাজ করতে আরম্ভ করেন। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে তিনি শিক্ষালাভের সর্যোগ পান, স্কুল, পেট্রোলিয়াম তৈলসংক্রান্ত টেকনিক্যাল স্কুল ও লেনিনগ্রাদ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্যা ইন্স্টিটিউটে পাঠ শেষ করেন।

মিরজা ইব্রাহিমভ্ — সোভিয়েত আজেরবাইজান স্যাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শর্র প্রবন্ধ আর ছোটগল্প দিয়ে। ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি তিনি নাটকের প্রতি মনোযোগ দেন এবং আজেরবাইজানে নিজের নাট্যশালা সৃষ্টি করেন। তাঁর লেখা ন্যাটকগর্নলি হল: একটি গ্রামের সমাজতান্ত্রিক পর্নর্গঠনের কাহিনী নিয়ে লেখা নাটক — 'হায়াৎ'; স্পেনের জনগণের ফ্যাসিবাদের বিরর্দ্ধে বীরত্বপর্ণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লেখা নাটক — 'মাদ্রিদ', পিতৃভূমির মহাযর্দ্ধের বছরগর্নলি দেশে সোভিয়েত জনগণের শ্রমের কাহিনী নিয়ে — 'মহাব্বেৎ'। যর্দ্ধের পরে মিরজা ইব্রাহিমভ্ উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস — 'সেই দিন আসবে' — দক্ষিণ আজেরবাইজানের কৃষক পরিবারের সর্খদর্ঃখের কাহিনী। আরো পরে লেখা তাঁর উপন্যাস — 'বারিসঙ্গম' — যর্দ্ধের পরে যৌথখামারী গ্রাম ও তার জনগণের জীবনের কাহিনী। সত্তর দশকের শর্রতে মিরজা ইব্রাহিমভ্ প্রখ্যাত শিক্ষাগর্র নরিমান নরিমানভের জীবন ও কার্যাবলী নিয়ে মহাকাব্য 'পেরভানে' রচনা শেষ করেন।

সোভিয়েত আজেরবাইজানের সাহিত্যভাণ্ডারে স্থান করে নেওয়া পর্বোল্লিখিত উপন্যাস ও নাটক ছাড়াও মিরজা ইব্রাহিমভ্ সব সময়েই লেখেন ছোটগল্প, দেশে এবং বিদেশে প্রচুর ভ্রমণের অভিজ্ঞতার স্বাদও দেন পাঠককে, জাতীয় নাট্যশালা, সাহিত্য সম্পর্কে বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সমালোচনার সৃষ্টিতে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন'

বাড়ি নম্বর ৩৩, সী-১৪

তাশখন্দ-৭০০০১১

সোভিয়েত ইউনিয়ন

"RADUGA" PUBLISHERS
HOUSE No. 33, C-14
TASHKENT—700011
USSR